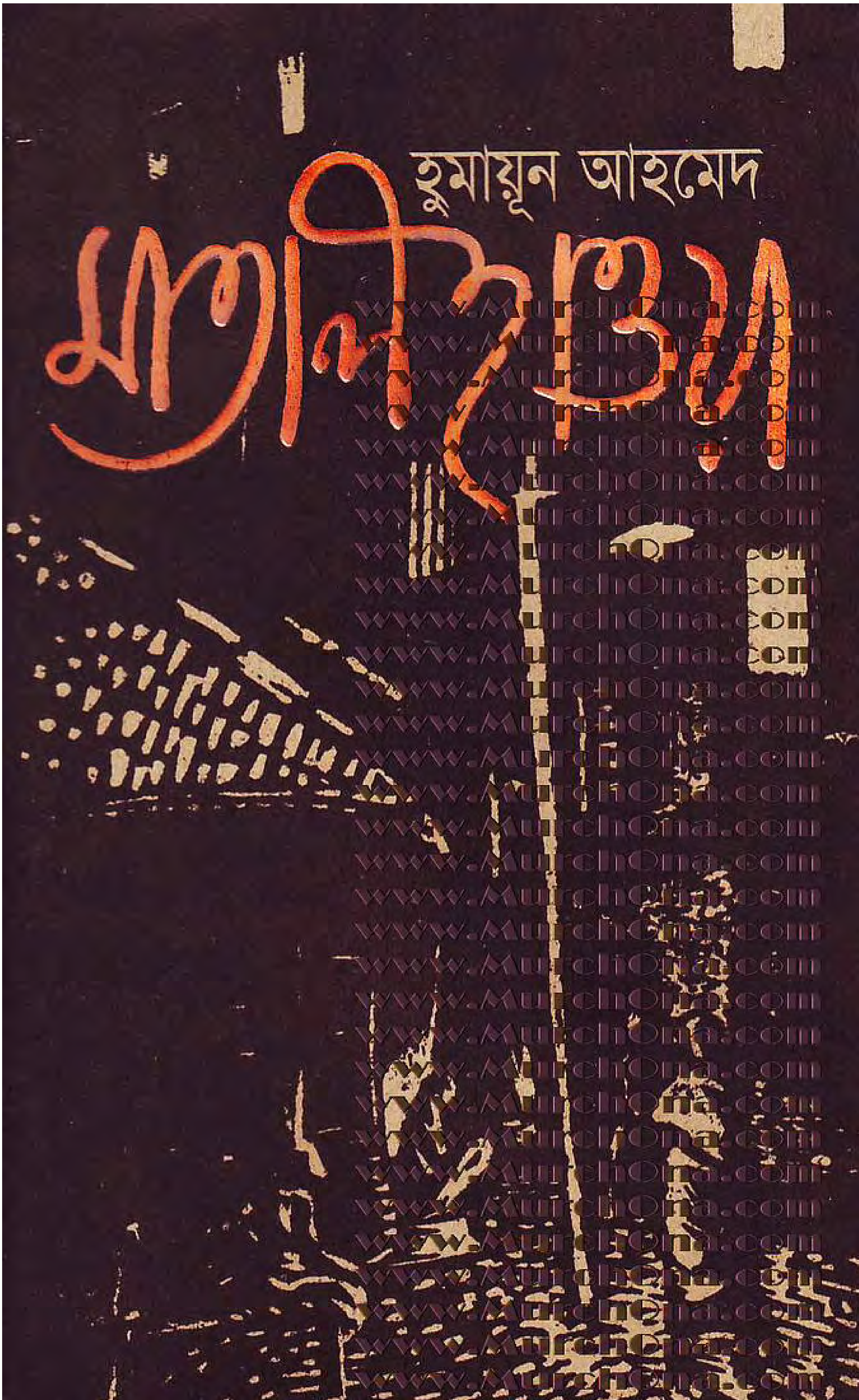

www.MurchOna.com

হাবীব বললেন, আমাদের এই বাড়ি একটা প্রাচীন বাড়ি। প্রাচীন বাড়ির প্রাচীন নিয়মকানুন। অনাত্মীয় পুরুষমানুষের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ। নাদিয়ার শরীরের এখনো এমন অবস্থা না যে সে বাইরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আপনার স্কলারশিপের কী যেন সমস্যার কথা নাদিয়া বলেছিল। কাগজপত্রগুলি যদি রেখে যান, তাহলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।

বিদ্যুত কান্তি দে বললেন, স্কলারশিপের সমস্যা সমাধানের চেয়ে নাদিয়ার সঙ্গে দেখা করা এখন আমার অনেক জরুরি।

হাবীবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি তাঁর সামনে বসা যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যুবকের কথাবার্তার মধ্যে উদ্ধত ভঙ্গি আছে। তবে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছেলে। আত্মবিশ্বাস চোখের তারায় ঝলমল করছে। হিন্দুদের চোখেমুখে একধরনের কাঁচুমাচু নিরামিষ ভাব থাকে, এর মধ্যে তা নেই। হাবীব বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরি কেন?

প্রচ্ছদ :: মুর্তজা বশীরের শিল্পকর্ম 'লেন বাই নাইট' অবলম্বনে মাসুম রহমান

হুমায়ূন আহমেদ

মাতাল হাওয়া

কোনো মৃত মানুষ মহান আন্দোলন চালিয়ে
নিতে পারেন না। একজন পেরেছিলেন।
আমানুল্লাহ মোহম্মদ আসাদুজ্জামান
তাঁর রক্তমাখা শার্ট ছিল ঊনসত্তরের
গণআন্দোলনের চালিকাশক্তি।

মূর্ছনা User দের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে, আগের মত এখন নিয়মিত বই দিতে পারছিনা। কিছু ব্যক্তিগত ব্যস্ততার সাথে আরো কিছু অনিবার্য কারণ যুক্ত হয়েছে যেটা আপনারা সবাই জানেন। আমার নিজের কাজের ফাঁকে যেটুকু অবসর সময় পাই, চেষ্টা করি আপনাদের জন্য কিছু করতে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সেই সময়টার সঠিক ব্যবহার হচ্ছেনা। বাংলাদেশের Load Shedding এর কথা কারো অজানা নয় এখন আর। তাই আপনাদের কাছে এই অপারগতা টুকু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করব।

আর একটা বিশেষ কথা বলতে হচ্ছে, মূর্ছনার বইগুলো কিছু বিশেষ ওয়েব সাইট (নাম প্রকাশ করছিনা, যদিও সবাই সেটা জানে) Edit করে তাদের নামে চালানোর চেষ্টা করছে অনেকদিন থেকেই। সে কারণে আমরাও কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলাম। কিন্তু দেখা যেত সেই বিশেষ ব্যবস্থাও ওদের ঠেকাতে পারেনি। আর এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য আমাদের কিছু পাঠক বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তাদের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করছি এবং বলতে চাইছি, আমরা নিরুপায় হয়েই এটা করছিলাম। যাইহোক, এবার যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে তাতে আশা করছি, পাঠকদের গল্প পাঠে খুব বেশি অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবেনা বা বাঁধা সৃষ্টি করবেনা। এই ক্ষেত্রে কোন একটা বই এর এক বা একাধিক পৃষ্ঠার Font বইটির স্বাভাবিক Font থেকে আলাদা হবে। ওই পৃষ্ঠাগুলো মূর্ছনা নিরাপত্তা পৃষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রাককথন

আমি মূলত একজন গল্পকার। গল্প বানাতে ভালোবাসি, গল্প করতে ভালোবাসি। দুর্বোধ্য কারণে ইতিহাস আমার পছন্দের বিষয় না। আমি বর্তমানের মানুষ। আমার কাছে অতীত হচ্ছে অতীত। লেখকদের সমস্যা হলো, তারা কাল উপেক্ষা করে লিখতে পারেন না। তারা যদি বিশেষ কোনো সময় ধরতে চান, তখন ইতিহাসের কাছে হাত পাততে হয়।

উনসত্তর আমার অতি পছন্দের একটি বছর। আমার লেখালেখি জীবনের শুরু উনসত্তরে। একটি মহান গণআন্দোলনকে কাছ থেকে দেখা হয় এই উনসত্তরেই। মানুষ চন্দ্র জয় করে উনসত্তরে। মাতাল সেই সময়কে ধরতে চেষ্টা করেছি *মাতাল হাওয়ায়*। তথ্যের ভুলভ্রান্তি থাকার কথা না, তারপরেও যদি কিছু থাকে, জানালে পরের সংস্করণে ঠিক করে দেব।

উপন্যাসটি লেখার সময় অনেকেই বইপত্র দিয়ে, ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন। দু'একজনের নাম বলতেই হয়। বন্ধু মনিরুজ্জামান, শহীদ আসাদের ছোটভাই। সাংবাদিক এবং কবি সালেহ চৌধুরী।

প্রুফ দেখা, গল্পের অসঙ্গতি বের করার ক্লান্তিকর কাজ করেছে শাওন। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পুত্র নিষাদ আমার আট পৃষ্ঠা লেখা এমনভাবে নষ্ট করেছে যে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাকে তিরস্কার।

হুমায়ূন আহমেদ
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

হাজেরা বিবি সকাল থেকেই থেমে থেমে ডাকছেন, হাবু কইরে! ও হাবু! হাবু!

হাবু তাঁর বড় ছেলে। বয়স ৫৭। ময়মনসিংহ জজ কোর্টের কঠিন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। জনশ্রুতি আছে তিনি একবার এক গ্লাস খাঁটি গরুর দুধকে সেভেন আপ প্রমাণ করে আসামি খালাস করে নিয়ে এসেছিলেন। দুধের সঙ্গে আসামির কী সম্পর্ক—সেই বিষয়টা অস্পষ্ট।

হাজেরা বিবি যে ডাকসাইটে অ্যাডভোকেটকে 'হাবু' ডাকছেন তাঁর ভালো নাম হাবীব। হাবীব থেকে আদরের হাবু। এই আদরটা সঙ্গত কারণেই হাবীবের পছন্দ না। তিনি শান্ত গলায় অনেকবার মা'কে বলেছেন, মা, আমার বয়সের একজনকে হাবু হাবু বলে ডাকা ঠিক না। একতলায় আমার চেম্বার। মক্কেলরা বসে থাকে। তারা শুনলে কী ভাববে?

হাজেরা বিবি বললেন, মা ছেলেকে ডাকে। এর মধ্যে ভাবাভাবির কী আছে? তোর মক্কেলদের মা তাদের ডাকে না? না-কি তাদের কারোর মা নাই?

মা, আমার নাম হাবীব। তুমি আমাকে হাবীব ডাকো। হাবু ডাকো কেন? হাবু শুনলেই মনে হয় হাবা।

হাজেরা বিবি বললেন, তুই তো হাবাই। লতিফার বিয়ের দিন কী করেছিলি মনে আছে? হি হি হি। এই তো মনে হয় সেইদিনের ঘটনা। তুই নেংটা হয়ে দৌড়াচ্ছিস, তোর পিছনে একটা লাল রঙের রামছাগল। রামছাগলের মতলবটা ছিল খারাপ। হি হি হি।

হাজেরা বিবির বয়স একাশি। দিনের পুরো সময়টা তিনি কুঁজো হয়ে পালঙ্কে ঠেস দিয়ে বসে থাকেন। রাতে তাঁর একেবারেই ঘুম হয় না। সারা রাত জেগে থাকেন। ক্রমাগত কথা বলেন। বেশির ভাগ কথাই আজরাইলের সঙ্গে। তিনি আজরাইলের শরীরের খোঁজখবর নেন। আদবের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, আপনার শরীর ভালো? খুব পরিশ্রম যাইতাছে? আইজ কয়জনের জান কবজ করছেন? তাঁর মাথা খানিকটা এলোমেলো অবস্থায় আছে। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রায়ই বলেন, যেসব গল্পের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই লতিফা

নামের একটা মেয়ের উল্লেখ থাকে। বাস্তবে লতিফা নামের কারোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। আদর করে মাঝে মাঝে লতিফাকে তিনি 'লতু' বলেও ডাকেন।

হাবীবের চেম্বার মফস্বল শহরের তুলনায় যথেষ্ট বড়। সেগুন কাঠের মস্ত টেবিলের তিনদিকে মক্কেলদের বসার ব্যবস্থা। মেঝের একপাশে ফরাস পাতা। মাঝে মাঝে রাত বেশি হলে মক্কেলরা থেকে যান। তখন বালিশের ব্যবস্থা হয়। মক্কেলরা ফরাসে ঘুমান। চেম্বারে দু'টা সিলিং ফ্যান আছে। কারেন্টের খুব সমস্যা হয় বলে টানা পাখার ব্যবস্থাও আছে। রশীদ নামের একজন পাংখাপুলার পাংখার দড়ি ধরে বসে থাকে। ফ্যান বন্ধ হওয়া মাত্র সে দড়ি টানা শুরু করে।

চেম্বারে তার দূরসম্পর্কের ভাই মোনায়েম খান সাহেবের বড় একটা ছবি আছে। ছবিতে তিনি এবং মোনায়েম খান পাশাপাশি দাঁড়ানো। দু'জনার গলাতেই ফুলের মালা। মোনায়েম খান তখন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর। হাবীবের আরেকটা বড় ছবি আছে আয়ুব খানের সঙ্গে। ইউনিফর্ম পরা জেনারেল আয়ুব তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। আয়ুব খান চশমা পরা, তাঁর মুখ হাসি হাসি। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি কিন্তু মোটামুটি অর্থহীন, কারণ হাবীবের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর মুখের খানিকটা অংশ দেখা গেলেও হতো, লোকে বুঝত যার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করা হচ্ছে তিনি দুঁদে অ্যাডভোকেট হাবীব খান। এই ছবির দিকে যতবারই তাঁর চোখ যায় তিনি মনে মনে বলেন, শুয়োরের বাচ্চা ফটোগ্রাফার! নেংটা করে পাছায় বেত মারা উচিত।

আজ শুক্রবার। হাবীব চেম্বারে মক্কেল নিয়ে বসেছেন। শুক্রবার তিনি চেম্বারে বসেন না। আজ বসতে হয়েছে কারণ মক্কেল শাঁসালো। খুনের মামলায় ফেঁসেছে। ৩০৫ ধারা। মক্কেল ভাটি অঞ্চলের বেকুব। সিন্ধি গাইয়ের মতো দিনে তিনবার দুয়ানো যাবে। হাবীব মক্কেলের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাচ্ছেন না। কারণ কিছুক্ষণ পরপর তাঁর মা'র তীক্ষ্ণ গলায় ডাক শোনা যাচ্ছে—হাবু! হাবুরে! ও হাবু! হাবীব খানের মুহুরি প্রণব বাবু বললেন, স্যার, আপনারে আম্মা ডাকেন। আগে শুনে আসেন। আম্মাকে ঠান্ডা করে আসেন। হাবীব বিরক্ত মুখে উঠে গেলেন। মনে মনে ঠিক করলেন চেম্বারটা এখান থেকে সরিয়ে এমন কোনো ঘরে নিতে হবে যেখান থেকে মা'র গলা শোনা যাবে না। এত বইপত্র নিয়ে চেম্বার সরানো এক দিগদারি। সহজ হতো মা'র ঘর সরিয়ে দেওয়া। সেটা সম্ভব না। হাজেরা বিবি ঘর ছাড়বেন না। কারণ দক্ষিণমুখী ঘর। সামনেই নিমগাছ। সারাক্ষণ নিমগাছের হাওয়া গায়ে লাগে। বৃদ্ধ বয়সে নিমের হাওয়ার মতো ওষুধ আর নাই।

হাবীব মা'র খাটের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ হাসি হাসি করে বললেন, ডাকেন কেন?

হাজেরা বিবি বললেন, তুই আছিস কেমন ?

ভালো আছি। আর কিছু বলবেন ? মক্কেল বসে আছে।

হাজেরা বিবি বললেন, ঝাঁটা মেরে মক্কেল বিদায় কর। তোর সাথে আমার জরুরি কথা।

বলেন, শুনি আপনার জরুরি কথা।

বাড়িতে কী ঘটেছে ?

হাবীব বললেন, কিছুই ঘটে নাই।

হাজেরা বললেন, শুনলাম সইন্ধ্যাকালে বাড়িতে এক ঘটনা ঘটবে।

কী ঘটনা ঘটবে ?

বাড়িতে কাজী সাহেব আসতেছে। বিবাহ পড়াবে ?

হাবীব মা'র খাটের পাশে বসতে বসতে বললেন, সবই তো জানেন। আপনাকে বলেছে কে ? যে আপনের কানে কথাটা তুলেছে তার নামটা বলবেন ? কে বলেছে ?

নাম বললে তুই কী করবি ? ফৌজদারি মামলা করবি ? তোর বউ লাইলী বলেছে। এখন যা মামলা কর। বৌরে জেলে ঢুকা। এই বাড়ির ভাত তার রুচে না। জেলের ভাত খাইয়া মোটাতাজা হইয়া ফিরুক।

হাবীব বললেন, লাইলী আপনাকে কতটুকু বলেছে সেটা শুনি।

হাজেরা বিবি বললেন, কী বলেছে মনে নাই। সইন্ধ্যাকালে কাজী আসবে, বিবাহ পড়াবে—এইটা মনে আছে। ঘটনা কি সত্য ?

হ্যাঁ সত্য। আর কিছু জানতে চান ?

জানতে চাই। ইয়াদ আসতেছে না। আচ্ছা তুই যা। মক্কেলের সাথে দরবার কর।

হাবীব সরাসরি তাঁর চেম্বারে গেলেন না। তিনি গেলেন রান্নাঘরে। লাইলীকে কঠিন কিছু কথা বলা দরকার। বারবার বলে দিয়েছিলেন, বিয়ের এই ঘটনা কেউ যেন না জানে।

রান্নাঘরে লাইলী মাছ কাটা তদারক করছেন। প্রকাণ্ড এক কাতল মাছ তিনজনে ধরেও সুবিধা করা যাচ্ছে না। হাবীব খানের মক্কেলের ভাটি অঞ্চলে জলমহাল আছে। সেখানকার মাছ। বিশাল টাটকা মাছ দেখাতেও আনন্দ। লাইলী মাথায় শাড়ির আঁচল তুলতে তুলতে বললেন, এক টুকরা মাছ কি ভেজে দিব ? খাবেন ?

দাও। আরেকটা কথা, ফরিদের বিবাহ বিষয়ে মা'কে তুমি কিছু বলেছ ?

বলেছি।

উনাকে বলতে নিষেধ করেছিলাম না? কেন বললা?

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন বলেই বলেছি। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করবেন, আর আমি মিথ্যা বলব?

হাবীব বললেন, উনার কাছে এখন সত্য-মিথ্যা সবই সমান।

লাইলী বললেন, উনার কাছে সমান কিন্তু আমার কাছে সমান না। আমার কাছে মিথ্যা, মিথ্যাই।

হাবীব রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন। স্ত্রীর সঙ্গে বাহাসে যাবার এটা উপযুক্ত সময় না। রান্নাঘরে মাছ কাটাকাটি হচ্ছে। সবাই কান পেতে আছে। কামলাশ্রেণীর মানুষের প্রধান কাজই হলো, ঝাঁকি জালের মতো কান ফেলা। হাবীব চেম্বারের দিকে রওনা হলেন।

চেম্বারে মুহুরি প্রণব বাবু ছাড়া মক্কেলরা কেউ নাই। তারা জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছে। খুনের মামলায় যে পড়ে সে এবং তার আত্মীয়স্বজনরা কখনো জুম্মার নামাজ মিস দেয় না।

প্রণব মুখে পান দিতে দিতে বললেন, ভালো পার্টি। এরকম পার্টি বৎসরে একটা পেলেও চলে। জলমহাল আছে তিনটা। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার আনতে কত খরচ লাগবে জানতে চাইল।

তুমি কী বললা?

আমি বললাম, বিলাতের খবর রাখি না। দেশের খবর রাখি। তখন সে বলল, পূর্বপাকিস্তানের সবচেয়ে বড় উকিল কে?

আমি বললাম, আপনি তো খোঁজখবর নিয়া তার কাছেই আসছেন। আবার 'জিগান' কোন কারণে? মনে সন্দেহ থাকলে কোর্ট কাচারিতে ঘুরেন। ঘুরে খবর নেন। তারপরে আসেন। আমরা তো আপনারে দাওয়াতের কার্ড ছাপায়া আনি নাই। তখন চুপ করে গেল। || মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

হাবীব বললেন, প্রণব, তোমার একটাই দোষ। কথা বেশি বলো। যে কথা বেশি বলে তার গুরুত্ব থাকে না। কথা হলো দুধের মতো। অধিক কথায় দুধ পাতলা হয়ে যায়।

প্রণব বললেন, কথা কম বলার চেষ্টা নিতেছি। পারতেছি না। শুনেছি তালের রস খেলে কথা বলা কমে। এই ভাদ্র মাসে তাল পাকলে একটা চেষ্টা নিব।

হাবীব বললেন, কাজী আসবে কখন?

প্রণব বললেন, রাত দশটার পর আসতে বলেছি। চুপিচুপি কর্ম সমাধা হবে। বিয়ে অধিক রাতে হওয়াই ভালো। আপনাদের তো সুবিধা আছে, লগ্নের কারবার নাই। যখন ইচ্ছা তখন কবুল কবুল কবুল।

হাবীব বললেন, ফরিদকে চোখে চোখে রাখতে বলেছিলাম, রেখেছ? পালিয়ে না যায়।

তার ঘরের দরজার সামনে সামছুকে বসায়ে রেখেছি। পালায়া যাবার পথ নাই। আর পালাবে বলে মনে হয় না। ঝিম ধরে বসে আছে। হারামজাদা।

গালাগালি করবে না।

প্রণব বললেন, কেন করব না স্যার? সে হারামজাদা না তো কে হারামজাদা! আরে তুই একটা মেয়ের পেট বাধায়েছিস, এখন তুই বিয়ে করবি না? তুই বিয়ে না করলে তোর বাপরে দিয়ে বিয়ে করাব।

কথা কম বলো প্রণব।

চেষ্টা করতেছি স্যার। রোজ ভোরে সূর্যপ্রণাম করে ভগবানকে বলি, ভগবান! দয়া করো। জবান কমাও।

হাবীব বললেন, আমাকে এক পিস ভাজা মাছ দিতে বলেছিলাম। কোনো খোঁজ নাই। তোমার বৌদিকে বলো মাছ লাগবে না।

হাবীবের কথা শেষ হবার আগেই বড় কাসার প্লেটে এক টুকরা মাছ চলে এল। বিশাল টুকরা। তাকিয়ে দেখতেও আনন্দ। মাছের সঙ্গে চামচ আছে। হাবীব হাত দিয়ে মাছ ভেঙে মুখে দিলেন। খাদ্যদ্রব্য হাত দিয়ে স্পর্শ করাতেও আনন্দ আছে। সাহেবরা কাটাচামচ দিয়ে খায়। খাদ্য হাত দিয়ে ছোঁয়ার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত।

মাছে লবণের পরিমাণ ঠিক আছে। এটা আনন্দের ব্যাপার। চায়ে চিনি এবং মাছে লবণ একই। সামান্য বেশকম হলে মুখে দেওয়া যায় না।

হাবীব বললেন, খুনটা করেছে কে?

নাম জহির। একুশ-বাইশ বছর বয়স। ঘরে লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল। সেটা দিয়ে নিজের আপন মামাকে গুলি করেছে। পুলিশ এখনো চার্জশিট দেয় নাই। অনেক টাকা খাওয়ানো হয়েছে। তবে চার্জশিট দু'এক দিনের মধ্যে দিবে।

খুনের কারণ কি মেয়েমানুষ?

সব শুনি নাই।

হাবীব বললেন, জগতের বড় যত crime তার সবের পেছনে একটা মেয়েমানুষ থাকবে। শুরুতে সেটা মাথায় রাখলে সুবিধা হয়। ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়ে গেল হেলেন নামের নাকবোঁচা এক মেয়ের জন্যে।

প্রণব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আফসোস!

হাবীব বললেন, তিন ধরনের নারীর বিষয়ে সাবধান থাকতে শাস্ত্রে বলে। সরু নিতম্বের নারী, বোঁচানাকের নারী আর পিঙ্গলকেশী নারী। এই তিনের মধ্যে ভয়ঙ্কর হলো পিঙ্গলকেশী।

প্রণব বললেন, আপনার সঙ্গে থাকা শিক্ষাসফরের মতো। এক জীবনে কত কিছু যে শিখলাম।

হাবীব বললেন, আজ জুম্মা পড়তে যাব না। জোহরের নামাজ ঘরে পড়ে নিব। শরীর ভালো ঠেকতেছে না। ঘরে বিশ্রাম নিব।

মক্কেলদের সঙ্গে বসবেন না ?

সন্ধ্যার পর বসব। মাগরেবের ওয়াক্তের পরে। তোমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছ ? পাক বসাবে না ?

প্রণব নিরামিশাষী। স্বপাকে আহার করেন। আজ নানান ঝামেলায় রান্না হয় নাই। প্রণব বললেন, আজ ঠিক করেছি উপাস দিব। মাসে দুই দিন উপাস দিলে শরীরের কলকব্জা ঠিক থাকে। ফকির মিসকিনদের যে রোগবালাই কম হয়, তার কারণ একটাই—তারা প্রায়ই উপাস দেয়।

হাবীব উঠে পড়লেন। প্রণবের সামনে বসে থাকলে সে বকবক করতেই থাকবে। হাবীবের সঙ্গে পাংখাপুলার রশিদও উঠে পড়ল। স্যারের গায়ে সাবান ডলে গোসল দেওয়ার দায়িত্ব তার। রশিদের স্বভাব প্রণবের উল্টা। সে নিজ থেকে কখনো কথা বলে না। সে সবার সব কথা শোনে। আট বছর আগে সে খুনের এক মামলায় ফেঁসেছিল। তার সঙ্গী দু'জনের ফাঁসি হয়েছে, সে বেকসুর খালাস পেয়েছে। হাবীব তাকে পাংখাপুলারের কাজ দিয়েছেন।

চেম্বার থেকে বের হয়ে হাবীব ডানদিকে তাকালেন। তাঁর ডানদিকে শেষ প্রান্তে ফরিদের ঘর। টিনের চালের হাফবিল্ডিং। সামনে প্রকাণ্ড অশোকগাছ। লাল ফুলে গাছ ভর্তি। ফরিদ মাথা উঁচু করে ফুলের দিকে তাকিয়ে কাঠের চেয়ারে বসে আছে। হাবীবকে সে দেখেনি। দেখলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াত। তিনি ডাকলেন, ফরিদ।

ফরিদ থতমত খেয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতেও ভুলে গেল। হাবীব এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

ফরিদ, আছ কেমন ?

জি। ভালো।

আজ তোমার বিবাহ। বিবাহের দিন লুঙ্গি পরে খালিগায়ে বসে আছ, এটা কেমন কথা ?

ফরিদ কিছু বলল না। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাবীব বললেন, তোমাকে যে আমি বিশেষ স্নেহ করি এটা জানো ?

ফরিদ বিড়বিড় করে বলল, জানি।

হাবীব বলল, বিশেষ স্নেহ করি বলেই এত বড় অন্যায়ের পরেও তোমাকে কোনো শাস্তি দেই নাই। অন্যায়টা যার সঙ্গে করেছ, তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি। এখনো বলো তোমার কোনো আপত্তি কি আছে ?

না।

এই মেয়েকে তুমি আগে ব্যবহার করেছ বেশ্যার মতো, এখন সে তোমার স্ত্রী হবে। সেটা খেয়াল রাখবে।

জি, রাখব।

প্রণবকে বলে দিব যেন নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি কিনে দেয়। মাথার চুল কাট। বিবাহের দিন চুল কাটা উত্তম সুন্নত।

হাবীব দোতলায় উঠে গেলেন। সিঁড়ির শেষ মাথায় হঠাৎ তাঁর পা পিছলাল। রশিদ পেছন থেকে দ্রুত ধরে ফেলায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল না। হাবীব সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দুর্ঘটনা আজ প্রথম ঘটেনি। আগেও দু'বার ঘটেছে এবং একই জায়গায় ঘটেছে। এর মধ্যে কি কোনো ইশারা আছে ?

রশিদ বলল, স্যার দুঃখু পাইছেন ?

না। আজ তোমার পাংখা টানাটানি করতে হবে না। ফরিদের বিবাহের ব্যাপারটা দেখো।

জে আচ্ছা।

আরেকটা কাজ করো। মাওলানা সাহেবরে খবর দাও। তিনি যেন দোয়া পড়ে সিঁড়িটাতে ফুঁ দেন। এই সিঁড়িতে দোষ আছে।

জে আচ্ছা।

ফরিদের সঙ্গে যার বিবাহ হবে তার নামটা যেন কী ? হঠাৎ করে নাম বিস্মরণ হয়েছি।

তার নাম সফুরা।

আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তুমি যাও।

রশিদ সঙ্গে সঙ্গে গেল না। হাবীবকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে ফ্যান ছাড়ল। ইলেকট্রিসিটি আছে। সিলিং ফ্যান বিকট শব্দ করে ঘুরছে।

রশিদ বলল, পানি খাবেন স্যার ? এক গ্লাস পানি দিব ?

না।

সিনান কখন করবেন?

পানি গরম দাও, খবর দিব। ভালো কথা, চুল কাটার পর ফরিদকে ভালোমত সাবান ডলে গোসল দিবা।

জি আচ্ছা।

জীবনে তিনবারের গোসল অতি গুরুত্বপুর্ন। জন্মের পর, বিবাহের দিন এবং মৃত্যুর পর। এই তিন গোসলেই বড়ইপাতা লাগে, এইটা জানো?

জে না।

তবে আজকাল জন্মের পরের গোসল আর বিবাহের গোসল—এই দুই গোসলে বড়ইপাতা ব্যবহার হয়না। কেন হয়না কে জানে!

ফরিদ ভাইরে কি বড়ইয়ের পাতা দিয়া গোসল দিব?

দাও।

হাবীব বিছানায় শুয়ে পরলেন। শরীর ছেড়ে দিয়েছে। জ্বর আসার আগে আগে শরীর ছেড়ে দেয়। মক্কেলদের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় বসতে পারবেন—এই রকম মনে হচ্ছে না। বমি বমি ভাবও হচ্ছে। এত বড় মাছের টুকরাটা খাওয়া ঠিক হয় নাই।

উপন্যাসের এই পর্যায়ে ফরিদের এ বাড়িতে আগমন এবং স্থায়ী হওয়ার ঘটনা বলা যেতে পারে। 'মাতাল হাওয়া'য় ফরিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। মাঝে মাঝে গুরুত্বহীন মানুষকে অতি গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। অভাজন হয়ে যান বিশেষ জন।

শ্রাবন মাসের সন্ধ্যাবেলা। হাবীব মসজিদে মাগরীবের নামাজ শেষ করে ফিরছেন। রশিদ ছাতা হাতে তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। ছাতার প্রয়োজন ছিল না। বৃষ্টি পড়ছে না। তবে আকাশের অবস্থা ভালো না। মেঘ ডাকাডাকি করছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। ছাতা মেলে প্রস্তুত থাকা ভালো।

হাবীব বাড়ির গেটের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। গেটে হাত রেখে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যুবক তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেট ছেড়ে সরে দাঁড়াল। অস্পষ্ট শব্দে বিড়বিড় করল। মনে হয় সালাম দিল। হাবীব বললেন, কে? নাম কী?

ফরিদ।

কিছু চাও?

জে না।

কিছু চাও না, তাহলে আমার বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এই বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ?

জে না।

এই বাড়ির কাউকে চেনো ?

না।

ঠিকমতো বলো, চুরি-ডাকাতির ধান্দা আছে ?

ফরিদ বলল, স্যার, আমি আরাম করে একবেলা ভাত খেতে চাই।

দুপুরের খাওয়া হয় নাই ?

না।

সকালে কী খেয়েছ ?

মুড়ি।

ভাত খাও না কত দিন ?

তিন দিন।

করো কী ?

ফার্মেসিতে চাকরি করতাম। চাকরি চলে গেছে।

চাকরি কী জন্যে গেছে ? চুরি করেছিলা ?

জি।

কত টাকা চুরি করেছিলা ?

দুইশ টাকা আর কিছু ওষুধ।

টাকা এবং ওষুধ কাকে পাঠায়েছিলা ?

স্যার, আমার মা'কে। উনার টিবি হয়েছিল।

উনি কি বেঁচে আছেন ?

জি-না। উনার ইন্তেকাল হয়েছে।

বাবা কি জীবিত ?

জি-না।

আসো আমার সঙ্গে। চেম্বারে গিয়ে বসো। খানা হতে দেরি হবে। অপেক্ষা করো। কী খেতে চাও ?

কষানো মুরগির সালুন আর চিকন চালের ভাত।

আর কিছু না ?

জি-না।

চেম্বারের সামনের বেঞ্চিতে ফরিদ জবুথবু হয়ে বসে রইল। বৃষ্টি নেমে গেছে। সে বৃষ্টি দেখছে। রাতে সে আরাম করে খেতে পারবে—এই আনন্দেই তার চোখে পানি এসে গেছে। চোখের পানি আটকানোর কোনো চেষ্টা সে করছে না। আশেপাশে কেউ নেই যে তাকে দেখবে।

ফরিদের বয়স পঁচিশ। অসম্ভব রোগা একজন মানুষ। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখ বড় বড়। সে মেট্রিকে তিনটা লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল। কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। সংসার চালানোর জন্যে ফার্মেসিতে চাকরি নিতে হয়েছিল।

হাবীব ফরিদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ঘরে মুরগি ছিল না। তিনি কষানো মুরগি রাঁধতে বললেন। কালিজিরা চালের ভাত করতে বললেন। রশিদকে বলে দিলেন, ফরিদকে থাকার জন্যে যেন একটা ঘর দেওয়া হয়। যতদিন ইচ্ছা সে থাকবে। খাওয়াদাওয়া করবে।

রশিদ বিস্মিত হয়ে তাকাল। হাবীব বললেন, বড় বড় বাড়ির শোভা হচ্ছে কিছু উটকা মানুষ। আশ্রিত মানুষ। এরা বাড়ির সঙ্গে যুক্ত না। কোনো কাজেকর্মে না। থাকবে, খাবে এবং লজ্জিত হয়ে জীবনযাপন করবে। এদের লজ্জাটাই বাড়ির শোভা। বুঝেছ?

জি।

তুমি বোঝো নাই। বোঝার প্রয়োজনও নাই। যা করতে বলেছি করো। এই ধরনের মানুষ কিছুদিন থাকে, তারপর একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। ত্রিশ দিনের মাথায় চলে যায়। এই ছেলেও তাই করবে।

ফরিদ তা করেনি। সে তিন বছর ধরে আছে। সে নিজ থেকেই বাগানের গাছপালা দেখে। নানান জায়গা থেকে গাছ এনে লাগায়। আশেপাশে যখন কেউ থাকে না, তখন নিচুগলায় গাছের সঙ্গে কথা বলে। তেঁতুলগাছের সঙ্গে তার এক দিনের কথাবার্তার নমুনা—

আছ কেমন? ছোট হয়া আছ, বিষয় কী? আদরযত্নের কি কমতি হইতেছে? গোবর সার, পচা খইল সবই তো পাইছরে বাপধন। আরও কিছু লাগবে? লাগলে বলো। সর্বনাশ, পাতায় পোকা ধরছে! দাঁড়াও নিমের ডাল দিয়া ঝাড়া দিব। নিমের ডালের ঝাড়া হইল কোরামিন ইনজেকশন। তবে তোমার পোকায় ধরা ডাল ফেলে দিব। একটু কষ্ট হবে। উপায় কী?

বিশাল কাতল মাছ রান্না হয়েছে, হাবীব খেলেন না। তাঁর জ্বর এসেছে। জ্বর গায়ে নিয়েই গোসল করেছেন। এতে সামান্য আরাম পাচ্ছেন। ঘুম এসেছে। ঘুমের

মধ্যে স্বপ্ন দেখছেন। অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নগুলিও অসুস্থ হয়। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হাতির পিঠে করে নদী পার হচ্ছেন। নদীতে প্রবল স্রোত। হাতি ঠিকমতো সাঁতরাতে পারছে না। মাহুত মুখে হুট হুট করছে। হাতি সামলানোর চেষ্টা করছে। পারছে না।

রাত দশটায় তাঁর ঘুম ভাঙানো হলো। ছোট্ট সমস্যা না-কি হয়েছে। কাজী সাহেব এসেছেন। সব প্রস্তুত। শুধু সফুরা এখন বলছে সে কবুল বলবে না। বিবাহ করবে না। খবর নিয়ে এসেছেন প্রণব বাবু। তাকে চিন্তিত এবং ভীত মনে হচ্ছে।

হাবীব বললেন, বিবাহ করবে না। পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুরবে। বড় বাড়ির ইজ্জত নষ্ট করবে।

প্রণব চুপ করে রইলেন।

হাবীব বললেন, নৌকা ঠিক করো। মেয়েটাকে নৌকায় তুলে দাও। নৌকা তাকে ভাটি অঞ্চলে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সেখানে সে যা ইচ্ছা করুক। এই জাতীয় মেয়ের স্থান হয় বেশ্যাপল্লীতে। শেষ পর্যন্ত সে সেইখানেই যাবে।

প্রণব বললেন, ফরিদকেও নাওয়ে তুলে দেই, মেয়ের সাথে বিদায় হয়ে যাক।

হাবীব বললেন, না। সে তো বিবাহ করতে রাজি হয়েছে। যে মেয়ে তার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, সে ভালো মেয়ে না। অন্যের সঙ্গেও সে এই কাজ করতে পারে। তারপরেও ফরিদ বিবাহে মত দিয়েছে, এরে ছোট করে দেখা ঠিক না। তার দোষ এতে কিছু কাটা গেছে। মেয়েটাকে বিদায় করে আমাকে খবর দাও যেন শান্তিমতো ঘুমাতে পারি।

প্রণব চলে গেলেন এবং আধঘণ্টার মধ্যে জানালেন, সমস্যার সমাধান হয়েছে। সফুরার সঙ্গে এক শ' এক টাকা কাবিনে ফরিদের বিবাহ হয়েছে।

হাবীব বললেন, ভালো।

প্রণব বললেন, আপনার জ্বর কি বেশি? একজন ডাক্তার ডেকে আনি?

হাবীব বললেন, না। মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করতে বলো। আর জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে স্বপ্নের তফসির নিয়ে আসো। স্বপ্নে আমি হাতির উপর উঠেছি। হাতি নদী পার হচ্ছে। নদীতে প্রবল স্রোত।

রাত প্রায় বারোটা। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। শহর অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাস দিচ্ছে। এখনো বর্ষণ শুরু হয়নি। ফরিদের নবপরিণীতা স্ত্রী চৌকিতে বসে কাঁদছে। তার মুখ জানালার দিকে ফেরানো বলে ফরিদ মুখ দেখতে পাচ্ছে না। চৌকির ওপর মশারি খাটানো। বাতাসে নৌকার পালের মতো মশারি উড়ছে।

ফরিদ মশারি ঠিক করতে ব্যস্ত। ঘরে হারিকেন জ্বলছে। তবে হারিকেন দপদপ করছে। যে-কোনো সময় হারিকেনও নিভবে। ফরিদ বলল, রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়ো।

সফুরা বলল, আপনে আমার সাথে কথা কবেন না। আমার গায়ে হাত দিবেন না। শইলে যদি হাত দেন দাও দিয়া কোপ দিব। হাত ফালায়া দিব।

ফরিদ বলল, আমি কী দোষ করলাম?

দোষ করেন নাই?

ফরিদ বলল, না। তুমি জানো, আল্লাহপাক জানেন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু হয় নাই। কারোর সঙ্গেই কিছু হয় নাই। আমি সেরকম মানুষ না। তুমি মহাবিপদে পড়েছিলা বলে সাহায্য করেছি। একবার আমিও মহাবিপদে পড়েছিলাম। স্যার সাহায্য করেছেন। একজনের বিপদে অন্যজন সাহায্য করবে এইটাই নিয়ম।

সফুরা বলল, যে দোষ করেন নাই সেই দোষ নিজের ঘাড়ে কী জন্যে নিয়েছেন?

একটা কারণ আছে। কোনো একদিন তোমারে বলব। কান্দন বন্ধ করো।

সফুরা বলল, আমি সারা রাত কানব। আপনের অসুবিধা আছে?

আমি ঘুমাইতে পারব না। এইটাই অসুবিধা।

আইজ রাইতে আপনি ঘুমাইতে পারবেন?

কেন পারব না!

আপনে মানুষ না। আপনে গাছ। গাছের সাথে যে কথা বলে, সে গাছই হয়।

আমি গাছের সাথে কথা বলি তুমি জানো?

সবেই জানে।

ফরিদ বলল, এই তো তোমার কান্দা বন্ধ হইছে। তুমি অত্যধিক সুন্দর মেয়ে, এইটা আগে নজর করি নাই।

সফুরা বলল, আগে নজর করলে কী করতেন? ইশারা দিতেন? বিছানার ইশারা?

ছিঃ, এমন চিন্তা করবা না। সব মানুষ একরকম না। কিছু মানুষ আছে ফেরেশতারও উপরে।

সফুরা বলল, মানুষ তো ফেরেশতার উপরেই। ফেরেশতার যে সর্দার সে মানুষরে সালাম করছিল।

বাহ্‌, সুন্দর বলেছ। সব মানুষই ফেরেশতার উপরে। তোমার কথা শুনে মনে বল পেয়েছি।

সফুরা বলল, আমি একটা নটি মাগি। আমার কথা শুনে মনে বল পেয়েছেন?

নিজের বিষয়ে এইভাবে বলবা না।

দমকা বাতাসে হারিকেন নিভে গেল। তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। স্বামী-স্ত্রী অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। এক পর্যায়ে সফুরা বলল, আপনে শুইয়া পড়েন। আপনে বইসা আছেন কোন দুঃখে? ঠান্ডা বাতাস ছাড়ছে, আরামে ঘুম দেন। মাথা টিপ্যা দিতে বললে মাথা টিপ্যা দিব।

ফরিদ বলল, গল্প শুনবা? একটা গল্প বলব?

বলতে চাইলে বলেন। আমারে গাছ ভাবছেন? ভাবছেন গাছের মতো আমিও আপনের গফ শুইন্যা মজা পাব? আমি গাছ না।

ফরিদ বলল, এক কাঠুরের গল্প। সে কাঠ কাটতে বনে গিয়েছে। হঠাৎ তার কুড়ালটা পড়ে গেল পানিতে। মনের দুঃখে সে কাঁদছে। তখন পানি থেকে জলপরী উঠে এসে বলল, কুড়ালের জন্যে কাঁদছ? এই সোনার কুড়ালটা কি তোমার?

সফুরা বলল, এই গল্প আমি জানি। কাঠুরে বলল, না। তখন জলপরী একটা রুপার কুড়াল তুলে বলল, এইটা তোমার? কাঠুরে বলল, না। আমার কুড়াল লোহার। তখন তার ভালোমানুষি দেখে জলপরী খুশি হয়ে তিনটা কুড়ালই দিয়ে দিল।

ফরিদ বলল, আমি যে গল্পটা বলব সেটা এখানেই শেষ না। আরেকটু আছে। বলি?

বলেন।

সেই কাঠুরে অনেকদিন পর তার স্ত্রীকে নিয়ে বনে বেড়াতে গেছে। হঠাৎ স্ত্রী পানিতে পড়ে ডুবে গেল। কাঠুরে কান্না শুরু করেছে। জলপরী অতি রূপবতী রাজকন্যার মতো এক মেয়েকে পানি থেকে তুলে বলল, এই কি তোমার স্ত্রী?

কাঠুরে বলল, জি এই আমার স্ত্রী।

জলপরী বলল, ভালো করে দেখে তারপর বলো।

কাঠুরে বলল, আর দেখতে হবে না। এই আমার স্ত্রী।

জলপরী বলল, আগের বার তোমার সততা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখন তুমি এটা কী করলে? রূপবতী মেয়ে দেখে স্ত্রীকে ভুলে গেলে?

তখন কাঠুরে বলল, আমি বাধ্য হয়ে বলেছি এইটাই আমার স্ত্রী। যদি না বলতাম, আপনি এরচেয়ে একটু কম সুন্দর আরেকটা মেয়ে তুলতেন। আমি যদি বলতাম এই মেয়ে না। আপনি সবশেষে আমার স্ত্রীকে তুলতেন এবং আগের বারের মতো তিনজনকেই আমাকে দিয়ে দিতেন। আমি নিতান্তই গরিব মানুষ। তিন বউকে পালব কীভাবে ? এই কারণে প্রথমবারই বলেছি এটা আমার স্ত্রী।

সফুরা বলল, ও আল্লা! সুন্দর তো।

ফরিদ বলল, গল্পটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?

সফুরা বলল, হয়েছে।

ফরিদ বলল, এই গল্পটা তোমাকে কেন বললাম জানো ? গল্পটা বললাম যেন তুমি বুঝতে পারো আমি কত গরিব। ওই কাঠুরের তিনজন স্ত্রী পালার ক্ষমতা নাই। আমার অবস্থা তারচেয়ে অনেক খারাপ। আমার একজন স্ত্রী পালার ক্ষমতাও নাই।

ফরিদের কথা শেষ হতেই দোতলা থেকে হাজেরা বিবির তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, হাবু, হাবু! ও হাবু! হাবুরে!

ফরিদের বিয়ের তারিখ ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সন। এই তারিখটা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে এই দিন শেখ মুজিবুর রহমান বেকসুর খালাস পান। হাসিমুখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি বের হলেন। ফুলের মালা নিয়ে অনেকেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের সময় দিতে হবে। মিছিল করে ফেরার পথে বক্তৃতা দিতে হতে পারে। দীর্ঘ কারাবাসে তার শরীর এবং মন—দুইই ক্লান্ত। দ্রুত ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে। ঘরে ফিরে গরম পানি দিয়ে গোসল। গোসল শেষে অনেক দিন পর স্ত্রীর হাতের রান্না খাবার। কয়েকদিন থেকেই কেন জানি পুঁটি মাছের কড়কড়া ভাজি আর ছোট টেংরা মাছের টক খেতে ইচ্ছা করছে। আজ কি সম্ভব হবে ? মনে হয় না।

জেলগেটের বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হলো। এবার দেশরক্ষা আইনে না। এবার গ্রেফতার হলেন, আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্স অ্যাক্টে। তাঁকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো কুর্মিটোলা সেনানিবাসে।

হাবীব সারা দিনে একবারই খবর শোনেন। রাতের শেষ ইংরেজি খবর। তিনি রাতের খবরে জানলেন দু'জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ববাংলা বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তারা ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে গোপন মিটিং চালাচ্ছিল। দেশ ধ্বংস ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক—শেখ মুজিবুর রহমান।

হাবীব বিড়বিড় করে বললেন, এইবার আর রক্ষা নাই। ঝুলে পড়তে হবে। তিনি শোবার আয়োজন করলেন। স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা। স্ত্রী প্রথম বিছানায় যাবে, তারপর স্বামী—এটাই নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ব্যতিক্রম হলে স্বামীর আয়ু কমে।

লাইলী পানের বাটা নিয়ে ঢুকলেন। হাবীব পানের বাটা থেকে এক টুকরা লং নিয়ে মুখে দিলেন। লাইলী বললেন, একজন নির্দোষ মানুষরে আপনারা দোষী করলেন ?

কে নির্দোষ ? কার কথা বলো ?

ফরিদের কথা বলি।

সে নির্দোষ কীভাবে জানো ?

লাইলী হাই তুলতে তুলতে বললেন, জানি।

হাবীব বললেন, বেশি জানবা না এবং বেশি বুঝবা না। যারা বেশি জানে এবং বেশি বোঝে তারাই বিপদে পড়ে। যেমন শেখ মুজিবুর রহমান। সে বেশি বুঝে ফেলেছিল। এখন তাকিয়ে আছে ফাঁসির দড়ির দিকে। আমাকে অজুর পানি দাও।

লাইলী বললেন, এশার নামাজ তো পড়েছেন। আবার অজুর পানি কেন ?

তাহাজ্জুত পড়ব। মন অস্থির হয়েছে।

মন অস্থির কেন ?

এত কথা তোমারে বলতে পারব না। অজুর পানি দিতে বলেছি—পানি দাও। আরেকটা কথা, এই বৎসর এখনো খেজুরের রস খাওয়া হয় নাই। কাল সকালে খেজুরের রস খাব।

হাবীব চেম্বারে বসেছেন। তাঁর সামনে মক্কেলরা বসা। সামনের সারিতে বসেছে তিনজন, তাদের পেছনে বোরকাপরা এক মহিলা। এমন কঠিন বোরকা যে মুখও দেখা যাচ্ছে না। এই গরমেও বোরকাপরা মহিলার গায়ে কাজ করা হলুদ রঙের চাদর। হাবীবের সঙ্গে প্রণব বসে আছেন। প্রণবের মুখভর্তি পান। রশিদ পাংখা টেনে যাচ্ছে। হাবীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মক্কেলদের চোখের দিকে তাকালেন। কথাবার্তা শুরুর আগে তাদের ভাবভঙ্গি দেখা প্রয়োজন।

সবচেয়ে বয়স্কজনের গায়ের রঙ পাকা ডালিমের মতো। চুল-দাড়ি সবই ধবধবে সাদা। তাঁর দৃষ্টি ভরসাহারা। চোখের নিচে কালি। তিনি লম্বা আচকান পরেছেন। তাঁর হাতে তসবি। তিনি তসবির গুটি টেনে যাচ্ছেন। তাঁর দু'পাশে যে দু'জন বসা তারা টাউটশ্রেণীর তা বোঝা যাচ্ছে। মামলা-মোকদ্দমা জাতীয় বিপদে টাউট জুটে যায়। একজনের থুতনিতে অল্প দাড়ি। মাথায় বেতের টুপি। চোখে সুরমা। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। অন্যজন যুবা বয়সের। শার্ট-প্যান্ট পরা। তার গা থেকে সেন্টের গন্ধ আসছে। হাবীব বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আসামির কে হন?

বৃদ্ধ বললেন, পিতা।

নাম?

রহমত রাজা চৌধুরী।

হজ্জ করেছেন?

জি জনাব। দুইবার হজ্জ করেছি।

আপনার সঙ্গে এই দুইজন কে?

একজন আমার গ্রামসম্পর্কের ভাতিজা, নাম সুলায়মান। হজ্জ করেছে। মামলা-মোকদ্দমা ভালো বোঝে। আরেকজন আমার দূরসম্পর্কের ভাই। নাম ইয়াকুব।

আপনার ভাই ইয়াকুব, তিনিও কি মামলা-মোকদ্দমা ভালো বোঝেন?

জি জনাব। জলমহাল নিয়ে একটা হাঙ্গামায় পড়েছিলাম, সে নানান সাহায্য করেছে। তার 'উনসুনি' বুদ্ধি ভালো।

হাবীব বললেন, এই দু'জনকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলেন। যারা মামলা-মোকদ্দমা ভালো বোঝে তাদের সামনে আমার কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হয়। কারণ আমি নিজে মামলা-মোকদ্দমা কম বুঝি।

বৃদ্ধ তাঁর দুই সঙ্গীকে নিচুগলায় কিছু বললেন। দু'জনেই কঠিন মুখ করে না-সূচক মাথা নাড়ল। একজন (ইয়াকুব) হাবীবের দিকে তাকিয়ে বলল, জনাব, আমাদের থাকার প্রয়োজন আছে। মামলার অনেক খুঁটিনাটি আমরা জানি। হাজি সাহেব সুফি মানুষ, তিনি বলতে গেলে কিছুই জানেন না।

হাবীব বললেন, আপনি অনেক কিছু জানেন?

জি, অবশ্যই।

খুনটা কে করেছে? আপনি?

আমি কেন খুন করব? এইসব কী বলেন?

হাবীব বললেন, আপনি খুন না করলে সব খুঁটিনাটি জানবেন কীভাবে?

হাজি সাহেব বললেন, এই তোমরা যাও। বাইরে অপেক্ষা করো।

নিতান্ত অনিচ্ছায় দু'জন উঠে গেল। হাবীব বললেন, হাজি সাহেব, আপনার পেছনের মহিলা কে?

আমার ভাগ্নি। জনাব, সে থাকুক। সে শুধু শুনে যাবে, কোনো কিছুই বলবে না।

হাবীব বললেন, উনি থাকলে আমার সমস্যা নাই। আমি টাউট অপছন্দ করি। যাই হোক, আমি প্রশ্ন করলে সত্য উত্তর দিবেন। উকিল এবং ডাক্তার এদের কাছে মিথ্যা বললে পরে বিরাট সমস্যা হয়।

হাজি সাহেব বললেন, জনাব, আমি এম্নিতেই সত্য কথা বলি। অভাবি মানুষ মিথ্যা বেশি বলে। আমি অভাবি না।

খুব ভালো। খুন আপনার ছেলে করেছে?

জি।

কে খুন হয়েছে?

ছেলের আপন মামা। আমার বড় শ্যালক। তার নাম আশরাফ। আশরাফ আলি খান। খাঁ বংশ।

খুনটা কী কারণে হয়েছে?

এই বিষয়ে আমি জানি না। ছেলে কিছু বলে নাই। সে বলবে না।

ঘটনা কীভাবে ঘটেছে বলুন।

আমার বড় শ্যালক আশরাফ আলি খান ব্যবসা করে। মোহনগঞ্জে এবং ধর্মপাশায় তার বিরাট পাটের ব্যবসা। একটা লঞ্চও আছে। বর্ষাকালে ভাটি অঞ্চলে লঞ্চ চলাচল করে। আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই মোহনগঞ্জে মামার সঙ্গে থাকে।

কেন ?

ভাটি অঞ্চলে কোনো স্কুল নাই। মামার সঙ্গে থেকে ছেলে মোহনগঞ্জ পাইলট স্কুলে পড়েছে। আমার ছেলে লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো। মাশাল্লাহ। সে চারটা লেটার নিয়ে মেট্রিক পাশ করেছে। সিলেট এম সি কলেজ থেকে স্টার মার্ক পেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে।

খুনটা কীভাবে হয়েছে সেটা বলুন। ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে পরে জানব।

আমার বড় শ্যালক ফজরের নামাজের অজু করে নামাজে বসেছে, তখন আমার ছেলে দু'নলা বন্দুক দিয়ে দু'টা গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

ঘটনা কেউ দেখেছে ?

বারান্দায় নামাজ পড়ছিল, ইমাম সাহেব ছিলেন। উনি দেখেছেন। তারপর সবাই ছুটে এসেছে।

পুলিশ চার্জশিট দিয়েছে ?

এখনো দেয় নাই। তদন্ত চলছে।

আপনার ছেলে কি পুলিশ কাস্টডিতে ?

হাজি সাহেব বললেন, জি-না। পুলিশ তাকে খুঁজছে। কিন্তু সে পলাতক। তাকে শিলচর পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে আমার এক আত্মীয় আছে।

হাবীব বললেন, একটু আগে বললেন, আপনি মিথ্যা বলেন না। এখন তো মিথ্যা বললেন। ছেলে আপনার সঙ্গেই আছে। বোরকাপরাটা আপনার ছেলে। ছেলের নাম কী ?

হাসান রাজা চৌধুরী।

হাবীব কঠিন গলায় বললেন, হাসান রাজা চৌধুরী, বোরকা খোলো।

হাজি সাহেব বললেন, একগ্লাস পানি খাব।

প্রণব পানি আনার জন্যে উঠে গেলেন। হাবীব বিরক্তমুখে সিগারেট ধরালেন। হাসান রাজা চৌধুরী বোরকা খুলল। হাবীব অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে এমন রূপবান পুরুষ দেখেননি। কোরান শরিফে অতি রূপবান হিসেবে ইউসুফ নবীর কথা বলা আছে। সেই নবী কি সামনে বসে থাকা ছেলেটির চেয়েও সুন্দর ছিলেন ?

হাবীব বললেন, মক্কেলের সঙ্গে আমি মামলা ছাড়া অন্য বিষয়ে আলাপ করি না। আজ অন্য একটা প্রসঙ্গে কথা বলব। হাজি সাহেব, আমি আপনার ছেলের মতো রূপবান পুরুষ দেখি নাই। প্রণব, তুমি কি দেখেছ?

প্রণব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, একবার দেখেছিলাম। শম্ভুগঞ্জ বাজারে কাপড়ের আড়তে সে বসা ছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম তার নাম মনীন্দ্র। তাকে দেখার জন্যে ভিড় জমে গিয়েছিল। ছয় ফুটের মতো লম্বা। ইংরেজ সাহেবদের মতো গাত্রবর্ণ। আমি যখন বললাম, আপনার নাম এবং পরিচয় কি জানতে পারি? তখন...

হাবীব বললেন, প্রণব, বাকিটা পরে শুনব। এখন একটু বাইরে যাও। রশিদ, তুমিও যাও। আমি এই দু'জনের সঙ্গে প্রাইভেট কিছু কথা বলব।

প্রণব অপ্রসন্ন মুখে উঠে গেলেন। মামলা-মোকদ্দমার প্রাইভেট কথায় তিনি থাকবেন না কেন তা বুঝতে পারছেন না।

হাবীব বললেন, হাজি সাহেব, আপনার মামলা আমি নিব। ছেলের পলাতক থাকাটা ঠিক না। পলাতক থাকার অর্থ অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া। খুনের মামলায় পলাতক আসামির বেশির ভাগ সময় মৃত্যুদণ্ড হয়।

হাজি সাহেব বললেন, ছেলেকে কি পুলিশের হাতে তুলে দিব?

এখনো না। যখন বলব তখন। আরও মাসখানিক সে পলাতক থাকতে পারে। আমি মামলা গুছিয়ে আনার পর সে পুলিশের কাছে ধরা দিবে। তবে আপনি যে ছেলেকে বোরকা পরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখছেন তা ঠিক না। আপনার দুই সঙ্গীও বিষয়টা জানে। এটাও ঠিক না। ছেলে এমন জায়গায় থাকবে যে আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না।

হাজি সাহেব বললেন, আমার এমন কোনো জায়গা নাই। শিলচরে আমার খালাত ভাই থাকে। ছেলে সেখানে যেতে রাজি না।

আপনি কোথায় থাকেন?

আমি হোটেলে উঠেছি। হোটেলের নাম 'আল হেলাল'।

আপনার ছেলেও আপনার সঙ্গে থাকে?

জি।

আপনার দুই সঙ্গীকে না জানিয়ে ছেলেকে আমার এখানে দিয়ে যাবেন। সে আমার এখানে লুকিয়ে থাকবে। আপনি একা পারবেন না। আমার পাংখাপুলার রশিদকে পাঠাব। সে অতি বিচক্ষণ। আমার এখানে ছেলেকে রাখতে আপনার আপত্তি আছে?

হাজি সাহেব বললেন, জি-না জনাব। ছেলের মত আছে কি না একটু জেনে নেই।

হাবীব কঠিন গলায় বললেন, আপনার ছেলের মতামত বলে এখন কিছু নাই। যেদিন মামলার রায় হয়ে যাবে, হাইকোর্ট থেকে আপিলের ফলাফল হাতে আসবে, তখন তার মতামত শুরু হবে।

হাজি সাহেব বললেন, আমি খবর নিয়েছি অনেক খুনের আসামিকে আপনি ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার ছেলেকে কি ছাড়িয়ে আনতে পারবেন?

হাবীব বললেন, ছেলে যদি বলে আমি খুন করেছি তাহলে ছাড়িয়ে আনতে পারব না। তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

এই প্রথম হাসান রাজা চৌধুরী মুখ খুলল। সে শান্ত গলায় বলল, আমি মিথ্যা কথা বলব না।

হাবীব বললেন, তাহলে তো বাবা আমার কাছে খামাখা এসেছ। সত্যি কথা বলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ো। তোমাকে আমি একটা কথা বলি, তুমি ফাঁসিতে ঝুললে আমার কিছু যায় আসে না। আবার তুমি খালাস পেয়ে নৌকাবাইচ খেললেও কিছু যায় আসে না। বুঝেছ?

হাসান বলল, জি।

হাবীব বললেন, আমার অনুমানশক্তি ভালো। তুমি খুনটা কেন করেছ সেটা আমি অনুমান করতে পারি। বলব আমার অনুমান?

হাসান বলল, না।

হাবীব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, চিন্তাভাবনা করে ঠিক করুন কী করবেন?

হাজি সাহেব বললেন, আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

হাবীব বললেন, জি। গভর্নর মোনায়েম খানকে আজ বার কাউন্সিল থেকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমি বার কাউন্সিলের প্রধান।

সময় ১৯৬৮, এশিয়ার লৌহমানব বলে স্বীকৃত আয়ুব খান হাসি হাসি মুখে পাকিস্তানের সব ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করছেন। পূর্ব এবং পশ্চিম, দুই পাকিস্তানেই তার উন্নয়নের দশ বছর পালিত হচ্ছে। বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা।

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতি আরও প্রবল করার বাসনায় তিনি এক সভায় ঘোষণা করলেন, বাংলা-উর্দু মিলিয়ে এক নতুন ভাষা পাকিস্তানে তৈরি করা হবে। ভবিষ্যতের পাকিস্তানিরা এই ভাষাতেই কথা বলবে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ঘোষণা করল বাংলা বর্ণমালা লিখন রীতির সংস্কার করা প্রয়োজন।*

পূর্বপাকিস্তানে মোনায়েম খান নামের একজনের রাজত্বকাল। তাঁর উত্থানের গল্পটি এরকম—তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ বারের অতি সাধারণ একজন ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার। আয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি নামের অদ্ভুত পদ্ধতিতে এমএলএ হন। নির্বাচিত এমএলএ-রা যাবেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে সংসদ বসবে। এয়ারপোর্টে ছাত্ররা তাদের ঘিরে ধরল। তাদের দাবিদাওয়া যেন সংসদে পেশ করা হয়। সবাই চুপ করে থাকলেন, শুধু মোনায়েম খান বললেন, এইসব দাবিদাওয়া কোনো কাজের কথা না। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে লাগল। এক পর্যায়ে কিছু ছাত্র তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে মোনায়েম খানের টুপি উড়ে গেল। এই দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করা হলো। পরদিন *দৈনিক ইত্তেফাকে* ছবিটি ছাপা হলো।

আয়ুব খান বুঝে গেলেন মোনায়েম খানকে তাঁর প্রয়োজন। তিনি শুরুতে তাঁকে করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কিছুদিন পরেই গভর্নর।

মোনায়েম খানকে নিয়ে মজার মজার সব গল্প। যেমন, তিনি রাতে ঘুমানোর সময় বুকের ওপর একটা বই নিয়ে ঘুমান। বইটির নাম *Friends Not Masters.* বইটির লেখক আয়ুব খান।

তিনি না-কি টিভি এবং বেতারের দুই প্রধানকে গভর্নর হাউসে চা খেতে ডেকে নিয়ে বলেছেন, আমার সম্পর্কে কিছু অপপ্রচার আছে। আমি না-কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিরোধী। অবশ্যই না। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে আমি চাই এখন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনারা মুসলমান গীতিকারদের দিয়ে লেখাবেন। বেতার এবং টিভিতে মুসলমানদের লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্তি নিয়েও গল্প আছে। মোনায়েম খান ঠিক করলেন তিনিই প্রিন্সিপাল নির্বাচন করবেন। ঠিক মানুষকে নিতে হবে। নয়তো সমস্যা। দু'জন ক্যান্ডিডেটের একজনকে বললেন, সকালে কী দিয়ে নাশতা করেছেন?

তিনি বললেন, পরোটা ডিমভাজি।

---

* কর্তা খুশি রাখার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাকশাল করেন, তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক বাকশালে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই ক্যান্ডিডেট সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেলেন। কারণ ডিম হিন্দুয়ানি শব্দ। যে ডিম বলবে সে ইসলামি তমুদ্দনের একজন হবে না।

অন্য ক্যান্ডিডেট বললেন, রুটি আর আন্ডাভাজি দিয়ে নাশতা করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলেন। কারণ 'আন্ডা' মুসলমানি শব্দ। তবে তাকেও মোনায়েম খান বললেন, আন্ডা না বলে আপনি যদি 'বইদা' বলতেন তাহলে আমি আরও খুশি হতাম। বইদা হলো ডিমের খাস আরবি। অনেকেই বইদা বলে। আপনার বলতে অসুবিধা কী? এখন থেকে বইদা বলবেন।

মোনায়েম খান তাঁর রাজত্বকালে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করলেন তা হলো, এনএসএফ নামের ছাত্র সংগঠনকে পুরোপুরি গুণ্ডাবাহিনীতে রূপান্তর করা। তিনি এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। এনএসএফকে গুণ্ডামির অলিখিত লাইসেন্স দেওয়া হলো। বিষয়টা পুলিশ বাহিনীকেও জানানো হলো।

এই সরকারি দলের একজনের নাম পাচপাত্তুর। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে থাকে। হাতে সাইকেলের চেইন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'মাতাল হাওয়া' গ্রন্থে পাচপাত্তুরের ভূমিকা আছে বলেই তার বিষয়ে বিস্তারিত বলা হচ্ছে। শুরুতে পাচপাত্তুর নামকরণের ইতিহাসটা বলা যাক। তার আসল নাম সাইদুর। তার বাবা বিএম কলেজের শিক্ষক। সে ছিল M.Sc. Part II-র ছাত্র। তার ঘরের দরজায় নিজের নাম লেখা। নামের শেষে লেখা Pass Part Two.

'পাস পার্ট টু' থেকে হয়েছে পাচপাত্তুর। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে তার পূর্ণ ক্ষমতা যে ঘটনাটি দিয়ে দেখাল তা হলো, এক রাতে রেলওয়ে কলোনি থেকে অল্পবয়েসী দু'জন প্রসটিটিউট নিয়ে এল। শহীদুল্লাহ হলের মাঠে তাদেরকে দিয়ে নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থা করল। সে নিজেও চেইন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ নাচল। শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র-শিক্ষকরা হতভম্ব হয়ে এই দৃশ্য দেখল।*

এনএসএফ নামক সংগঠনটির প্রেসিডেন্টের নাম জমির আলি। সেক্রেটারি মাহবুবুল হক দোলন। এই দু'জন খুব সম্ভব এসএম হলে থাকত। তবে এনএসএফ-এর মূল ঘাঁটি ছিল সদ্যনির্মিত মহসিন হল। এরা সহকারী হাউস টিউটরের জন্যে বানানো চমৎকার একটি উইং দখল করে ছিল। সাধারণ ছাত্রদের টাকায় কেনা খাবারদাবারের একটি অংশ চলে যেত তাদের কাছে। তাদের জন্যে আলাদা রান্না হতো।

---

* আমি নিজে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ছাত্র। থাকি মহসিন হলে। পাচপাত্তুরকে স্বচক্ষে দেখার জন্যে একদিন শহীদুল্লাহ হলে গিয়েছিলাম। পাচপাত্তুর বন্ধুদের নিয়ে নিজের ঘরে বসে গল্প করছিল। বন্ধুদের একজনের নাম খোকা। সেও দেখতে রাজপুত্রের মতো। খোকা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। সে সঙ্গে জ্যান্ত সাপ নিয়ে ঘুরত। সাপ ব্যবহার করত সবাইকে ভয় দেখানোর জন্যে। পকেটে থাকত পিস্তল।

মহসিন হলের পাশেই রেললাইন। রেললাইনের দু'পাশে বস্তি। বস্তির কিছু মেয়ে ছিল যৌনকর্মী। তাদেরকে প্রায়ই মহসিন হলে এনএসএফ-এর নেতাদের কাছে আসতে দেখা যেত। হলের প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটররা পুরো বিষয় জানতেন। কেউ কিছুই বলতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাব হয়তো ছিল না, সাহসের অভাব ছিল।

মহসিন হলের ৫৬৪ নম্বর রুমে রসায়ন বিভাগের অতি নিরীহ একজন ছাত্র বাস করত। SSC এবং HSC-তে তার রেজাল্ট ভালো ছিল বলে তাকে একটি সিঙ্গেল সিটের রুম দেওয়া হয়েছিল। এই বেচারা এনএসএফের নেতাদের ভয়ে সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকত। একদিন কোনো কারণ ছাড়াই এনএসএফের নেতারা তার ঘরে ঢুকে রুম তছনছ করে দিল। তোষক জ্বালিয়ে দিল এবং বেচারার নিজের টাকায় কেনা Organic Chemistry'র Morrison and Boyed-এর লেখা বিশাল বইটাও ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলল। বই কুটিকুটি করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণে—বইটা সে অনেক দাম দিয়ে স্কলারশিপের টাকায় কিনেছে। তার একটাই বই। কেমিস্ট্রির অন্য বইগুলি সে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ত। নতুন করে আরেকটা তোষক কেনার টাকা তার ছিল না। খাটে পত্রিকার কাগজ বিছিয়ে ঘুমানো ছাড়া তার কোনো পথ রইল না।

গোবেচারা এই ছাত্রের নাম হুমায়ূন আহমেদ। তার ঘর তছনছ করার ঘটনার তদন্ত করতে এলেন হাউস টিউটর প্রফেসর এমরান (পদার্থবিদ্যার শিক্ষক)। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি মমতার তাঁর কোনো কমতি ছিল না।

স্যার আমাকে বললেন, কারা এই কাজ করেছে তাদের নাম বলো। কাগজে লিখে দাও। তদন্তে সত্যি প্রমাণিত হলে কঠিন শাস্তি হবে। হল থেকে বের করে দেওয়া হবে।

আমি নাম কাগজে লিখে স্যারের কাছে দিলাম।

তিনি নামের তালিকা পড়ে ঝিম ধরে গেলেন এবং বললেন, পলিটিকস ছেড়ে দাও। পলিটিকস করো বলেই এই ঘটনা ঘটেছে।

আমি বললাম, স্যার আমি পলিটিকস করি না।

এমরান স্যার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, আবার মিথ্যা কথা বলে বেয়াদপ ছেলে! সিট ক্যানসেল করে দেব। তুমি পলিটিকস করো না—তারা খামাখা তোমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে? আমাকে তুমি কী ভাবো? আমি দুদু খাই?

স্যার নাম লেখা কাগজ আমার হাতে ফেরত দিয়ে চলে গেলেন।

সন্ত্রাসের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগেও মাথা নিচু করে থাকতেন। এখনো থাকেন।

'৬৮ এবং '৬৯-এর মাতাল হাওয়া আমার গায়ের ওপর দিয়ে গিয়েছে। কিছু অভিজ্ঞতা উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেব। উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে এই বিষয়টা চলে না, তবে মাতাল হাওয়া কখনোই নিয়ম মানে না।

হাজেরা বিবি খাটে বসে আছেন। তাঁর বিছানায় ভাদ্র মাসের কড়া রোদ জানালা গলে পড়েছে। তিনি তাঁর কাঠির মতো পা কিছুক্ষণ রোদে রাখছেন। পা চিড়বিড় করা শুরু হওয়া মাত্র টেনে নিচ্ছেন, আবার পা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। রোদ নিয়ে এই খেলা তাঁর পছন্দ হচ্ছে। তিনি একেক সময় একেক ধরনের খেলা বের করেন।

হাবীবের স্ত্রী লাইলী শাশুড়ির খাটের পাশে মোড়ায় বসে আছেন। হাজেরা বিবি জরুরি তলব করে পুত্রবধূকে এনেছেন। তলব কী জন্যে করেছেন এখন ভুলে গেছেন। পুত্রবধূকে বসিয়ে রাখা হয়েছে যদি মনে পড়ে।

রোদ খেলা খেলতে খেলতে হাজেরা বিবি বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যে মনে পড়ব। কলবের ভিতরে চইল্যা আসছে। জবানে আসে নাই। বৌ, বইসা থাকো।

লাইলী বললেন, আম্মা যতক্ষণ বসে থাকতে বলবেন বসে থাকব।

চুপচাপ বইসা না থাইকা সংসারের গফসফ করো। এখন সংসার করতে পারি না, তয় সংসারের গফ শুনতে ভালো লাগে।

সংসারের কোন গল্প শুনবেন?

যেটা বলবে সেটাই শুনব। হারামজাদা ফরিদ তার গাভিন বৌ নিয়া আছে কেমন?

ভালো আছে।

ভালো থাকারই কথা। ডিমওয়ালা মাছ বাজারে মিলে, ডিমওয়ালা বউ মিলে না। ঠিক বলেছি?

জি।

লতিফার বিবাহের যখন কথা চলতেছে, তখন একটা রব উঠল বউ পোয়াতি। কী কেলেঙ্কারী! লতিফা কানতে কানতে বলল, আমারে ইন্দুর মারা বিষ আইন্যা দেন। আমি বিষ খাব।

লাইলী বলল, লতিফার গল্প থাকুক আম্মা।

হাজেরা বিবি বললেন, থাকবে কী জন্যে? লতিফা কি কোনো মানুষ না? তার সুখ-দুঃখ নাই? হইতে পারে সে গরিবের সন্তান।

লাইলী বলল, লতিফা নামে কেউ নাই আম্মা। প্রায়ই আপনি লতিফার গল্প করেন। একেক সময় একেক গল্প। একবার বলেছেন লতিফা আট বছর বয়সে পানিতে ডুবে মারা গেছে।

হাজেরা বিবি বললেন, বৌমা, মিথ্যা বলি নাই। তোমার সাথে মিথ্যা বইলা আমার কোনো ফয়দা আছে ? কাউরে কিছু না বইলা লতিফা দিঘির ঘাটে গেছে সিনান করতে। তখন বাইস্যা মাস। শ্যাওলার কারণে ঘাট হইছে পিছল। পা পিছলায়া পড়ছে পানিতে। দুপুর পর্যন্ত কেউ কোনো খবর জানে না। জোহরের আজানের পর লতিফা পানিতে ভাইস্যা উঠল। গায়ে ছিল হইলদা জামা। মনে হইল পুসকুনির মাঝখানে হইলদা গেন্দাফুল ফুটছে। বুঝলা ?

জি।

কাগজ-কলম আনো।

কী আনব ?

কাগজ-কলম। আমার জবানে একটা পত্র লিখবা। তোমারে কী জন্যে ডাকছি এখন ইয়াদ হইছে, পত্র লেখার জন্যে ডাকছি। আমার নাতনিরে একটা পত্র লেখব। নাতনির নাম যেন কী ?

লাইলী বললেন, আম্মা, নাম তো আপনার রাখা। তোজল্লী।

হাজেরা বিবি গম্ভীর গলায় বললেন, বৌমা, আমার সাথে লুডু খেলবা না। তোজল্লী নাম আমি রেখেছিলাম এটা সত্য। তোমরা তারে এই নামে ডাকো না। অন্য এক নামে ডাকো। শুধু আমি যখন জিজ্ঞাস করি, কী নাম ? তখন আমারে খুশি করার জন্যে বলো তোজল্লী। এখন বলো তারে কী নামে ডাকব ?

নাদিয়া।

হাজেরা বিবি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী সুন্দর নাম দিয়েছিলাম, আর কী নামেই না ডাকো। পাদের সাথে মিল দিয়া নাম।

লাইলী বললেন, আম্মা, এটা কেমন কথা ? পাদের সঙ্গে এই নামের কী মিল ?

হাজেরা বিবি বললেন, মিল অবশ্যই আছে। নাদিয়া। দিল সে পাদিয়া।

আম্মা ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ করবা না। সবাই পাদে। তুমি পাদো। স্বামীর সামনে পাদো না, আড়ালে গিয়া ভটভট করো।

লাইলী উঠে দাঁড়ালেন। হাজেরা বিবি বললেন, যাও কই ?

কাগজ-কলম আনতে যাই। আপনি চিঠি লিখবেন বলেছেন।

হাজেরা বিবি বললেন, আমি লিখব না। তুমি লিখবা, আমার জবানে লিখবা।

লাইলী কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। তিনি বিরক্ত, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করছেন না। ঘরের সকল কাজ পড়ে আছে। বুড়ি তাকে ছাড়ছে না। চিঠিপর্ব কতক্ষণে শেষ হবে কে জানে!

হাজেরা বিবি বললেন, লেখো—নাদিয়া মাগো।

লাইলী বললেন, আম্মা! নাদিয়া মাগো কেন লিখব? সে আপনার নাতনি।

হাজেরা বিবি বললেন, তোমারে যা লেখতে বলছি তাই লেখবা। মাগো আমি ইচ্ছা কইরা লেখতে বলছি যাতে সে বুঝে আমার মাথা এখন পুরাপুরি আউলা। নাদিয়া মাগো লিখেছ?

লিখেছি।

লেখো—আমার অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আজরাইল আলায়হেস সালামের সঙ্গে কথা হইয়াছে। তিনি সঠিক দিনক্ষণ বলেন নাই। কিন্তু ইশারায় জানায়েছেন।

লাইলী বললেন, আস্তে আস্তে বলেন আম্মা। এত তাড়াতাড়ি লিখতে পারি না। আজরাইল আপনাকে কী ইশারা দিয়েছে?

হাজেরা বিবি বললেন, উনি বলেছেন—তোর যা খাইতে মন চায় তাড়াতাড়ি খায়া নে।

লাইলী বললেন, কী খেতে আপনার মন চায়?

হাজেরা বিবি বললেন, পাকনা তেতুই খাইতে মন চায়, ডেফল খাইতে মন চায়, বুবি খাইতে মন চায়। এইসব ফল চুকা। বেহেশতে মিলবে না। বেহেশতের সব ফল মিষ্টি।

লাইলী বললেন, এখন কী লিখব বলেন—

লেখো—পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া আসিবে। জান কবজের আগে আগে যেন তোমার মুখ দেখি। তোমার সহিত আমার কিছু গোপন কথাও আছে। এই পত্রকে টেলিগ্রাম মনে করিয়া চলিয়া আসিবা। ইতি তোমার দাদি হাজেরা বিবি।

লাইলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আম্মা এখন যাই, চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

হাজেরা বললেন, চিঠি ডাকে দিবা না। ডাকের চিঠির গুরুত্ব নাই। হারামজাদা ফরিদরে বলো চিঠি হাতে হাতে নিয়া যাবে এবং তোজল্লীরে সাথে কইরা নিয়া আসবে। সে আজই যাবে।

আচ্ছা।

আইজ কী বার ?

বুধবার।

বুধবার হইলে আইজ যাবে না। বুধবার দিন খারাপ। তোমার মা মারা গিয়েছিলেন বুধবারে। লতিফা বিষ খাইছিল মঙ্গলবার রাতে। মারা গেল বুধবারে। হারামজাদা ফরিদরে পাঠাইবা বিষ্যুদবার সকালে। ঠিক আছে ?

জি, ঠিক আছে। আম্মা, আমি এখন যাই ? না-কি আরও কিছু বলবেন ?

হাজেরা বিবি জবাব দিলেন না। তিনি রোদে পা রাখার এবং পা সরিয়ে নেওয়ার খেলা খেলছেন।

ফরিদ তার ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে আছে। চেয়ারের একটা পা ভাঙা বলে কোনো কিছুর সঙ্গে ঠেশ না দিয়ে বসা যায় না। সে চেয়ারটাকে খাটের সঙ্গে ঠেশ দিয়েছে। জায়গাটা ভালো পাওয়া গেছে। এখান থেকে জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। তার দৃষ্টিসীমায় একতলা একটা পাকা বাড়ি। এটা 'অতিথঘর'। অতিথিদের থাকার ঘর। ঘরের ভেতরটা ফরিদ কোনোদিন দেখে নাই। শুনেছে সুন্দর করে সাজানো। পাশাপাশি দু'টা খাট আছে। চেয়ার-টেবিল আছে। মাথার ওপর টানা পাখার ব্যবস্থাও আছে। বিশেষ কোনো অতিথি এলে পাংখাপুলারের ব্যবস্থা করা হয়।

বাড়ির সামনে গেটের মতো আছে। গেটে ঝুমকা লতা এবং নীলমণি লতা। নীলমণি লতায় ফুল ফুটেছে। গেট নীল হয়ে আছে। ফরিদের ধারণা এই ফুলগুলির দিকে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেওয়া যায়।

অতিথঘরে সম্প্রতি একজন অতিথি এসেছে। বয়স অল্প। ফরিদ এই অতিথির রূপ দেখে চমৎকৃত। কোনো পুরুষমানুষ এত রূপবান হতে পারে তা ফরিদের ধারণাতেও ছিল না। ফরিদ তার স্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও বলেছে। সফুরা বলল, উনার কোনো একটা খুঁত আছে। খুঁত ছাড়া মানুষ এত সুন্দর হয় না। মাকাল ফল এত সুন্দর, তার কারণ ফল বিষাক্ত।

ফরিদ বলল, সফুরা, মানুষের সৌন্দর্য দেখবা। খুঁত দেখবা না।

খুঁত দেখব না কেন ?

ফরিদ বলল, খুঁত দেখলে মন খারাপ হবে—এইজন্যে দেখবা না। আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত যেন সবসময় মন ভালো থাকে।

সফুরা বলল, কেন ?

ফরিদ বলল, মানুষের মনের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাকের যোগাযোগ আছে। মানুষের মন খারাপ হলে উনার খারাপ লাগে।

আপনারে কে বলেছে ?

আমি চিন্তা কইরা বাইর করছি।

আপনে দেখি বিরাট চিন্তার লোক।

ফরিদ বলল, কাজকর্ম নাই তো। চিন্তা ছাড়া কী করব বলো ?

সফুরা বলল, কাজকর্মের চেষ্টা করেন।

ফরিদ বলল, চিন্তা করাটাও একটা বড় কাজ।

এখন কী নিয়া চিন্তা করেন ?

নতুন যে অতিথি আসছে তার বিষয়ে চিন্তা করি।

সফুরা বলল, তার বিষয়ে চিন্তার কিছু নাই। উনি স্যারের দূরসম্পর্কের ভাইগ্না। মাথায় কী যেন দোষ হয়েছে। কবিরাজী চিকিৎসা নিতে এখানে এসেছেন। চিকিৎসায় আরাম না হলে কলিকাতা যাবেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। কথা বললে উনার রোগ বাড়ে।

এইসব তথ্য ফরিদ জানে, তবে সে সামান্য বেশি জানে। কারণ মানুষটার সঙ্গে একরাতে তার আলাপ হয়েছে। সেই রাতে শহরে কারেন্ট ছিল না। গরম পড়েছিল অত্যধিক। পাংখাপুলার রশিদ এসে তাকে বলল, স্যারের অর্ডার হয়েছে রাতে আপনি অতিথঘরে যাবেন। সারা রাত পাংখা টানবেন। অতিথের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবেন না।

ফরিদ বলল, উনি যদি কিছু জিজ্ঞাস করেন চুপ করে থাকব ?

রশিদ বলল, সেটা আমি বলতে পারব না। নিজ বিবেচনায় কাজ করবেন।

উনার নাম কী ?

আসগর।

ফরিদ পাংখা টানতে গেল। আসগর বিছানায় শুয়ে ছিল। উঠে বসল এবং বলল, পাংখা টানতে হবে না। কেউ পাংখা টানলে আমার ঘুম হয় না।

ফরিদ বলল, স্যার অর্ডার দিয়েছেন। পাংখা না টানলে উনি রাগ করবেন।

রাগ করলে করবেন।

আমি কি চলে যাব ?

হ্যাঁ, চলে যাবেন। এই বাড়িতে কি পড়ার মতো কোনো বই আছে ? যে-কোনো বই। আমার সময় কাটে না। বই থাকলে পড়তাম।

ফরিদ বলল, আপার অনেক বই আছে। আলমারি ভর্তি বই। কিন্তু আপার ঘর তালা দেওয়া।

উনি কোথায় ?

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। রোকেয়া হলে থাকেন।

কী পড়েন ?

ফিজিক্সে অনার্স। আপনি বই পড়তে চাইলে আরেকটা বুদ্ধি আছে।

কী বুদ্ধি ?

ময়মনসিংহ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে। তার মেম্বার হলে বই এনে পড়তে পারবেন। লাইব্রেরিতে জামানত হিসাবে কিছু টাকা জমা রাখতে হবে। কুড়ি টাকা। মাসিক চাঁদা এক টাকা।

এত কিছু জানেন কীভাবে ?

আমি মেম্বার হওয়ার জন্যে গিয়েছিলাম। জামানতের টাকা ছিল না বলে মেম্বার হতে পারি নাই।

আসগর তোষকের নিচ থেকে একশ' টাকার একটা নোট বের করে বললেন, আমার পক্ষে মেম্বার হওয়া সম্ভব না। আপনি মেম্বার হবেন। বই এনে আমাকে দিবেন। আমি পড়ে ফেরত দিব।

জি আচ্ছা।

আরেকটা ছোট্ট কাজ করতে পারবেন ? রশিদ নামের একজন আমার জন্যে তিনবেলা টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার আনে। আমি যখন খানা খাই, সে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি খেতে পারি না। তাকে বলবেন সে যেন সামনে দাঁড়িয়ে না থাকে। আমি নিজেও বলতে পারতাম। কিন্তু আমি লজ্জা পাচ্ছি।

ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলল, আপনার মাথার অসুখটা কি একটু কমেছে ?

আমার মাথার কোনো অসুখ নাই। কাজেই অসুখ বাড়া-কমার প্রশ্ন আসে না। আচ্ছা আপনি এখন যান।

ফরিদ লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে। সে সপ্তাহে দু'বার লাইব্রেরি থেকে বই আনে। অন্যের জন্যে বই আনা-নেওয়া করতে করতে ফরিদের নিজের বই পড়া অভ্যাস হয়ে গেল। ফরিদ চার নম্বরি হাতিমার্কা একটা খাতা কিনেছে। যে সব বই সে এনেছে তার নাম খাতায় লিখে রাখছে। লাইব্রেরি থেকে বই আনার সময় খাতাটা সে নিয়ে যায়। খাতা দেখে বই নেয়, যাতে একই বই দুইবার নেওয়া না

হয়। কোন বই তার নিজের পড়ে কেমন লাগল তাও অল্পকথায় লিখে রাখে। যেমন—

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার : মোটামুটি।
ভারতবর্ষের ইতিহাস : খুবই বাজে।
দু'টি ফুল এক বৃন্ত : ভালো। প্রেমের বই।
জানবার কথা : জ্ঞানের বই। মোটামুটি।
দস্যু বাহ্‌রাম : খুবই ভালো।
প্রেত কাহিনী : অত্যধিক ভালো। ভূতের।
কপালকুণ্ডলা : ভাষা খারাপ। বই খারাপ।
পথের দাবী : খুবই সুন্দর।

পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের নাম ক্ষিতিশ বাবু। বয়স ষাট। সারা দিন চা এবং পান খান। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই বস্তু একসঙ্গে খান। তাঁর মুখের সামনে সবসময় বই ধরা আছে। তিনি ঘোষণা করেছেন, এই লাইব্রেরির সব বই যেদিন পড়ে শেষ করবেন সেদিন '...লের' চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধর্মকর্মে মন দিবেন। অল্পদিনেই ফরিদের সঙ্গে তাঁর ভালো খাতির হয়েছে। বই লেনদেনের সময় কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন।

ফরিদ, বলো দেখি বই পড়লে কী হয়?

জ্ঞান হয়।

পারলা না। জ্ঞান এত সোজা জিনিস না—বই পড়লা জ্ঞান হয়ে গেল। বই পড়লে পাপক্ষয় হয়। আজেবাজে বই পড়লে ছোটখাটো পাপক্ষয় হয়, ভালো বই পড়লে বড় পাপক্ষয়। বুঝেছ?

বুঝার চেষ্টা নিতেছি।

গঙ্গায় ডুবলে হিন্দুর পাপক্ষয় হয়—এইটা জানো তো?

জানি।

পুস্তক হলো হিন্দু-মুসলমান সবেরই গঙ্গা। পুস্তকে ডুব দিলে হিন্দু-মুসলমান সবের পাপক্ষয় হয়। মনে থাকবে?

থাকবে।

গঙ্গায় ডুব দিয়া পাপক্ষয়ের মন্ত্রটা জানো?

জে-না।

মন্ত্রটা শোনো—

আম্র চুরি, জাম্র চুরি
ভাদ্র মাসে ধান্য চুরি
মন্দস্থানে রাত্রিযাপন
মদ্য পান আর কুকড়া ভক্ষণ
হক্কল পাপ বিমোচন
গঙ্গা গঙ্গা।

এখন যাও বই নিয়া বিদায় হও। তোমার সঙ্গে কথা বলার কারণে বইপড়া বন্ধ, আমার পাপ কাটাও বন্ধ। বিদায়।

ফরিদ বলল, স্যার, আমার খুব শখ আপনারে একবেলা খাওয়াই।

শখ হইলে খাওয়াবা। মুসলমানের বাড়িতে খাইতে আমার সমস্যা নাই।

ফরিদ বলল, নিজের যেদিন রোজগার হবে তখন খাওয়াব। এখন আমি পরের বাড়িতে আশ্রিত।

ক্ষিতিশ বাবু বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন—আশ্রিত অবস্থার পরিবর্তন করো। আশ্রিত মানুষের অন্ন বিষ্টাবৎ। বিষ্টা বোঝো তো ?

বুঝি।

বিষ্টা আর কত খাইবা ? খাদ্য খাও।

খুব শিগগিরই একটা ব্যবস্থা হবে স্যার।

ফরিদ ক্ষিতিশ বাবুর পায়ের ধুলা নিয়ে বের হয়ে এল। এই কাজটি সে সবসময় করে। বিদায়ের সময় ক্ষিতিশ বাবুর পায়ের ধুলা নেয়।

হাবীব খেতে বসেছেন। পাটি পেতে খেতে বসা। তাঁর সামনে পাখা হাতে লাইলী একটা জলচৌকিতে বসেছেন। লাইলী পাখা হাতে নিয়েছেন অভ্যাসের কারণে। খাওয়ার সময় হাবীব পাখা নাড়ানাড়ি পছন্দ করেন না। কথা চালাচালিও পছন্দ করেন না। এই কথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনেকবার বলেছেন। কিন্তু লাইলীর মনে থাকে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি খাবার সময় বলবেনই।

লাইলী বললেন, অতিথঘরে যে থাকে সে কে ?

হাবীব বললেন, তার নাম আসগর। আসগর আলি। আমার দূরসম্পর্কের ভাইগ্না হয়। বাড়ি শম্ভুগঞ্জ। শরীর খারাপ। চিকিৎসার জন্যে এসেছে।

লাইলী বললেন, খাওয়ার সময় মিথ্যা বললে গলায় ভাত আটকাইয়া মৃত্যু হয়। খাওয়া শেষ করেন, তারপর মিথ্যা বলবেন।

হাবীব কিছুক্ষণ কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করলেন।

লাইলী বললেন, এই ছেলেরে আমি চিনি। সে ভাটিপাড়ার বারোআনি জমিদার রহমত রাজা চৌধুরী সাবের একমাত্র ছেলে, তার নাম হাসান রাজা চৌধুরী।

তুমি চিনলা কীভাবে ?

আপনার ইয়াদ থাকে না যে, আমি ভাটি অঞ্চলের মেয়ে। ভাটিপাড়ায় আমার খালার বাড়ি। আমি ছোটবেলায় জমিদার সাবের বাড়িতে গিয়েছি। এত সুন্দর আর এত বড় বাড়ি ভাটি অঞ্চলে নাই। উনাদের বাড়ির নাম কইতর বাড়ি।

কইতর বাড়ি নাম কী জন্যে ?

বাড়িভর্তি কইতর। এইজন্যে বাড়ির নাম কইতর বাড়ি। কইতরগুলির জন্যে প্রতিদিন আধমণ ধান বরাদ্দ ছিল, এখন কী অবস্থা জানি না।

হাবীব বললেন, কম জানাই ভালো। বেশি জানলে সমস্যা।

লাইলী বললেন, জমিদার সাবের ছেলে একলা অতিথবাড়িতে থাকে, একলা খায়—এইটা কেমন কথা ? তারে মূল বাড়িতে থাকতে বলেন। আমি যত্ন করে খাওয়াব।

হাবীব বললেন, পরিস্থিতির কারণে মাঝে মধ্যে হাতি ইঁদুর হয়ে যায়। এই ছেলে এখন ইঁদুর। এর বেশি আমারে কিছু জিজ্ঞাসা করবা না।

আম্মা নাদিয়াকে আনার জন্যে লোক পাঠাতে বলেছেন।

হাবীব বললেন, আম্মার কথা আমার কাছে আদেশ। লোক পাঠাও। ইউনিভার্সিটিতে নানান গোলমাল চলতেছে। ছাত্রগুলা কৈ মাছের মতো উজাইছে। এই সময় হল-হোস্টেলে না থাকা উত্তম।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঝড় উঠল। আম-কাঁঠালের বাগানের ভেতর ধুলা-আবর্জনার কুণ্ডুলি উঠল। লাইলী ঘোমটা মাথায় দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ঝড়-বৃষ্টি ভালো লাগে। ঝড়ের সময় ঘূর্ণি ওঠার অন্য অর্থ আছে। ছোটবেলায় শুনেছেন ঘূর্ণির ভেতর একটা করে জ্বিন থাকে। নজর করে দেখলেই হঠাৎ হঠাৎ জ্বিনের হাত-পা-মাথা আচমকা দেখা যায়।

লাইলী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বাগানে তিনটা ঘূর্ণি উঠেছে। এরা পাক খেয়ে খেয়ে একটার সঙ্গে অন্যটা মিশে যাচ্ছে। আবার আলাদা হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হলে জ্বিনরা কেউ থাকবে না। এরা বৃষ্টি পছন্দ করে না।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। এখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামছে। লাইলীর চোখে পড়ল পুকুরঘাটে হাসান রাজা চৌধুরী দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। সে মনের আনন্দে ভিজছে।

যে মাওলানার কাছে লাইলী ছোটবেলায় আরবি পড়া শিখতেন তিনি বলতেন, বৃষ্টি আল্লাপাকের খাস রহমতের একটি। বৃষ্টিতে ভিজলে উনার রহমত গায়ে মাখা হয়। এটা শরীর এবং মন দুইয়ের জন্যই ভালো। তবে এই রহমত আল্লাহপাক শুধু মানুষের জন্যে দিয়েছেন। জ্বিনের জন্যে দেন নাই। জ্বিনরা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে না।

লাইলী বলেছিল, জ্বিনদের জন্য কি অন্য কোনো রহমতের ব্যবস্থা আছে?

তিনি বললেন, আছে। আল্লাপাক জ্বিনের জন্যে আগুনের বৃষ্টির ব্যবস্থা রেখেছেন। আগুনের বৃষ্টি তাদের জন্যে।

লাইলী মাওলানা সাহেবের নাম মনে করার চেষ্টা করছেন। নাম মনে আসছে না। কিছু নাম মানুষ অতিদ্রুত ভুলে যায়, হাজার চেষ্টা করলেও মনে করতে পারে না। মনে হয় আল্লাপাক চান না এই নামগুলি মনে থাকুক।

সেই মাওলানার অভ্যাস ছিল কথা বলার সময় ছাত্রীর পিঠে হাত রাখা। একদিন তিনি বললেন, তুমি উড়না ঠিকমতো পরতে পারো না। মাথার উড়না এমনভাবে দিতে হবে যেন মাথার সামনের চুল ঢাকা পড়ে। আমি উড়না পরায়ে তোমারে দেখায়ে দিতেছি। তিনি উড়না পরাবার সময় লাইলীর বুকে হাত রাখলেন। লাইলী পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। তখন তার বয়স বারো। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা কাউকে বলার উপায় নাই, কারণ কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। মাওলানা ছিলেন তাদের অঞ্চলের অতি সম্মানিত মানুষদের একজন।

হঠাৎ লাইলীর মাওলানার নাম মনে পড়ল। মাওলানা আসগর। আজ দুপুরে খাওয়ার সময় নাদিয়ার বাবা এই নাম উচ্চারণ করেছেন।

লাইলী নিচুগলায় কয়েকবার বললেন, মাওলানা আসগর। মাওলানা আসগর।

কাজের মেয়ে মলিনা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। এই মেয়েটার বয়স অল্প। অল্প বয়সের কারণেই সে তুচ্ছ বিষয়ে উত্তেজিত হয়।

আম্মা, শিল পড়তাছে!

লাইলী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বাগানের দিকে তাকালেন—শিল পড়ছে। হাসান রাজা চৌধুরী ছোট বাচ্চাদের মতো ছোটাছুটি করে শিল কুড়াচ্ছে। লাইলী বলেছেন, মলিনা! তুমি খোঁজ নাও তোমার খালু

বাড়িতে বা চেম্বারে আছেন কি না। থাকার কথা না। আজ বৃহস্পতিবার। তিনি তাশ খেলতে যান। যদি দেখো তোমার খালু নাই, তাহলে ওই ছেলেটারে বলবা আমি চা-নাশতা খাওয়ার জন্যে তাকে ডেকেছি।

দোতলায় নিয়ে আসব আম্মা?

হ্যাঁ, দোতলায় আনবা। চা-নাশতার ব্যবস্থা করবা।

কী নাশতা দিব?

লুচি ভাইজ্যা দিবা। মাংস রান্না আছে। মাংস লুচি।

মলিনা গলা নামিয়ে বলল, কেউ যেন না জানে এমনভাবে আনব আম্মা?

লাইলী বললেন, লুকাছাপার কিছু নাই। তুমি অল্পদিন হয়েছে এই বাড়িতে এসেছ। তুমি আমাকে চিনো না। আমারে চিনলে বুঝতা আমার মধ্যে লুকাছাপা নাই।

মলিনা চলে গেল। লাইলীর মন সামান্য খারাপ হলো, কারণ মলিনাকে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। তাঁর মধ্যে অবশ্যই লুকাছাপা আছে। মাওলানা আসগরের কথা তিনি কাউকে বলেন নাই। ছেলেটাকে নাশতা খেতে খবর দিয়েছেন, কিন্তু তার আগে খোঁজ নিয়েছেন নাদিয়ার বাবা তাশ খেলতে গেছেন কি না।

হাজেরা বিবি চেঁচাচ্ছেন, ও হাবু! হাবুরে! ও হাবু!

লাইলী শাশুড়ির ঘরে ঢুকলেন।

আম্মা, কিছু লাগবে?

আমার ছেলে কই? হাবলাটা কই?

আজ বৃহস্পতিবার, মনে হয় তাশ খেলতে গেছে।

হাজেরা বিবি বললেন, সত্যি সত্যি তাশ খেলতে যায় কি না, ভালোমতো খোঁজ নিবা। পুরুষমানুষরে বিশ্বাস করবা না। তারা এক জায়গায় যাওয়ার কথা বলে যায় অন্য জায়গায়। তোমার শ্বশুরের কথা শোনো। সে মাসের প্রথম দিন...

লাইলী বললেন, এই গল্প অনেকবার শুনেছি আম্মা।

আরেকবার শোনো। একটা শাড়ি অনেকবার পরেছ বলে আর পরতে পারবা না, তা তো না। ভালো শাড়ি অনেকবার পরা যায়। তারপর ঘটনা শোনো। তখন আমি নতুন বউ। এই বাড়ির হালচাল বুঝি না। বয়সও কম। হায়েজ নেফাস শুরু হয় নাই এমন কম। তারপরেও সন্দেহ হইল। খোঁজ লাগায়া জানলাম তোমার শ্বশুর যায় নটিবাড়িতে। নটির নাম—বেদানা। আমি তোমার শ্বশুররে বললাম, আপনে সম্মানী মানুষ। নটিবাড়িতে কেন যাবেন! নটি আসবে আপনার কাছে। বেদানারে আপনার কাছে আইন্যা রাখেন।

তোমার শ্বশুর পাকা ঘর তুলল। নটিবেটিরে এই ঘরে আইন্যা দাখিল করল। আইজ সেই ঘরের নাম 'অতিথঘর'। বুঝেছ ?

জি। আপনার ছেলেকে কেন ডাকছিলেন আম্মা ? কিছু লাগবে ?

হাজেরা বিবি বললেন, শিল পড়েছে শুনেছি। একটা শিলে মধু মাখায়া আমার মুখে দেও। আমি চুষব। বছরের প্রথম শিলের মধ্যে ওষুধ থাকে। এই ওষুধ শরীরের জন্যে ভালো। ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থা করছি আম্মা।

হাসান রাজা চৌধুরীর সারা শরীর ভেজা। মাথার চুল বেয়ে পানি টপটপ করে পড়ছে। লাইলী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। সে যে এত রূপবান তা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি।

লাইলী বললেন, বাবা, কেমন আছ ?

ভালো।

আমি ছোটবেলায় বেশ কয়েকবার তোমাদের বাড়িতে গিয়েছি। বাড়ির নাম কইতর বাড়ি না ?

জি।

কইতরগুলি কি এখনো আছে ?

জি।

শুনেছিলাম তোমার মায়ের মৃত্যুর দুইদিন আগে সব কইতর চলে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি ?

জি।

কতদিন পর ফিরে আসে ?

মা'র কুলখানির দিন।

শুনেছি তোমার অসুখ। চিকিৎসা চলছে। কী অসুখ ?

আমার কোনো অসুখ নাই। এই বাড়িতে আমি পালিয়ে আছি।

মলিনা থালাভর্তি ফুলকো লুচি এবং গরুর মাংস নিয়ে ঢুকেছে।

লাইলী বললেন, বাবা খাও।

হাসান খেতে শুরু করেছে। আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। লাইলী ইশারায় মলিনাকে চলে যেতে বললেন। মলিনা পুরোপুরি চলে গেল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে রাখল।

লাইলী বললেন, এখন থেকে তুমি এই ঘরে বসে খাবে। আমি সামনে থাকব।

হাসান বলল, আমার একা খেতে ভালো লাগে। মা মারা যাওয়ার পর একা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে।

লাইলী বললেন, অভ্যাসটা বদলানো দরকার। একদিন বিবাহ করবে। তোমার স্ত্রী চাইবে সামনে বসে তোমাকে খাওয়াতে।

আমি বিবাহ করব না।

তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। তুমি কেন এই বাড়িতে পালিয়ে আছ?

হাসান বলল, আমি একটা খুন করেছি। এইজন্যে পালিয়ে আছি।

লাইলী তাকিয়ে আছেন। হাসান মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মলিনা ছটফট করছে, কারণ সে লাইলীর প্রতিটি কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ওই মানুষটা কী জবাব দিয়েছে তা শুনতে পারে নাই।

প্রণব খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়েছেন। তিনি খবরের কাগজ পড়েন হাতে লাল-নীল পেনসিল নিয়ে। যেসব খবর পড়ে তার শান্তি লাগে সেখানে নীল দাগ দেন। অশান্তির খবরগুলিতে লাল দাগ। লাল এবং নীল দাগ সমান সমান হলে তার বড়ই আনন্দ লাগে। মাঝে মাঝে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করেন। লাল দাগ না নীল দাগ দিবেন বুঝতে পারেন না।

আজও একটা বিভ্রান্তি দেখা দিল। একচল্লিশজন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি *ইত্তেফাকে* ছাপা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, 'আমরা সংবাদপত্র মারফত জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা বর্ণমালা, লিখন রীতি এবং বানান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে তৎপর হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষার এইরূপ পরিবর্তন সাধনে একতরফাভাবে কেন যে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা জানি না...'

প্রণবের মনে হলো বাংলা ভাষা রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে এটা ভালো কথা। নীল দাগ দেওয়া উচিত। আবার বিবৃতির কারণে দেশ আন্দোলনের দিকে যাবে। যে-কোনো আন্দোলনের একপর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। কাজেই লাল দাগ।

আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলনে যাচ্ছে।—এটাও লাল দাগ। কারণ ফলাফল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

নীল দাগ দেওয়ার মতো একটা খবর পাওয়া গেল। বোয়াল মাছের পেটে চার ভরি স্বর্ণের হার।

বোয়াল ধরা পড়েছে হাকালুকি হাওরে। তার পেট কেটে চার ভরি ওজনের হার পেয়েছে জেলে মন্তাজ মিয়া। সে বাজারে মাছ বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিল। খদ্দের না জোটায় মন খারাপ করে মাছ বাড়িতে নিয়ে যায়। মাছ কাটার পর হতদরিদ্র মন্তাজ মিয়ার পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

পত্রিকায় মন্তাজ মিয়ার একটা ছবি ছাপা হয়েছে। সে গোমড়ামুখে একটা হার ধরে আছে। ছবি দেখে মনে হচ্ছে পেটে হার পেয়ে সে মহাবিরক্ত।

নাদিয়াকে ময়মনসিংহ নিয়ে যেতে রশিদ এসেছে। নাদিয়া বলল, আমি একা যাওয়া আসা করতে পারি। কেন আমাকে নিতে আসেন?

রশিদ জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রশ্ন করলেই উত্তরে কিছু বলা রশিদের স্বভাবে নেই।

নাদিয়া বলল, আপনি ভালো সময়ে এসেছেন। ইউনিভার্সিটি সাত দিনের ছুটি হয়েছে। আয়ুব খান আসছেন এইজন্যে ছুটি। আমরা ছাত্ররা ঝামেলা করে ফেলতে পারি এটাই সরকারের ভয়।

রশিদ বলল, আম্মা, কখন রওনা দিবেন?

ট্রেন কখন?

আমি স্যারের গাড়ি নিয়া আসছি আম্মা। আপনি যখন রওনা দিতে চান তখন রওনা দিব। দুপুরের আগে রওনা দেওয়া ভালো। সইন্ধ্যায় সইন্ধ্যায় পৌছব।

আমি গাড়িতে যাব না। ট্রেনে যাব। এবং একা যাব। আজ না, আগামীকাল। 'রোমান হলিডে' নামে একটা ছবি এসেছে। হলের অনেক মেয়ে ছবি দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। আমি এখনো কাঁদতে পারিনি।

রশিদ বলল, আম্মা আপনারে না নিয়া গেলে স্যার আমারে খুন করবে।

নাদিয়া বলল, বাবা আয়ুব খানের মতো। নানান প্যাঁচ খেলবে, খুন করবে না। আপনি গাড়ি নিয়ে ফেরত যান। আমি এক থেকে তিন গুনব, আপনি এর মধ্যে বিদায় হবেন। এক-দুই-তিন।

ছুটি সাত দিনের, নাদিয়া জানে খুব কম করে তাকে দশ দিন থাকতে হবে। দাদি ছাড়বে না। ঢাকায় আসার জন্যে সে তৈরি হয়ে দাদিকে সালাম করতে যাবে। দাদি বলবেন, খারাপ খোয়াব দেখছি। খুবই খারাপ খোয়াব। আইজ যাওয়া বন। পরের দিন দাদি বলবেন, আইজ না শনিবার। শনিবারের যাত্রা! তোর মাথাটা কি খারাপ হইছে? তারপরের দিন দাদি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠবে। অসুখ সত্যি না মিথ্যা কেউ ধরতে পারবে না।

দশ দিন মাথায় রেখে নাদিয়া বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে ঠিক করেছে পাঠ্যবই একটাও নিবে না। ছুটিতে গেলে কখনোই পড়া হয় না। শুধু শুধু বাক্সভর্তি বই নিয়ে যাওয়া।

গল্পের বই কিছু নিয়ে যেতে হবে। দিঘির ঘাটে বসে বই পড়ার আনন্দ তুলনাবিহীন। মা'র জন্যে কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি কিনতে হবে। এই রঙের শাড়ি তাঁর অসম্ভব পছন্দ। অনেকগুলি সবুজ শাড়ি তাঁর আছে। মজার ব্যাপার হলো, নাদিয়া তাকে কখনো সবুজ শাড়ি পরতে দেখে না। কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। মা'কে জিজ্ঞেস করতে হবে কী ঘটনা।

নাদিয়া নিউ মার্কেট থেকে তিনটা বই কিনল। ম্যাক্সিম গোর্কির *আমার ছেলেবেলা* এবং *পৃথিবীর পাঠশালা*। বেনিয়ত নামের এক লেখকের বই কিনল। নাম *Snake Inside the Apple.* এই বইটা কিনল কভার দেখে। টুকটুকে লাল আপেলের ভেতর কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে সাপ। আপেলটা ঠিক যতটা সুন্দর, সাপটা ততটাই ভয়ঙ্কর।

নিউ মার্কেট থেকে সে গেল বলাকা সিনেমাহলে। 'রোমান হলিডে' ছবির ম্যাটিনি শো'র দু'টা টিকিট কাটল। একটা তার জন্যে আরেকটা বিদ্যুত স্যারের জন্যে। স্যারকে সে বলবে না যে পাশাপাশি দু'টা টিকিট কেটেছে। স্যারকে সে আপেলের বইটা দেবে। বইয়ের ভেতর টিকিটটা থাকবে। তিনি যদি সত্যি ছবি দেখতে আসেন তাহলে দেখবেন যে পাশের সিটে নাদিয়া বসে আছে। তিনি অবশ্যই চমকে উঠবেন।

নাদিয়া ঘড়ি দেখল। এগারোটা দশ। ছবি শুরু হবে তিনটায়। হাতে এখনো অনেক সময়।

বিদ্যুত কান্তি তাঁর ঘরে বসে স্লাইড রুল দিয়ে জটিল হিসেব করছিলেন। নাদিয়া উঁকি দিয়ে বলল, স্যার আসব?

এসো।

স্যার আমি কাল ময়মনসিংহ চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভালো করেছ। চা খাবে?

জি স্যার।

ভেতরে এসে বসো আমি চায়ের কথা বলি। তুমি নিজেই বলে আসো ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট কিসমতকে। অপটিক্স ল্যাবে আছে। দাড়িওয়ালা। চেনো না?

চিনি স্যার।

কিসমত চা দিয়ে গেছে। বিদ্যুত কান্তি স্লাইড রুল চালাতে চালাতেই কথা বলছেন।

আপনার জন্যে একটা বই এনেছি স্যার। *Snake Inside the Apple.*

গল্পের বই ?

জি স্যার।

বিখ্যাত কোনো বই নাকি ?

জানি না স্যার। কভার দেখে পছন্দ হয়েছে বলে কিনে ফেলেছি।

বিদ্যুত হাত থেকে স্লাইড রুল নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, মানব জাতির এটা একটা সাধারণ ত্রুটি। তারা শুধু যে কভারের রঙচঙ ছবি দেখে বই কিনে তা না, মানুষও তার কভার অর্থাৎ রূপ দেখে পছন্দ করে। চলতি কথা-ই আছে—

পহেলা দর্শনদারি
তারপর গুণ বিচারি।

নাদিয়া বলল, এছাড়া উপায় কী স্যার ? রূপ প্রথমেই চোখে পড়বে। গুণ পড়বে না।

বিদ্যুত বললেন, বইটায় তোমাদের ময়মনসিংহের বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দাও। আমার এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে কিছু কাজ আছে। হাতে সময় থাকলে তোমাদের বাড়িতে যাব। চা খেয়ে আসব।

নাদিয়া ঠিকানা লিখে দিল। হঠাৎ সে লক্ষ করল, ঠিকানা লেখার সময় হাত কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে ?

স্যার আমি উঠি।

আচ্ছা যাও। ভালো থেকো।

আপনিও ভালো থাকবেন। ময়মনসিংহ যদি সত্যি সত্যি যান তাহলে আমাদের বাড়িতে থাকবেন। আমি খুব খুশি হব।

'রোমান হলিডে' ছবি শুরু হয়েছে। নাদিয়া ছবির দিকে মন দিতে পারছে না। তার মন পাশের খালি সিটের দিকে। সে নিশ্চিত স্যার এসে পাশের সিটে বসবেন।

বিশ মিনিট পার হবার পর নাদিয়ার পাশের সিটে এসে বসল ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট কিসমত। স্যার তার টিকিট কিসমতকে দিয়ে দিয়েছেন।

হাবীবের সামনে হাজি সাহেব একা বসা। চেম্বারে মানুষ মাত্র তিনজন। হাবীব, হাজি সাহেব, প্রণব। রশিদকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাবীব প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, জর্দা ছাড়া আমাকে একটা পান দাও তো।

প্রণব পানের কৌটা খুলতে খুলতে হাজি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকেও কি একটা পান দিব ?

হাজি সাহেব বললেন, না।

প্রণব বললেন, পানের মধ্যে আছে সাতটা শিরা। সাত শিরার মধ্যে মধ্যমটা বিষ। বাকিগুলি অমৃত। মধ্যমটা বাদ দিয়ে পান খেলে শরীরের জন্যে ভালো। একটা খান ?

হাজি সাহেব বললেন, না। আমি পান যে কোনোদিন খাই নাই তা না। পান খাওয়ার অভ্যাস ভালোই ছিল। আমার স্ত্রী নিজের হাতে পান বানায়ে আমার জন্যে সাজায়ে রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

প্রণব বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেউ তাজমহল বানায়, আবার কেউ পান খাওয়া ছেড়ে দেয়।

হাবীব বললেন, প্রণব, তুমি মুখভর্তি করে পান নাও। পান চাবাতে থাকো, কথা বন্ধ। এই ফাঁকে আমি হাজি সাহেবকে অতি জরুরি কথাটা বলে শেষ করি। হাজি সাহেব, আরও কাছে আসেন। আমি নিচুগলায় কথা বলব।

হাজি সাহেব এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখে সামান্য শঙ্কা। হাবীব বললেন, আপনার মামলা আমি কীভাবে সাজিয়েছি সেটা শুনেন—

আপনি আপনার ছেলের জন্যে একজন কেয়ারটেকার জাতীয় মানুষ রেখেছিলেন। যার দায়িত্ব সবসময় আপনার ছেলের সঙ্গে থাকা। হাওরে পাখি শিকার আপনার ছেলের শখ। সেই কেয়ারটেকার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আপনার ছেলের সঙ্গে হাওরেও যায়। সে বন্দুক চালাতে পারে। খুন সেই লোক করেছে। কোর্টে সে স্বীকার যাবে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিবে।

হাজি সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, আমার ছেলের হয়ে ওই লোক জেলে যাবে ?

হ্যাঁ।

যদি তার ফাঁসি হয় ?

হাবীব বললেন, ফাঁসি হলে ফাঁসিতে ঝুলবে। তবে ফাঁসি হবে না। মামলা এমনভাবে সাজানো হবে যে প্রত্যক্ষদর্শী নাই। তাছাড়া সে খুনের উদ্দেশ্যে খুন করে নাই। ভোরবেলা পাখি শিকারে যাবে বলে আপনার ছেলে তাকে বলেছে বন্দুক পরিষ্কার করতে। সে বন্দুক পরিষ্কার করার জন্যে বন্দুক নিয়ে বাইরে এসেছে। বন্দুকে গুলি ভরা ছিল, সে খেয়াল করে নাই। গুলি হয়ে গেছে। এক্সিডেন্টে মৃত্যু। সাজা দশ বছরের বেশি হবে না। জেলখানায় নয় মাসে বছর। আট বছরের মাথায় বের হয়ে আসবে।

হাজি সাহেব বললেন, এমন লোক আমি পাব কই ?

হাবীব বললেন, আমি জোগাড় করে দিব।

আপনি কই পাবেন ?

হাবীব বললেন, এই ধরনের কাজের জন্যে কিছু লোকজন আমি পুষি। পোষা একজনকে দিব। তার নাম ফরিদ। সে আপনার ছেলের হয়ে সাজা ভোগ করে আসবে। আপনি দুই লাখ টাকার জোগাড় দেখেন। আমি রাখব দেড়। ফরিদকে দিব পঞ্চাশ হাজার। এই টাকায় সে জমি কিনবে। ঘর তুলবে। ব্যবসা করবে। কিছুদিন জেল খাটবে।

হাজি সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, যদি কোনো ঝামেলা হয় ? যদি ওই লোকের ফাঁসি হয়ে যায় ?

ফাঁসি হয়ে গেলে হবে।

হাজি সাহেব বললেন, আমার ছেলে রাজি হবে না।

হাবীব বললেন, ছেলেকে রাজি করার দায়িত্ব আমার না। আপনার। তাকে আমি যা শিখিয়ে দিব, তা-ই সে কোর্টে বলবে। এর বাইরে একটা শব্দ বলবে না। কোর্টে কোনো কারণে সে যদি কাশতে চায়, আমাকে জিজ্ঞেস করে কাশবে।

হাজি সাহেব বললেন, ফরিদ সাহেবের সঙ্গে আমি কি কথা বলতে পারি ?

না।

টাকার জোগাড় কতদিনের মধ্যে করতে হবে ?

যত তাড়াতাড়ি পারেন।

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। হাজি সাহেব ব্যাকুল গলায় বললেন, আপনি কি চলে যাচ্ছেন ?

হাবীব বললেন, হ্যাঁ চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা যা বলার বলা হয়েছে। বাকি কথা হবে টাকা হাতে পাওয়ার পর। অনেকদিন পর ঢাকা থেকে আমার মেয়ে এসেছে। মেয়েকে কিছু সময় দিব। আপনি যান, আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলুন। কোর্টে কীভাবে মামলা উঠবে তা বুঝিয়ে বলুন। আপনি বুঝিয়ে বলতে না পারলে প্রণবকে সঙ্গে নিন।

নাদিয়া তার দাদির ঘরে। হাজেরা বিবি যেভাবে পা লম্বা করে খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন, নাদিয়াও সেভাবে বসেছে। দাদির পান ছেঁচনি তার হাতে। সে নিবিষ্ট মনে পান ছেঁচে যাচ্ছে।

নাদিয়া লম্বা রোগা একটি মেয়ে। তার চেহারার শান্ত স্নিগ্ধতা চোখে পড়ার মতো।

হাজেরা বিবি বললেন, তোর গায়ের রঙ তো আরও ময়লা হইছে।

নাদিয়া বলল, গায়ের রঙ ময়লা হলেও অসুবিধা নাই দাদি। আমার অন্তরের রঙ খুব পরিষ্কার। তুমি দুধের মতো ধবধবে সাদা একজন মানুষ। তোমার অন্তর কালো। কুচকুচে কালো।

হাজেরা বিবি বললেন, কথা সত্য বলেছিস। আমার অন্তরও তোর মতো সাদা ছিল। এই বাড়িতে সংসার করতে আইসা নানান প্যাঁচের মধ্যে পড়লাম। নিজে প্যাঁচ শিখলাম। অন্তর কালা হওয়া শুরু হইল। শেষমেষ একটা খুনও করলাম।

নাদিয়া অবাক হয়ে বলল, খুন করেছ মানে! কাকে খুন করেছ?

নিজের হাতে করি নাই। অন্যরে দিয়া করাইছি।

কাকে খুন করেছ সেটা বলো।

হাজেরা বিবি নির্বিকার গলায় বললেন, বেদানা নামের একটা নটি বেটি এই বাড়িতে থাকত। তার কইন্যা হয়েছিল। ধাইরে বললাম কইন্যার মুখে লবণ দিয়া দিতে। ধাই তাই করছে। এক চামচ লবণে কারবার শেষ।

নাদিয়া বলল, দাদি, তুমি কি সত্যি কথা বলছ?

হাজেরা বিবি বললেন, তুই পাগল হইছস? আমি কি পিশাচ? বেদানা মাগি মরা সন্তান প্রসব করছে। তিন তিনবার মরা সন্তানের জন্ম দিয়া তার মাথা হইছে খারাপ।

নাদিয়া বলল, দাদি, আমার গা ছুঁয়ে বলো লবণ বিষয়ে যা বলেছ সব মিথ্যা।

হাজেরা বিবি বললেন, অবশ্যই মিথ্যা। লতিফা সাক্ষি। তারে জিজ্ঞাস কর। সে বলবে। দে পান দে।

নাদিয়া দাদির হাতে পান দিল। লাইলী ঘরে ঢুকে বললেন, তোজল্লী! তোমার বাবা তোমাকে ডাকে।

লাইলী শাশুড়ির সামনে নামের বিষয়ে কখনো ভুল করেন না। আজও করলেন না।

হাবীব বসেছেন পূর্বদিকের বারান্দায়। এই বারান্দা তাঁর শোবার ঘরের লাগোয়া। এখান থেকে দূরের মৃত ব্রহ্মপুত্র দেখা যায়। সারাক্ষণই একদল মানুষ ব্রহ্মপুত্রের মাটি কাটছে। হাবীবের শৈশবের স্বপ্ন ছিল একটা নদী কিনবেন। শৈশবের সব স্বপ্নই পরিণত বয়স পর্যন্ত থাকে। এখনো হাবীবের মনের এক গোপন স্থানে নদী

কেনার বিষয়টা আছে। বারান্দায় বসলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনে হয় ব্রহ্মপুত্র নদীটা তাঁর কেনা। যারা মাটি কাটছে তারা অনুমতি না নিয়েই কাটছে।

বাবা, কেমন আছ ?

নাদিয়া আয়োজন করে বসে বাবাকে কদমবুসি করল। হাবীব মেয়ের মাথায় হাত রেখে উঁচুগলায় বললেন, হাসবুনাল্লাহে নিয়ামুল ওয়াকিল ও নিয়ামুল মওলা ও নিয়ামুন নাসির।

নাদিয়া বলল, প্রশ্নের জবাব দিলে না তো বাবা। কেমন আছ ?

ভালো আছি মা।

তোমার বুকের ব্যথাটা কি আরও হয়েছে ?

হয় মাঝে মাঝে।

ডাক্তার কী বলে ?

ডাক্তার কিছু বলে না। প্রেসার ট্রেসার মেপে চলে যায়।

নাদিয়া বলল, ভিজিট নিশ্চয়ই নেয় না।

হাবীব বললেন, নেয় না। নিজেদের ডাক্তার।

নাদিয়া বলল, নিজেদের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা হয় না বাবা। অন্যদের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়।

হাবীব বললেন, তোর ইউনিভার্সিটির খবর কী ?

নাদিয়া বলল, আন্দোলন চলছে। রোজই মিটিং মিছিল। একদলকে আরেকদল ধাওয়া করছে।

হাবীব বিরক্ত গলায় বললেন, এরা চায় কী ?

নাদিয়া বলল, জানি না বাবা।

হাবীব বললেন, না জানাই ভালো। ছাত্ররা চায় নৈরাজ্য। আর কিছু না। তাদের উস্কে দেওয়ার লোক আছে—মাওলানা ভাসানী। আজগুবি সব বিষয় নিয়ে আন্দোলনের ডাক। ভুখা মিছিল। অনশন। পারলে সে একাই কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দেশটাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসে। তার চ্যালাটা বসে আছে জেলে। ফাঁসিতে ঝুলার অপেক্ষায়।

নাদিয়া বলল, উনার চ্যালা কে ?

হাবীব তিক্ত গলায় বললেন, বাদাইম্যা সবাই তার চ্যালা। মূল চ্যালা শেখ মুজিব। ইন্ডিয়ার কাছে গোপনে দেশ বিক্রি করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এখন ফাঁসিতে ঝুলে দোল খাও।

নাদিয়া বলল, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন বাবা?

হাবীব বললেন, দেশটাকে ভালোবাসি বলে রেগে যাচ্ছি।

নাদিয়া বলল, বাবা, চা খাবে? আমি খুব ভালো চা বানানো শিখেছি। একটা কেরোসিনের চুলা কিনেছি। রুমে লুকানো আছে। হাউস টিউটররা যখন রাতের রোল কল শেষ করে চলে যান, তখন চা বানাই।

হাবীব বললেন, অনুমতি নাই এ ধরনের কাজ করা ঠিক না। একসময় ঘরে আগুন-টাগুন লাগাবি। কেলেঙ্কারি হবে।

নাদিয়া হাসিমুখে বলল, একদিন আগুন লেগেছিল বাবা। বিছানার চাদরে আগুন ধরে গিয়েছিল। হাতের কাছে পানিভর্তি জগ থাকায় রক্ষা।

নাদিয়া চার কাপ চা বানিয়েছে। এক কাপ চা সে তার দাদিকে দিয়ে এসেছে। এক কাপ তার মা'কে। বাকি দু'কাপ নিয়ে সে তার বাবার সঙ্গে বসেছে।

হাজেরা বিবি চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন, নাতনি কী চা বানাইছে? চায়ের মধ্যে 'পাদে'র গন্ধ।

লাইলী দুঃখিত গলায় বললেন, চা ভালো না লাগলে ফেলে দেন। আজেবাজে কথা কেন বলেন! তোজল্লী শুনলে মনে কষ্ট পাবে। নিজে আগ্রহ করে চা বানিয়েছে।

হাজেরা বিবি বললেন, পাদ দিয়া চা ক্যামনে বানাইছে এইটাই আমার জিজ্ঞাসা।

লাইলী হতাশ গলায় বললেন, চা খাওয়ার দরকার নাই মা। ফেলে দিন। নোংরা কথাগুলি বলবেন না। চায়ে তোজল্লী সামান্য ওভালটিন দিয়েছে। আপনি ওভালটিনের গন্ধ পাচ্ছেন। আপনি চায়ের কাপটা দিন, আমি ফেলে দেই।

হাজেরা বিবি বললেন, ফেলবা কেন? খাইতে তো চমৎকার হইছে।

নাদিয়া তার বাবাকে বলল, চা খেতে কেমন হয়েছে বাবা?

হাবীব বললেন, ভালো হয়েছে।

আমি রোজ সন্ধ্যায় তোমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াব।

আচ্ছা।

ম্যাজিক দেখবে বাবা?

তুই ম্যাজিক জানিস না-কি?

অল্প কয়েকটা জানি। আমার ডান হাতে কী আছে দেখো তো। একটা কয়েন না?

হুঁ।

এই কয়েনটা আমি ডান হাত থেকে বাম হাতে নিয়ে গেলাম। ঠিক কি না বলো?

হুঁ। ঠিক।

নাদিয়া বাঁ হাত খুলে দেখাল হাত শূন্য। হাবীব বিস্মিত হয়ে বললেন, কীভাবে করলি?

নাদিয়া বলল, পামিং করে করেছি। কয়েনটা সবসময় আমার ডান হাতেই ছিল। তোমার মনে হয়েছে আমি বাঁ হাতে চালান করেছি। আসলে তা-না। একে বলে পামিং। হাতের তালুতে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার বিদ্যা। এখন আমি দিনরাত পামিং প্র্যাকটিস করি।

পড়াশোনা বাদ দিয়ে পামিং?

নাদিয়া বলল, আমি পড়াশোনার বিষয়ে খুব সিরিয়াস বাবা। পামিং প্র্যাকটিস করি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে।

হাবীব বললেন, হঠাৎ এইসব ধরলি কেন?

নাদিরা বলল, ম্যাজিকে হঠাৎ উৎসাহ কেন হয়েছে তোমাকে বলি। ক্লাসে গিয়েছি। বিদ্যুত স্যারের ক্লাস। বিদ্যুত কান্তি দে। উনি মধ্যাকর্ষণ সূত্র পড়াবেন। স্যার ক্লাসে ঢুকলেন হোমিওপ্যাথির ওষুধ রাখে এরকম ছোট্ট একটা শিশি নিয়ে। শিশিটা তিনি টেবিলে রাখলেন এবং বললেন, প্রিয় শিষ্যরা! এই বোতলটা কি আপনাআপনি শূন্যে ভাসবে?

আমরা সবাই বললাম, না।

তিনি বললেন, কেন আপনাআপনি শূন্যে ভাসবে না?

আমরা বললাম, মধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে শূন্যে ভাসবে না। পৃথিবী তাকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখবে।

স্যার তখন বোতলের দু'হাত ওপরে ব্ল্যাক বোর্ডের ডাস্টার ধরলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখি বোতলটা টেবিল ছেড়ে শূন্যে ভেসে উঠল। স্যার বললেন, প্রিয় শিষ্যকুল। যা দেখেছ তাতে বিভ্রান্ত হয়ো না। এটা একটা সাধারণ ম্যাজিক। কারোরই ক্ষমতা নেই মধ্যাকর্ষণ বল অগ্রাহ্য করার। স্যার বললেন, তোমরা কি এই ম্যাজিক দেখে খুশি হয়েছ?

আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম, জি স্যার।

তিনি বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাজিক হচ্ছে সায়েন্স। আমরা সেই ম্যাজিকে এখন ঢুকব। সায়েন্সের ম্যাজিক আমরা যতই জানব ততই আমরা অবাক হব। বিস্মিত হব, মুগ্ধ হব। এখন প্রিয় শিষ্যকুল হাততালি দাও, আমি বক্তৃতা শুরু করি।

আমরা হাততালি দিলাম।

স্যার বললেন, মহাকর্ষ বল যিনি প্রথম টের পেয়েছিলেন সেই মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে এক মিনিট standing ovation দিলে কেমন হয়!

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। তারপর স্যার বক্তৃতা শুরু করলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম।

তোর এই স্যার ছাত্র-ছাত্রীদের শিষ্য ডাকেন ?

হুঁ। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের শিষ্য ডাকতেন। তিনিও তাই করেন।

তোর এই স্যার বিজলি না বিদ্যুত ?

বিদ্যুত। বিদ্যুত কান্তি দে।

তিনিই তোকে ম্যাজিক শেখান ? তিনি কি তোর ম্যাজিকেরও শিক্ষক ?

আমি একদিন স্যারের কাছে গিয়েছিলাম বোতল কীভাবে শূন্যে ভাসে তা শেখার জন্যে। তখন স্যার পামিং-এর কৌশল শিখিয়েছিলেন।

হাবীব গম্ভীর গলায় বললেন, তুই কি একাই তার কাছে ম্যাজিক শিখিস ? না-কি সব শিষ্যদেরই তিনি ম্যাজিক শেখান ?

নাদিয়া বলল, বাবা, তুমি কি কোনো কারণে স্যারকে অপছন্দ করছ ?

হাবীব বললেন, পছন্দ-অপছন্দের বিষয় না। একজন ফিজিক্সের শিক্ষক ছাত্রদের ফিজিক্স শেখাবেন। ম্যাজিক না।

নাদিয়া বলল, আইনস্টাইন ছিলেন ফিজিক্সের গ্র্যান্ডমাস্টার। তিনি বেহালা বাজাতেন।

হাবীব বলল, এই প্রসঙ্গটা থাক।

নাদিয়া বলল, বিদ্যুত স্যার একদিন ক্লাসে কী করেছিলেন সেই গল্পটা করি বাবা। তুমি খুব মজা পাবে।

হাবীব বললেন, তোর স্যারের প্রসঙ্গ নিয়ে এক দিনে অনেক আলাপ হয়ে গেছে। আজ আর না।

নাদিয়া বলল, স্যারের একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে। তিনি একটা বিষয়ে তোমার সাহায্য চান।

হাবীব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার সাহায্য ?

নাদিয়া বলল, ঠিক তোমার সাহায্য না। মোনায়েম চাচার সাহায্য। স্যার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছেন। উনি হিন্দু তো, শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। মোনায়েম চাচাকে তুমি বলে দিলেই স্যারের সমস্যার সমাধান হবে।

হাবীব বললেন, কোনো হিন্দুকে স্কলারশিপ দিয়ে বাইরে পাঠানোর বিষয়ে আমার মত নেই। কারণ তারা Ph.D. শেষ করে কখনো পাকিস্তানে ফেরে না। হয় ওই দেশেই থেকে যায়, কিংবা ইন্ডিয়াতে চলে যায়।

নাদিয়া বলল, বিদ্যুত স্যার সেরকম মানুষ না।

তুই তার সঙ্গে কতটুক মিশেছিস যে বলে ফেললি তিনি সেরকম মানুষ না ? সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না। তোর মা কি আমাকে বুঝতে পারে ? পারে না। আমিও তাকে বুঝতে পারি না।

নাদিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিচুগলায় বলল, বাবা, তুমি স্যারের কাজটা করে দেবে ?

হাবীব দীর্ঘ সময় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নাদিয়া মাথা নিচু করে আছে। তার চোখ ছলছল করছে। হাবীব বললেন, তোর স্যারের কাজটা আমি করে দেব।

নাদিয়া বলল, থ্যাংক য়্যু বাবা।

হাবীব বললেন, তোর চোখে পানি কেন ?

নাদিয়া বলল, তুমি স্যারের কাজটা করে দেবে না এই ভেবে দুঃখে আমার চোখে পানি এসেছে।

হাবীব বললেন, এত দুঃখ পাওয়ার কি কিছু আছে ?

নাদিয়া জবাব দিল না।

হাবীব বললেন, আমি আরেক কাপ চা খাব। যা চা বানিয়ে আন।

হাজেরা বিবি ডাকছেন, হাবু হাবু! হাবুরে! ও হাবু!

হাবীব বিরক্ত মুখে উঠে গেলেন। মা'র ঘরে ঢুকলেন। হাজেরা বিবি পাশে বসার জন্যে ইশারা করলেন। তিনি পাশে বসলেন না।

হাজেরা বিবি বললেন, কাছে বোস। তোরে একটা গোপন কথা বলব।

হাবীব অনিচ্ছায় পাশে বসলেন।

হাজেরা বিবি বললেন, গোপন কথা বলার আগে তোরে একটা শিল্লুক ভাঙানি দেই। শিল্লুক ভাঙাইতে পারলে গোপন কথা বলব। না পারলে বলব না। শিল্লুকটা হইল—

কাটলে 'লউ' নাই
না কাটলে 'লউ'
দিনেরবেলা লেংটা ঘুরে
মুক্তারপাড়ার বউ।

হাবু! ক' দেখি জিনিসটা কী?

হাবীব কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘুমুতে যাবার আগে রাতের শেষ খবর শুনে হাবীব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আয়ুব খানকে নজরুল একাডেমী বিশাল সংবর্ধনা দিয়েছে। সেখানে আয়ুব খান বলেছেন—একদিন দেশের সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি 'পাকিস্তানি ভাষা' হবে।

হাবীবের মনে হলো জগাখিচুড়ি ভাষার দরকার কী? আয়ুব খান সবাইকে খুশি করতে চাচ্ছেন। সেটা সম্ভব না। সবাইকে খুশি রাখা যায় না। আয়ুব খান নরম ভাব ধরেছেন। কাউকে নরম দেখলে বাঙালি আৎকা গরম হয়ে যায়। সাপের মতো ফোঁসফাঁস শুরু করে।

আয়ুব খানকে নরম না হয়ে কঠিন গরম হতে হবে। তখনই সব সাপ গর্তে ঢুকবে। গর্তে আঁকাবাঁকা হয়ে ঢোকার বুদ্ধি নেই। গর্তে সোজা হয়ে ঢুকতে হয়। বাঙালি জাতির সোজা হয়ে গর্তে ঢোকার সময় হয়ে গেছে।

নাদিয়ার হাতে পুরনো দিনের বাহারি গ্লাস। গ্লাসভর্তি চা। গ্লাস গরম হয়ে আছে। হাত দিয়ে ধরা যাচ্ছে না। নাদিয়া গ্লাসটা ধরেছে তার রুমাল দিয়ে। রুমালে সেন্টের গন্ধ। যতবার সে চায়ে চুমুক দিচ্ছে, ততবারই চায়ের গন্ধের সঙ্গে সেন্টের গন্ধ মিলে অন্যরকম সৌরভ তৈরি হচ্ছে। গন্ধটা ভালো লাগছে না, আবার খারাপও লাগছে না। নাদিয়া যাচ্ছে তার গাছের কাছে। গাছের নাম কদম।

নাদিয়ার ছোটমামা তাকে তার পঞ্চম জন্মদিনে এই গাছটা দিয়ে বলেছিলেন, নিজের হাতে এই গাছ লাগাবি। এখন তোর বয়স পাঁচ। যখন বয়স ষোল হবে, তখন এই গাছ মহীরুহের মতো বড় হয়ে যাবে। প্রতি বর্ষায় ফুল ফুটাবে। তখন তুই গাছের চারদিক বাঁধিয়ে দিবি। তুই আর তোর স্বামী গাছের বাঁধানো পাড়ে বসে গল্প করবি। আমি দূর থেকে দেখব। নাদিয়ার মামা সেই বছরই যক্ষায় মারা যান। দূর থেকে কোনো দৃশ্যই তাঁর দেখা হয়নি।

গাছ প্রসঙ্গে ছোটমামার কথা ফলেছে। কদমগাছ বিশাল হয়েছে। বর্ষার শুরুতে ফুলে ফুলে নিজেকে সে ঢেকে ফেলে। যেন শত শত সোনালি টেনিস বল নিয়ে কদমগাছ দাঁড়িয়ে থেকে বলে, এসো আমার সঙ্গে বর্ষার খেলা খেলবে। নাদিয়া তার স্কলারশিপের টাকায় গাছের চারপাশ বাঁধিয়ে দিয়েছে এবং ছেলেমানুষের মতো বলেছে, এই গাছের বাঁধানো পাড়ে আমি ছাড়া কেউ বসবে না। নাদিয়ার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। এই গাছের বাঁধানো পাড়ে কেউ বসে না।

বাগানে ঢুকে নাদিয়া চমকে উঠল। তার গাছের বাঁধানো পাড়ে অচেনা একজন মানুষ বসে আছে। মানুষটার হাতে বই। সে বই পড়ছে। সন্ধ্যা হয় হয় সময়। আকাশ মেঘলা থাকায় আলো নেই বললেই হয়। এত অল্প আলোতে বই পড়া কষ্টের। মানুষটা চোখের কাছে বই ধরে এই কাজটা করছে। নাদিয়া প্রায় নিঃশব্দে লোকটার কাছাকাছি চলে এল। শান্ত গলায় বলল, আপনি কে?

মানুষটা হঠাৎ কথা শুনে থতমত খেয়ে গেল। তার হাত থেকে বই পড়ে গেল। সে চট করে উঠে দাঁড়াল। তখন তার কোল থেকে পড়ল একটা চামড়ায় বাঁধানো খাতা এবং কলম।

আমি এই বাড়িতে থাকি।

নাদিয়া বলল, এই বাড়িতে অনেকেই থাকে। আপনি এই বাড়িতে থাকেন—এটা কোনো পরিচয় হতে পারে না।

আমার নাম হাসান রাজা চৌধুরী।

আপনি কি বাবার নতুন কোনো কর্মচারী ?

না।

কিছু মনে করবেন না। যতবারই আমি ছুটিতে বাড়িতে আসি, ততবারই বাবার নতুন কোনো কর্মচারী দেখি। এইজন্যেই বলেছি। আপনি কতদিন ধরে এখানে আছেন ?

সতেরো দিন।

সতেরো দিনে কেউ আপনাকে বলেনি যে কদমগাছের নিচে বসা নিষেধ ?

বলে নাই। নিষেধ কেন ?

নাদিয়া বলল, আমি নিষেধ করেছি এইজন্যে নিষেধ। এই গাছটা আমার। এখানে আমি একা বসি।

হাসান বলল, আর বসব না।

নাদিয়া বলল, বিকেলে বই পড়ার জন্যে এই বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আপনি পুকুরঘাটে বসতে পারেন।

হাসান বলল, আমি বেশির ভাগ সময় সেখানেই বসি।

নাদিয়া বলল, চা খাবেন ? আপনাকে চা দিতে বলব ? আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি তো, এইজন্যে চায়ের কথা বলে কাটান দেওয়ার চেষ্টা করছি।

হাসান বলল, আমি চা খাব না।

নাদিয়া বলল, আমাকে কি আপনি চিনেছেন ?

আপনি এই বাড়ির মেয়ে। আপনার নাম নাদিয়া।

নাদিয়া বলল, আমার তিনটা নাম। একটা নাম তোজল্লী, আমার দাদি রেখেছেন। বাবা-মা নাম দিয়েছেন নাদিয়া। ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা আমাকে ডাকে 'দিয়া'। তারা 'না' বাদ দিয়েছে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন চলে যান। আমি একা একা বসে চা খাব। ভালো কথা, আপনি গত সতেরো দিন ধরে কোথায় অর্থাৎ কোন ঘরে থাকেন ?

হাসান আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

নাদিয়া বলল, অতিথঘরে থাকেন ? ভূত দেখেছেন ? অতিথঘরে ভূত থাকে। বেদানা নামের একটা মেয়ে ওই ঘরে শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সুইসাইড করেছিল। নিশিরাতে হঠাৎ হঠাৎ তাকে দেখা যায়। অনেকেই দেখেছে। আপনি দেখেননি ?

না।

ঘুমিয়ে রাত পার করলে কীভাবে দেখবেন ? সারা রাত জেগে থাকবেন, তাহলে দেখতে পাবেন। আচ্ছা এখন যান। কী আশ্চর্য! বইখাতা সব ফেলে চলে যাচ্ছেন। নিয়ে যান।

নাদিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিতে খারাপ লাগছে না। অন্ধকার নামছে। দিঘির পানি শুধু চকচক করছে। আর সবই অন্ধকার। মাগরেবের আযান হচ্ছে। নাদিয়া শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিল। শুকনা পাতায় সড়সড় শব্দ হচ্ছে। সাপ যাচ্ছে মনে হয়। নাদিয়া পা উঠিয়ে বসল। সে হঠাৎ বিষণ্ন বোধ করল। ছোটমামার নামটা সে মনে করতে পারছে না। তার এত প্রিয় একজন মানুষ, অথচ নাম মনে পড়ছে না। চোখের আড়ালে যে থাকে মানুষ তাকে দ্রুত ভুলে যায়। ব্রেইন নতুন স্মৃতি রাখার জন্য পুরনো স্মৃতি ধুয়ে ফেলে। হাসান নামে যে মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার স্মৃতি রাখার জন্যে ব্রেইন কিছু জায়গা করেছে। যে অংশে ছোটমামার স্মৃতি ছিল সেই অংশেই জায়গা করেছে কি না কে জানে।

মাগরেবের নামাজ শেষ করে হাবিব জায়নামাজের একটা কোনা ভাঙলেন। ভাঁজ করে রাখলেন। এখন এটা আর জায়নামাজ না। সাধারণ বসার আসন। এখন এখানে বসে সংসারি আলাপ-আলোচনা করা যায়। খাওয়াদাওয়া করা যায়।

লাইলী পানের বাটা হাতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাবিব ইশারায় স্ত্রীকে ডাকলেন।

লাইলী বললেন, পান খাবেন ? পান বানায়া দিব ?

হাবিব বললেন, পান খাব না। তুমি একটু বসো।

তিনি জায়নামাজ থেকে সামান্য সরলেন। ভদ্রতা করা। যেন বলা, আমার সঙ্গে জায়নামাজে বসো। যদিও সেরকম জায়গা নেই। লাইলী বসলেন তাঁর সামনে। হাবীব বললেন, তোমার মেয়ে কোথায় ?

লাইলী বললেন, বাগানে।

হাবীব বললেন, এই বাড়ির কিছু নিয়মকানুন আছে। সন্ধ্যাবেলা মেয়েছেলে বাগানে যাবে না।

লাইলী বললেন, নাদিয়া বাগানে ঘুরতে পছন্দ করে।

হাবীব বললেন, সব পছন্দের গুরুত্ব দিতে হয় না। আজ যদি তোমার মেয়ে বলে—এক হিন্দু শিক্ষককে আমার পছন্দ হয়েছে। তাকে বিবাহ করতে চাই। তুমি কি সেই মালাউনের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবে ?

লাইলী বললেন, নাদিয়া কি এমন কোনো কথা বলেছে ?

হাবিব বললেন, বলে নাই। যদি বলে তুমি কী করবে ? রাজি হবে ?

না।

হাবীব বললেন, এখন কি বুঝতে পেরেছ সব পছন্দের গুরুত্ব দিতে হয় না ?

বুঝতে পারছি।

কাউকে পাঠাও, মেয়েকে নিয়া আসুক।

লাইলী বললেন, আমি নিজেই যাব। নিয়া আসব। লাইলী উঠে দাঁড়াতে গেলেন। হাবীব বললেন, বসো, কথা শেষ হয় নাই।

লাইলী বসলেন। হাবীব বললেন, আমি তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

লাইলী বললেন, আপনার হাতে কি পাত্র আছে ?

আছে। পাত্র এই বাড়িতেই ঘুরঘুর করতেছে।

বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে লাইলী বললেন, একজন খুনির সঙ্গে আপনি মেয়ের বিবাহ দিবেন ?

হাবীব বললেন, হ্যাঁ দিব। খুন একটা দুর্ঘটনা। মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা বড় করে দেখতে হয় না। আত্মরক্ষার জন্যে কিংবা সম্মান রক্ষার জন্যে খুন করা জায়েজ আছে।

লাইলী কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। হাবীব বললেন, ওই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পেছনে তিনটা কারণ আছে। প্রথম কারণ, জমিদার বংশ। ছেলে বাপের একমাত্র ওয়ারিশ। বিশাল বিষয়সম্পত্তি।

লাইলী বললেন, আপনার ধনসম্পদের কমতি নাই। ধনসম্পদের জন্য আপনার 'লালচ' থাকা ঠিক না।

হাবীব বললেন, আমার কথার মাঝখানে কথা বলবা না। স্বামীর কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা শুরু করলে আদবের বরখেলাপ হয়। যাই হোক, ওই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহের দ্বিতীয় কারণ, ছেলেকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করব। সে বাকি জীবন এই কারণে তোমার মেয়ের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

লাইলী বললেন, একজন স্ত্রী স্বামী হিসাবে বন্ধু চায়। কেনা গোলাম চায় না।

হাবীব বললেন, আবারও আদবের বরখেলাপ করলা। যাই হোক, তৃতীয় কারণ শোনো। এই ছেলের চরিত্র ভালো। আমি পরীক্ষা নিয়েছি। পরীক্ষায় সে পাশ করেছে।|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক||

কী পরীক্ষা নিয়েছেন ?

হাবীব বললেন, মলিনা নামে তোমার যে দাসী আছে, গভীর রাতে তাকে ছেলের কাছে নগ্ন অবস্থায় পাঠায়েছিলাম। ছেলে তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করেছে। এবং ঘটনা কারও কাছে প্রকাশ করে নাই।

লাইলী হতভম্ব গলায় বললেন, আপনার মতো মানুষ একজন দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে এমন নোংরা কাজ করে ?

হাবীব বললেন, মলিনার সঙ্গে পরামর্শ আমি করি নাই। প্রণব করেছে।

লাইলী বললেন, কথা একই। প্রণব বাবু আপনার হয়েই কথা বলেছে। কত বড় অন্যায় কাজ আপনি করেছেন তা বুঝতে পেরেছেন ?

হাবীব বললেন, তুমি বুঝতে পেরেছ এই যথেষ্ট। আমার বুঝার প্রয়োজন নাই। একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আমার কথা শেষ। এখন যাও বাগান থেকে মেয়েকে নিয়ে আসো। আরেক কথা, আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবা না। তুমি আদালত না।

লাইলী উঠে দাঁড়ালেন। হাবীব এশার নামাজের প্রস্তুতি নিলেন। মাগরেবের নামাজ শেষ করে এশা পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকা এবং এশার নামাজ আদায় করা একটা উত্তম সুন্নত।

বাগানে ঢোকার মুখে প্রণবের সঙ্গে লাইলীর দেখা হলো। প্রণব রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খিচুড়ি বসাবেন। কাঁচামরিচ খিচুড়ি। এক মুঠ চাল, এক মুঠ ডাল, দশটা কাঁচামরিচ, এক চামচ ঘি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না হবে। আঁচের বেশকম হলেই খিচুড়ির ঝাল ঠিক থাকবে না।

লাইলী ডাকলেন, প্রণব বাবু, একটু শুনে যান।

প্রণব ছুটে গেলেন। মাথা নিচু করে জোড়হাতে নমস্কার বললেন। লাইলী বললেন, আমার বাপের বাড়ির যে দাসী এ বাড়িতে থাকে, মলিনা নাম, তাকে আগামীকাল ভোরবেলায় টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করে দেবেন।

প্রণব বললেন, অবশ্যই। সকাল আটটার পর তাকে আর এ বাড়িতে দেখবেন না।

রান্না বসিয়েছেন ? কী রাঁধছেন ?

মরিচ-খিচুড়ি। হরিদ্বারের এক সাধুবাবার কাছ থেকে এই রান্না শিখেছি। ঠিকমতো রাঁধতে পারলে অমৃত। মন্ত্র পাঠ করতে করতে রাঁধতে হয়।

কী মন্ত্র ?

প্রণব হাতজোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পাঠ করলেন—

গন্ধপুষ্পে ওঁ গনপতয়ে নমঃ

গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ

গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চ দেবতাভ্য নমঃ

মন্ত্রপাঠ শেষ করে প্রণব লজ্জিত গলায় বললেন, এই খিচুড়ি অন্য কাউকে খাওয়ানো গুরুর নিষেধ, নয়তো আপনাকে একদিন রেঁধে খাওয়াতাম।

লাইলী বললেন, আপনি একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। সাধুপ্রকৃতির মানুষ হয়ে বড় বড় অন্যায়গুলি কীভাবে করেন?

প্রণব শান্ত গলায় বললেন, ন্যায়-অন্যায় সবই ভগবান করান। ভগবানের অনুমতি ছাড়া কেউ ন্যায়ও করতে পারে না, অন্যায়ও করতে পারে না।

লাইলী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বাগানের দিকে রওনা হলেন। কদমগাছের নিচে নাদিয়া বসে আছে। তার পরনের শাড়ি সাদা। দূর থেকে সাদা রঙ চোখে পড়ছে। কুমারী মেয়েদের সাদা শাড়ি নিষিদ্ধ, কিন্তু নাদিয়ার প্রিয় রঙ সাদা।

নাদিয়া বলল, আমাকে নিতে তুমি আসবে আমি জানতাম। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

লাইলী মেয়ের পাশে বসতে বসতে বললেন, মশার কামড় খাচ্ছিস?

নাদিয়া বলল, মশা কানের কাছে গুনগুন করছে কিন্তু কামড়াচ্ছে না। মা দেখো, জোনাকির ঝাঁক। অনেকদিন পর জোনাকি দেখলাম। প্রকৃতিতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আছে, তাই না মা? একেকটা ঝাঁকে কতগুলি করে জোনাকি থাকে গোনার চেষ্টা করছি, পারছি না।

লাইলী বললেন, ঘরে চল। এতক্ষণ ধরে বাগানে বসে আছিস, তোর বাবা রাগ করছে।

নাদিয়া বলল, করুক একটু রাগ। মা শোনো, আজ সন্ধ্যাবেলা এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা। গ্রিক দেবতাদের মতো তার রূপ।

গ্রিক দেবতা তুই দেখেছিস?

ছবিতে দেখেছি।

লাইলী বলল, দেবতার সঙ্গে কী কথা হলো?

নাদিয়া বলল, আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমার নিজের আলাদা করা জায়গায় বসেছিল। দেখে হঠাৎ রাগ উঠে গেল।

লাইলী বললেন, আমিও তো বসেছি। আমাকে দেখে রাগ লাগছে না?

লাগছে। তবে বেশি লাগছে না। একা একা এখানে আমি ছাড়া কেউ বসতে পারবে না। আমার সঙ্গে পারবে।

লাইলী বললেন, তোর বাবা তোর বিয়ে দিতে চাচ্ছে।

নাদিয়া হালকা গলায় বলল, দিতে চাইলে দিবে। গাভর্তি গয়না পরে বিয়ে করব।

তোর নিজের পছন্দের কেউ আছে?

না। আর যদি কেউ থাকেও তার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিবে না। আমার বিয়ে করতে হবে বাবার পছন্দের কাউকে।

লাইলী বললেন, চল ঘরে যাই।

নাদিয়া বলল, আরেকটু বসি। চাঁদ দেখে যাই। এখনই চাঁদ উঠবে।

লাইলী বললেন, ঘন জঙ্গলে বসে আছিস, চাঁদ দেখবি কীভাবে?

নাদিয়া বলল, দিঘির পানিতে চাঁদের ছায়া পড়বে। সেটা দেখব। আচ্ছা মা, দাদি যেসব গল্প করে তার সবই কি মিথ্যা?

লাইলী বললেন, বেশির ভাগই মিথ্যা। উনার মাথা পুরোপুরি গেছে। এখন যা মনে আসে বলেন।

নাদিয়া বলল, আমার নিজের কী ধারণা জানো মা? দাদির মাথা ঠিক আছে। তিনি ভাব করেন ঠিক নেই। এতে তাঁর কিছু সুবিধা হয়। তিনি মিথ্যা কথার মাঝখানে কঠিন কঠিন সত্য কথা বলতে পারেন।

লাইলী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হতে পারে।

নাদিয়া বলল, এই বাড়িতে তুমি ছাড়া সবচেয়ে ভালো মানুষ কে বলে তোমার ধারণা?

লাইলী বললেন, জানি না। প্রণব বাবু হতে পারেন।

নাদিয়া বলল, প্রণব কাকা না মা। উনার আচার-আচরণে ভালোমানুষ ভঙ্গি আছে। এই পর্যন্তই। বাবা যদি প্রণব কাকাকে ডেকে বলে, অমুককে খুন করো। প্রণব কাকা নিজে খুনটা করবে না, অন্যকে দিয়ে ঠিকই করাবে।

লাইলী বললেন, হতে পারে।

নাদিয়া বলল, আমার ধারণা এই বাড়ির সবচেয়ে ভালোমানুষ পাংখাপুলার রশিদ।

লাইলী বললেন, ভালোমানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস কেন?

কোনো কারণ নেই, এম্নি। আচ্ছা মা, এই বাড়ির সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটা কে?

লাইলী বললেন, তুই নিজে।

নাদিয়া বলল, হয়েছে। মা, আমি তোমার কাছে আমার বুদ্ধির একটা নমুনা দিচ্ছি। হাসান রাজা চৌধুরী নামের যে ছেলেটার সঙ্গে আমার সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে, বাবা তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছে। ঠিক বলেছি ?

লাইলী কিছু বললেন না। চাঁদ উঠেছে। তিনি দিঘির জলে চাঁদের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মা, ছোটমামার নাম ভুলে গিয়েছিলাম। খুব খারাপ লাগছিল। এখন মনে পড়েছে। একই সঙ্গে অন্য একটা রহস্য ভেদ করেছি।

কী রহস্য ?

সবুজ শাড়ি রহস্য। তুমি তোমার অতি পছন্দের সবুজ শাড়ি পরো না তার কারণ ছোটমামা।

ওই প্রসঙ্গ থাক।

আচ্ছা থাক। আচ্ছা মা ছোটমামার একটা ত্রুটির কথা বলো। ত্রুটিশূন্য একজন মানুষের কথা ভাবতে খারাপ লাগে।

ওর কোনো ত্রুটি ছিল না।

মা ছিল। উনি জানতেন তাঁর কোনো ত্রুটি নেই। এ কারণে তাঁর অহঙ্কার ছিল। অহঙ্কার বড় ধরনের ত্রুটি। ঠিক না মা ?

হ্যাঁ ঠিক।

মা তোমার কি মনে হয়—আমি অহঙ্কারী ?

লাইলী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুই অহঙ্কারী না। তুই তোর ছোটমামার মতো ত্রুটিশূন্য মানুষ।

মা। থ্যাংক যু্য।

হাজেরা বিবির সামনে মলিনা দাঁড়িয়ে আছে। কেঁদে সে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। চোখের কাজল গালে লেপ্টে গেছে। হাজেরা বিবি তার কান্নাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি নিজমনে পান ছেঁচে যাচ্ছেন।

তোরে বিদায় দিয়া দিছে ?

জে।

বিদায় দিল কে ?

প্রণব স্যার।

হেন্দুটা তো বড় ত্যাক্ত করে। এইজন্যেই হেন্দুজাত খারাপ।

মলিনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, কাইল সকাল আটটার আগে বাড়ি ছাইড়া যাইতে বলছেন। কী অপরাধ করলাম কিছুই জানি না। এককথায় বিদায়।

চইলা যাইতে বললে চইলা যাবি। ঘরে দৈ থাকলে দৈ খায়া যাবি। দধি যাত্রা শুভ।

দাদি, কী কন আপনি! আমি চইলা যাব?

হাজেরা বিবি বিরক্ত হয়ে বললেন, তোরে বিদায় দিছে, তুই যাবি না তো কী করবি? ঘরে বইসা ডিম পাড়বি?

মলিনা বলল, বড় সাব ঘটনা এখনো শুনে নাই। বড় সাব শুনলে ব্যবস্থা নিতেন।

কী ব্যবস্থা নিতেন?

আমারে বিদায় করতেন না।

হাজেরা বিবি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমার ছেলে তোরে বিদায় করত না কোন কারণে? তুই কি তার সাথে হাঙ্গা বসছস? দুপুর রাইতে ঠোঁটে রঙ মাখছস। তুই কি নটি বেটি? বদমাগি! দূর হ সামনে থাইকা।

হাজেরা বিবি পান ছেঁচায় মন দিলেন।

খিচুড়ি মুখে দিয়ে প্রণবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝাল। মন্ত্রপাঠে ভুল হয়নি। শুদ্ধ শরীরে রেঁধেছেন। রান্নার সময় হাঁড়িতে কি কোনো মুসলমানের ছায়া পড়েছে? গুরু বলে দিয়েছিলেন, নির্জন স্থানে রান্না করতে হবে। যেন হাঁড়িতে কোনো বিধর্মীর এবং কুকুরের ছায়া না পড়ে। অন্য জীবজন্তুর ছায়া পড়লে অসুবিধা নাই।

কষ্ট করে এই খিচুড়ি খাওয়ার অর্থ হয় না। প্রণব উঠে পড়লেন। রাতে এক গ্লাস দুধ খাবেন।

অতিথঘরের বারান্দায় হাসান রাজা বসে আছে। মূর্তির ভঙ্গিতে বসা। কোনো নড়াচড়া নেই। এই যুবক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে পারে। প্রণবের হরিদ্বারের গুরুরও এই ক্ষমতা ছিল। তিনি চোখের পলকও ফেলতেন না। এই যুবক নিশ্চয়ই পলক ফেলে। তারপরেও পরীক্ষা করা দরকার।

হাসান প্রণবের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। প্রণব সামান্য বিরক্ত হলেন। একজন বয়স্ক মানুষকে সম্মান দেখাতে হয়। তাকে 'আদাব' বললে দোষ হতো না।

প্রণব বললেন, ভালো আছেন?

হুঁ।

রাতের খাওয়া হয়েছে ?

না।

খাওয়া আসে নাই ?

এসেছে, পরে খাব।

প্রণব বললেন, পরে কেন খাবেন ? গরম গরম খেয়ে নেন।

হাসান বলল, ঠান্ডা খাবার খেতে আমার অসুবিধা হয় না।

প্রণব বললেন, আমি আবার ঠান্ডা খেতে পারি না।

হাসান বলল, একেক মানুষ একেক রকম।

প্রণব বসলেন হাসানের পাশের চেয়ারে। মুখোমুখি বসতে পারলে ভালো হতো। চোখের পলক ফেলার ব্যাপারটা ধরা যেত। বারান্দা অন্ধকার হয়ে আছে, এটাও একটা সমস্যা।

প্রণব বললেন, নাদিয়া মা'র সঙ্গে আলাপ করছেন দেখলাম। কী নিয়ে আলাপ ?

হাসান বলল, তেমন কিছু না।

প্রণব বললেন, নাদিয়া অতি গুণের মেয়ে। মাথায় সামান্য ছিট আছে। গুণের সব মানুষই কিছুটা ছিটগ্রস্ত হয়।

হাসান কিছুই বলল না। চুপ করে রইল। প্রণব আশা করেছিলেন হাসান জানতে চাইবে কী ধরনের ছিট। কেউ কিছু জানতে চাইলে সে বিষয়ে বলা যায়। নিজ থেকে বলা এক সমস্যা। প্রণব বললেন, কী ধরনের ছিটগ্রস্ত সেটা বলি। নাদিয়া মা আমাকে বলল, প্রণব কাকা! জোনাকির ঝাঁকে কয়টা করে জোনাকি থাকে আমাকে গুনে বলবেন। উড়ন্ত জোনাকি গুনা কি সম্ভব ?

হাসান এখনো নিশ্চুপ। প্রণব বললেন, মলিনা বলে যে একটা মেয়ে আছে, অল্পবয়স্ক, সুন্দরমতো গোল মুখ। তার চাকরি নট হয়েছে। আগামীকাল ভোর আটটার আগে তাকে চলে যেতে হবে। মনে হয় কোনো বড় ধরনের ভুলত্রুটি করেছে। আপনার সঙ্গে কি কিছু করেছে ?

হাসান বলল, না।

নীলমণি লতাটার পাশে জোনাকির একটা ঝাঁক দেখা যাচ্ছে। হাসান ঝাঁকের জোনাকি মনে মনে গুনছে। সতেরোটা জোনাকি হিসাবে পাওয়া গেল।

হাবীব বৈঠকখানার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। রশিদ বড় তালপাতার পাখায় তাকে হাওয়া করছে। আজ ছুটির দিন। কোর্ট বন্ধ। হাবীব আয়োজন করে খবরের কাগজ পড়তে বসেছেন। ছুটির দিনে তিনি মন দিয়ে কাগজ পড়েন। কোনো খবর বাদ যায় না। কিছু কিছু খবর নিয়ে প্রণবের সঙ্গে আলাপ করেন।

প্রণব বড় একটা জলচৌকিতে আসন করে বসেছেন। তার সামনে পানের বাটা। নানান পদের মসলা ছোট ছোট কৌটায় ভরা। তিনি কৌটার মুখ খুলে মসলার গন্ধ শুঁকে শুঁকে দেখছেন।

হাবীব বললেন, মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে তোমার ধারণা কী প্রণব ?

প্রণব বললেন, সাধুপুরুষ।

হাবীব বিরক্ত গলায় বললেন, সাধুপুরুষ রাজনীতি করে না।

প্রণব বললেন, তাও ঠিক।

হাবীব বললেন, মানুষটার কাজকর্ম চিন্তাভাবনা কিছুই বুঝি না। আয়ুব খানের পক্ষের লোক ছিল—এখন উল্টাগীত শুরু করেছে। গদি ছাড়তে বলতেছে। তার হিসাব কিছুই বুঝতেছি না।

প্রণব বললেন, সাধুপ্রকৃতির মানুষের হিসাব বুঝতে সাধুমানুষ লাগে। সবাই পারে না। বগুড়ার মোহম্মদ আলির কথা চিন্তা করেন। সবাই তার হিসাব জানে। কারণ সে চোরপ্রকৃতির।

হাবীব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, চোরপ্রকৃতির বললা কী জন্যে ?

প্রণব পান মুখে দিতে দিতে বললেন, পূর্বপাকিস্তানের এমএলএ যারা তারা সবাই শপথ করে গেল সংসদে তারা পূর্বপাকিস্তানের দাবিদাওয়া তুলবে। বগুড়ার মোহম্মদ আলি নিজেও শপথ নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে পৌছেই আয়ুব খানের সঙ্গে আঁতাত করে বসলেন। এই দিকে আমি মোনায়েম খান সাহেবকে ধন্যবাদ দিব। উনি আগে কোনো শপথ করেন নাই। স্যার, পান খাবেন ?

হাবীব বললেন, দাও খাই। জর্দা ছাড়া। জর্দা সহ্য হয় না। মাথা ঘুরে।

প্রণব বললেন, সামান্য দেই ? জর্দা ছাড়া পান আর বোতাম ছাড়া শার্ট একই। বোতাম ছাড়া শার্টে নিজেকে নেংটা লাগে। জর্দা ছাড়া পানও নেংটা পান।

দেশের গতিক কী বুঝতেছ ?

কিছু বুঝতেছি না।

পশ্চিম পাকিস্তানে তো ভালো হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভুট্টো সাহেবকে ঢুকায়েছে জেলে। এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানও জেলে। এটা একটা কাজের কাজ হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান ঝামেলা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছু পারে না। দেশ কিছুদিন ঝামেলা ছাড়া চলবে।

প্রণব বললেন, অবশ্যই।

হাবীব বললেন, একজন ঝামেলাওয়ালা, আরেকজন অনশনওয়ালা। কথায় কথায় অনশন। কার কথা বললাম বুঝেছ ?

না।

হাবীব রশিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ফরিদকে ডাক দিয়া আনো। জটিল কিছু কথা তার সঙ্গে আছে। কথার সময় তুমি থাকবা না। বাতাসের প্রয়োজন নাই। আজ আবহাওয়া শীতল।

হাবীব জর্দা দেওয়া পান চিবুচ্ছেন। সামান্য মাথা ঘুরছে, তবে খারাপ লাগছে না। ফরিদ এসে বেতের মোড়ায় বসেছে, তাকে চিন্তিত এবং ভীত মনে হচ্ছে। প্রণব তার জায়গাতেই আছেন। হাবীব ফরিদের দিকে না তাকিয়ে বললেন, কেমন আছ ফরিদ ?

ফরিদ মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, ভালো আছি।

সংসার কেমন চলতেছে ?

ভালো।

ফরিদ, তোমার বুদ্ধি কেমন ?

ফরিদ চমকে তাকাল। কী বলবে বুঝতে পারল না। হঠাৎ বুদ্ধির প্রসঙ্গ কেন চলে এসেছে কে জানে। তার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। পানি খাবার জন্যে উঠে যাওয়া সম্ভব না।

হাবীব বললেন, তোমার বুদ্ধির একটা পরীক্ষা নিব বলে তোমাকে ডেকেছি। আজকের *ইত্তেফাকে* একটা খবর ছাপা হয়েছে—গরুর হাতে গরুচোরের মৃত্যু। খবরটা শব্দ কইরা পড়ো আমি শুনি। খবরটা তৃতীয় পাতায়।

ফরিদ খবরের কাগজ হাতে নিল। তার হাত সামান্য কাঁপছে। সে সব পাতাই খুঁজে পাচ্ছে, তৃতীয় পাতাটা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রণব বের করে দিলেন। ফরিদ পড়তে শুরু করল।

গরুর হাতে গরুচোরের মৃত্যু

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

> ধর্মপাশা অঞ্চলের কুখ্যাত গরুচোর আবুল কাশেমের মৃত্যু হইয়াছে গরুর হাতে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আবুল কাশেম জনৈক গৃহস্থের বাড়ি হইতে একটি বলশালী ষাঁড় চুরি করিয়া হাওরের জনশূন্য প্রান্তর দিয়া দ্রুত পালাইতেছিল। এর মধ্যে তার ধূমপানের নেশা জাগ্রত হয়। সে ষাঁড়ের দড়িটি নিজের কোমরে বাঁধিয়া একটি বিড়ি ধরায়। দেয়াশলাইয়ের আগুন দেখিয়া গরু চমকাইয়া ছুটিতে শুরু করে। এবং গৃহস্থের বাটিতে উপস্থিত হয়। দেখা যায় দড়ির একপ্রান্তে গরুচোরের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। কুখ্যাত গরুচোরের মৃত্যুতে অত্র অঞ্চলে স্বস্তির সুবাতাস বহিতেছে।

ফরিদ খবর পড়া শেষ করে চিন্তিত চোখে হাবীবের দিকে তাকাল। হাবীব বললেন, খবরটায় একটা বড় ভুল আছে। ভুলটা কী ?

ফরিদ বলল, বলতে পারব না স্যার।

হাবীব প্রণবের দিকে তাকালেন। প্রণব মাথা চুলকে বললেন, আমিও পারব না।

হাবীব বললেন, দেয়াশলাইয়ের আগুন দেখে ভয় পেয়ে গরু দৌড়াতে শুরু করল। এই খবরটা নিজস্ব সংবাদদাতাকে কে দিল ? চোর দিতে পারবে না, সে মৃত। তাহলে খবরটা দিতে পারে গরু নিজে। তার পক্ষে কি খবরটা দেওয়া সম্ভব ? এখন ভুল বুঝতে পেরেছ ?

ফরিদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। হাবীব বললেন, ফরিদ, তোমাকে এই ভুলের কথা বলার পেছনে একটা কারণ আছে। যাতে তুমি আমার বিচার বিবেচনায় আস্থা রাখতে পারো। যাতে বুঝতে পারো যে, আমার সিদ্ধান্তে ভুল থাকে না। আমি তোমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি কিছুদিন জেল খাটবা। রাজি আছ ?

ফরিদ বলল, আপনি যা বলবেন তা-ই করব।

হাবীব বললেন, অন্যের অপরাধে জেল খাটবা। তাতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হবে না। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ দিকে কুড়ি বিঘা ধানি জমি পাইবা। তার সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা। রাজি আছ ?

ফরিদ বলল, আপনি যা করতে বলবেন আমি করব। টাকা বা জমি লাগবে না। আপনি একটা কাজ করতে বলতেছেন এ-ই যথেষ্ট।

হাবীব বললেন, টাকা-জমি অবশ্যই লাগবে। তুমি বিবাহ করেছ। তোমার সংসার হয়েছে। জেল থেকে বের হয়ে তুমি রাজার হালে জীবন কাটাবে। আশ্রিত জীবন কাটাতে হবে না।

ফরিদ বলল, কতদিন জেলে থাকতে হবে স্যার ?

হাবীব বললেন, খুব বেশি হলে পাঁচ বছর। এখন তুমি বলো, একজন মানুষের জীবনে পাঁচ বছর কি খুব বেশি সময় ?

জি-না স্যার।

ঘটনাটা মন দিয়ে শোনো, তুমি একজনের অ্যাসিসটেন্ট। তোমার যে মুনিব তার শিকারের শখ। তিনি ভোরবেলা শিকারে যাবেন। তোমাকে দুনলা বন্দুক পরিষ্কার করতে বললেন। তখন দুর্ঘটনা ঘটল। বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেল। একজন মারা গেল।

ফরিদ বলল, যিনি মারা গেলেন তার নাম কী স্যার ?

হাবীব বললেন, তার নাম দিয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। জীবিত মানুষের নামের প্রয়োজন, মৃত মানুষের নামের প্রয়োজন নাই। আদালতে দুর্ঘটনার মামলা হবে। সাজা পাঁচ বৎসরের বেশি হওয়ার কোনো কারণ নাই।

ফরিদ বলল, সাজা বেশি হলেও কোনো ক্ষতি নাই স্যার।

হাবীব বললেন, প্রণব আজ বিকালে তোমাকে জমি দেখাবে। জমি তোমার স্ত্রীর নামে আগামীকাল রেজিস্ট্রি হবে। জেল থেকে বের হয়ে এসে তুমি ঘর তুলে থাকবে।

হাবীব প্রণবকে ইশারা করলেন। প্রণব উঠে গেলেন। ড্রয়ার থেকে টাকার বান্ডিল বের করলেন। পাঁচ টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা। হাবীব বললেন, টাকা ভালোমতো গুণে দেখো।

ফরিদ বলল, গুণতে হবে না স্যার।

হাবীব বললেন, অবশ্যই গুণতে হবে।

ফরিদ টাকা গুণছে। হাবীব প্রণবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আরেকটা পান দাও। দোতলা থেকে হাজেরা বিবি চেঁচাচ্ছেন, ও হাবু! হাবুরে! হাবু কই গেলি ? হাবীব বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন।

হাজেরা বিবির কাছে নাদিয়া উপস্থিত হয়েছে। নাদিয়া বলল, দাদি, কী হয়েছে?

হাজেরা বিবি বললেন, আমার খাটের নিচে আজরাইল বইসা আছে।

নাদিয়া বলল, উনাকে কী করতে বলব? চলে যেতে বলব? না-কি খাটের উপর এসে বসতে বলব?

হাজেরা বিবি কঠিন গলায় কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। হেসে ফেললেন। নাদিয়া বলল, হাসছ কেন দাদি?

হাজেরা বিবি বললেন, তোর বদামি দেইখা হাসলাম। তুই বিরাট দুষ্ট হইছস।

নাদিয়া বলল, তুমিও অনেক দুষ্ট দাদি। সারাক্ষণ সবাইকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। আজরাইল আজরাইল। দিনেদুপুরে আজরাইলের কথা বললে কি কেউ ভয় পাবে? নিশিরাতে বলে দেখতে পারো।

আমারে বুদ্ধি দিবি না। আমার বুদ্ধির প্রয়োজন নাই।

হাজেরা বিবি নাতনিকে হাতের ইশারায় পাশে বসতে বললেন। নাদিয়া বসল। হাজেরা বিবি বললেন, গোপন কথা শুনতে মন চায়? এমন এক গোপন কথা জানি, শুনলে শইলের সব লোম খাড়ায়া যাবে।

নাদিয়া বলল, গোপন কথা শুনতে চাই না।

শুনতে চাস না কেন? আসল মজা গোপন কথার মধ্যে।

নাদিয়া বলল, দাদি, একেকজনের আসল মজা একেকরকম। মা'র আসল মজা রান্নাবান্নাতে, বাবার মজা প্যাঁচ খেলানোয়।

হাজেরা বিবি বললেন, এমন কেউ কি আছে যার কোনো মজা নাই?

থাকতে পারে। আমি জানি না।

নাদিয়া উঠে দাঁড়াল। হাজেরা বিবি বললেন, যাস কই? ঠান্ডা হইয়া বস। গফ করি।

নাদিয়া বলল, আমি বারান্দার কাঠের চেয়ারে ঠান্ডা হয়ে বসব। বারান্দায় বসে আমি অনেক মজা পাই।

কী মজা পাস?

বারান্দায় বসে সবাইকে দেখি। কেউ আমাকে দেখে না। এর অন্যরকম মজা।

হাজেরা বিবি বললেন, আমারে সাথে নিয়া চল। আমি তোর সাথে মজা দেখব।

নাদিয়া দাদিকে হাত ধরে খাট থেকে নামাল। নাদিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি দোতলার বারান্দায় চলে এলেন। টানা বারান্দার একপ্রান্তে তিনটা ভারী হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার। বারান্দা ঘেঁসে কাঁঠালগাছ। প্রাচীন এই গাছ বারান্দায় আব্রু তৈরি করেছে। বারান্দায় কেউ বসেছে কি না, চট করে বোঝা যায় না।

হাজেরা বিবি বসতে বসতে বললেন, কী মজা দেখাবি দেখা।

নাদিয়া বলল, ওই দেখো রশিদ ভাই। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হাজেরা বিবি বললেন, এটা দেখার মধ্যে মজা কী ?

একটা মানুষ গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে, এটা দেখার মধ্যে মজা আছে না ? মানুষ তো গাছ না। সে কতক্ষণ এইভাবে থাকে কী করে এইটাই আমরা দেখব।

তুই পাগলি আছস।

আমরা সবাই পাগল। একেকজন একেকরকম পাগল। তুমি হচ্ছ সেয়ানা পাগল।

হাজেরা বিবি এখন রশিদের ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী হয়েছেন। তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, ঘটনা তো সত্য। এই হারামজাদা ঝিম ধইরা আছে কী জন্যে ? হে চায় কী ? ডাক দিয়া জিগা।

ডেকে জিজ্ঞেস করলে তো দেখার মজাটা থাকবে না। দাদি, এখন পুকুরঘাটের দিকে তাকাও। দেখো একজন বই পড়ছে। তার নাম হাসান রাজা।

হাজেরা বিবি বললেন, এই হারামজাদা এখনো আছে ?

নাদিয়া বলল, সবাইকে হারামজাদা বলছ কেন ?

হাজেরা বিবি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, যে হারামজাদা তারে হারামজাদা বলব না ? মহারাজা বলব ? নিজের বাপরে গুলি কইরা মারছে। বাপ নামাজে বসছে, তখন দু'নলা বন্দুক দিয়া গুলি দিছে। ঠাস ঠাস।

নাদিয়া বলল, এইসব কী বলছ দাদি ?

হাজেরা বিবি বললেন, বাতাসে ভাইস্যা যা কানে আসে তা-ই বলি। আগ বাড়ায়া কেউ আমারে কিছু বলে না। রশিদ হারামজাদাটা গেল কই ?

নাদিয়া বলল, আমরা যখন দিঘির ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন সে চলে গেছে।

গেছে কোনদিকে ?

সেটা তো আমি জানি না দাদি।

হাজেরা বিবি বললেন, জানা দরকার।

কেন জানা দরকার ?

এতক্ষণ খাম্বার মতো খাড়ায়া ছিল, ফুড়ুৎ কইরা চইলা গেল। কই গেল জানা দরকার না ?

নাদিয়া প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, হাসান রাজা নামের এই যুবক নিজের বাবাকে গুলি করে মেরেছে এটা কি সত্য ?

তোর বাপরে জিজ্ঞাস কইরা জান, সত্য না মিথ্যা। তোর বাপ অবশ্য মিছা কথার বাদশা। সমানে মিছা বলবে। তার চউক্ষের দিকে তাকায়া থাকবি মিছা বলার সময় তোর বাপের চউখ পিটপিট করে। আচ্ছা রশিদ হারামজাদা তো আর বাইর হইতেছে না। চিন্তার বিষয় হইল।

নাদিয়া বলল, ঘরে চলো দাদি।

হাজেরা বিবি বললেন, ঘরে যাব না। এইখানে বইসা থাকব।

আমি চলে যাই ?

যা ইচ্ছা কর।

নাদিয়া দোতলা থেকে একতলায় নামল। রান্নাঘরের দরজা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লাইলী বলল, ধুঁয়ার মধ্যে থাকিস না মা। গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যাবে।

নাদিয়া বলল, তুমি তো জীবনের বেশির ভাগ সময় রান্নাঘরে কাটিয়ে দিয়েছ, তোমার গায়ের রঙ কাঁচাহলুদের মতো।

লাইলী বললেন, বিয়ের আগে কুমারী মেয়েদের গায়ে ধুঁয়া লাগলে গায়ের রঙ ময়লা হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর আর রঙ বদলায় না।

নাদিয়া হাসছে। লাইলী বললেন, হাসছিস কেন ?

নাদিয়া বলল, তোমার উদ্ভট কথা শুনে হাসছি। তুমি এমন একজনকে কথাগুলি বলছ যে ফিজিক্সের ছাত্রী। এবং ফেলটুসমার্কা ছাত্রী না। খুব ভালো ছাত্রী।

লাইলী বললেন, রান্নাঘর থেকে যা তো মা।

নাদিয়া বের হলো। রওনা হলো দিঘির ঘাটের দিকে। সে ঠিক করেছে প্রথম দিনের মতো নিঃশব্দে যাবে। তাকে দেখে মানুষটা যখন চমকে উঠবে তখন সে ঠান্ডা গলায় বলবে, আচ্ছা আপনি কি আপনার বাবাকে গুলি করে মেরেছেন ?

নাদিয়া দিঘির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ঘাটের সিঁড়িতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে মানুষটা বই পড়ছে। তার চোখে পানি। 'বানানো দুঃখের গল্পে যে

অশ্রুবর্ষণ করে সে প্রিয়জনদের দুঃখে কখনো অশ্রুবর্ষণ করবে না।'—কথাটা যেন কার? কিছুতেই মনে পড়ছে না। মানুষটা কী বই পড়ছে জানতে ইচ্ছা করছে। ম্যাথমেটেশিয়ান আবেল (Abel) অংকের জটিল কোনো বই পড়লে মুগ্ধ হয়ে অশ্রুবর্ষণ করতেন।

কেমন আছেন?

মানুষটা ঠিক ওইদিনের মতো চমকে উঠল। তার হাত থেকে বই পড়ে গেল। বইয়ের নাম 'তিথিডোর'। লেখক বুদ্ধদেব বসু। এই বই নাদিয়ার পড়া নেই। বইটা পড়তে হবে।

নাদিয়া বলল, আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

হাসান বলল, বসুন।

নাদিয়া বসতে বসতে বলল, দিঘির এই ঘাটটা মনে হয় আপনার খুব পছন্দ?

হাসান বলল, জি।

আপনাদের নিজের বাড়িতে কি এরকম ঘাট আছে?

হাসান বলল, দিঘির ঘাট নেই, তবে হাওরের সঙ্গের ঘাট আছে। আমাদের বাড়ির পেছনে ঘাট। বর্ষার সময় এই ঘাটটা আমার কাছে তাজমহলের চেয়েও সুন্দর মনে হয়।

আপনি কি তাজমহল দেখেছেন?

দেখেছি। আমাদের বাড়িটাও খুব সুন্দর। বাড়ির নামটাও সুন্দর। কইতরবাড়ি।

কী বাড়ি?

কইতরবাড়ি। কইতর হলো কবুতর। বাড়িটার নানান খুপড়িতে শত শত কবুতর বাস করে। আপনি যদি দোতলার বারান্দায় কাকতাড়ুয়ার মতো দুই হাত মেলে দাঁড়ান দুই হাতে কবুতর এসে বসবে। বকম বকম করে ডাকতে থাকবে। কী যে সুন্দর দৃশ্য।

নাদিয়া অবাক হয়ে গল্প শুনছে। অবাক হবার প্রধান কারণ হাসান নামের মানুষটার নিজের বাড়ি সম্পর্কে মুগ্ধতা।

হাসান বলল, আমি আপনাকে অনুরোধ করব এক রাত আমাদের বাড়িতে থেকে আসতে। একবার যদি যান বাকিজীবন এই বাড়ির কথা আপনার মনে থাকবে। স্বপ্নেও আপনি এই বাড়ি দেখবেন।

নাদিয়া বলল, আমি যাব। আচ্ছা আপনার বাবা কি বেঁচে আছেন?

হাসান বলল, হ্যাঁ। উনি এখন ময়মনসিংহেই আছেন। আমি বাবাকে বলব যেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু আমি সঙ্গে যেতে পারব না।

পারবেন না কেন?

আমি বিরাট এক ঝামেলায় পড়েছি। ঝামেলা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।

কথা বলতে না চাইলে কথা বলতে হবে না। আচ্ছা শুনুন, 'তিথিডোর' বইটা আপনার পড়া শেষ হওয়ার পর আমাকে দেবেন। আমি পড়ে দেখব চোখের পানি ফেলার মতো কী আছে। এখন পর্যন্ত কোনো গল্পের বই পড়ে আমার চোখে পানি আসেনি।

হাসান বলল, বইটা আপনি নিয়ে যান। আপনি পড়ে শেষ করার পর আমি পড়ব। প্লিজ।

নাদিয়া হাত বাড়িয়ে বই নিল। হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আপনি ঘাট ছেড়ে চলে যান। আপনি যেখানে বসে যে ভঙ্গিতে বইটা পড়ছিলেন আমি সেইভাবেই পড়ব। আপনি সর্বশেষ কোন পাতাটা পড়ছিলেন বের করে দিন। আমি পাতাটা ভাঁজ করে রাখব। দেখব এই পাতাটা পড়ার সময় চোখে পানি আসে কি না।

হাসান পাতা বের করতে করতে বলল, আপনি প্রণব বাবুকে জোনাকির ঝাঁকে জোনাকির সংখ্যা গুনতে বলেছিলেন। আমি তিনটা ঝাঁক গুনেছি। একটাতে জোনাকির সংখ্যা সতেরো, একটাতে নয়, আরেকটাতে পাঁচ।

নাদিয়া বলল, সব বেজোড় সংখ্যা? আশ্চর্য তো!

হাসান বলল, সাতরা পাখি বলে একধরনের পাখি আছে, এদের দলে সব সময় সাতটা পাখি থাকে। তার কমও না, তার বেশিও না।

নাদিয়া বলল, তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই।

এটা আমি জানতাম না। আপনার কাছে কি তাশ আছে? খেলার তাশ।

হাসান আশ্চর্য হয়ে বলল, না তো।

নাদিয়া বলল, দুই প্যাকেট তাশ জোগাড় করে রাখবেন। আমি তাশের ম্যাজিক দেখাব। এখন চলে যান।

সন্ধ্যা সাতটা।

ফরিদ পাবলিক লাইব্রেরিতে। ক্ষিতিশ বাবুর সামনের চেয়ারে বসে আছে। সে ক্ষিতিশ বাবুর জন্যে গরম সিঙ্গাড়া এবং আলুর চপ নিয়ে এসেছে। ক্ষিতিশ

বাবু অবাক হয়ে তাকালেন। ফরিদ বলল, আমার নিজের রোজগারের টাকায় কিনা। আপনি খান।

রোজগার শুরু করেছ ?

জি।

উত্তম। অতি উত্তম।

ফরিদ নিচুগলায় বলল, আপনার জন্যে একটা ধুতি কিনে এনেছি। যদি নেন খুবই খুশি হব।

ক্ষিতিশ বাবু সিঙ্গাড়া মুখে দিতে দিতে বললেন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে নিব। জবাব দিতে না পারলে ধুতি নিয়া বাড়িত যাবা। প্রশ্নটা হলো—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবের নাম কী ?

ফরিদ বলল, সিরাজউদ্দৌলা।

ক্ষিতিশ বাবু বললেন, হয় নাই। শেষ স্বাধীন নবাবের নাম মীর কাশেম।

মীর কাশেম ?

হ্যাঁ মীর কাশেম। ক্লাইভের গর্ধব মীর জাফরের পর মীর কাশেম সিংহাসনে বসেন। তিনি ইংরেজবিদ্বেষী স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন। পড়াশোনা করার এই এক লাভ। আমজনতা যেটা জানবে তার চেয়ে বেশি জানা।

ফরিদ বলল, জেলখানায় কি লাইব্রেরি আছে ?

ক্ষিতিশ বাবু চোখ সরু করে বললেন, জেলখানার লাইব্রেরির খোঁজ নিচ্ছে কেন ? জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

জি।

কী অপরাধে জেলে যাবে ?

খুনের অপরাধে।

ক্ষিতিশ বাবু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে বললেন, কাকে খুন করেছ ?

ফরিদ বলল, যাকে খুন করেছি তার নাম জানি না।

কীভাবে খুন করেছ ? গলা টিপে ?

গুলি করেছি।

কী কারণে গুলি করেছ ?

বন্দুক পরিষ্কারের সময় হঠাৎ গুলি বের হয়েছে।

কোথায় খুন করেছ ?

বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে ফরিদ বলল, কোথায় খুন করেছি আমি জানি না।

ফরিদ যে শুধু ক্ষিতিশ বাবুর জন্যে ধুতি কিনেছে তা নয়, সে তার স্ত্রীর জন্যে লালপাড় টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি কিনেছে। প্রণবের জন্যে ঘিয়া রঙের চাদর কিনেছে।

প্রণব চাদর হাতে নিয়ে বললেন, তোমার খরচের হাত খারাপ না। আজ টাকা পেয়েছ, আজই বাজারসদাই শুরু করেছ। কথায় আছে—

হাতে আসছে টাকা
এক দিনে ফাঁকা
দুই দিনে ধার
তিন দিনে গঙ্গা পাড়।

যাই হোক, চাদরটা ভালো কিনেছ। একটা চাদরের প্রয়োজনও ছিল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক। ভগবান আমার কথায় কিছু করবে না। নিজের ইচ্ছায় যদি করে।

ফরিদের স্ত্রী সফুরা শাড়ি কোলে নিয়ে বসে আছে। ফরিদ বলল, রঙ পছন্দ না হলে বদলায়ে দিবে।

সফুরা বলল, রঙ পছন্দ হয়েছে।

রঙ পছন্দ হলে মুখ বেজার কেন ?

বুঝতেছি না কেন।

ফরিদ টাকার বান্ডেল এগিয়ে দিতে দিতে বলল, এখানে দুইশ কম পাঁচ হাজার টাকা আছে। তোমার কাছে রাখো। ইচ্ছামতো খরচ কোরো।

টাকা কই পেয়েছেন ? চুরি করেছেন ?

না। রোজগার করেছি।

কী কাজ করে রোজগার করলেন ?

একটা মানুষ খুন করে টাকাটা পেয়েছি। ঘটনা আরেকদিন বলব। আজ না। এখন যাও, নয়া শাড়ি পইরা আসো। তোমারে দেখি।

আপনি মানুষ ভালো।

সব মানুষই ভালো। অতি মন্দ মানুষের মধ্যেও থাকে অতি ভালো। মন্দ এবং ভালো মিলে সমান সমান হয়। আমার কথা না। বই পড়ে শিখেছি।

কথা ঠিক না। বই পইড়া ভুল কথা শিখেছেন। একজন মন্দ মানুষের সবটাই মন্দ। একজন ভালো মানুষের সবটা ভালো। আমার দিকে তাকায়ে দেখেন। আমার সবটাই মন্দ। চেহারা শুধু সুন্দর।

যাও শাড়িটা পরে আসো। নয়ন ভইরা দেখি। বেশিদিন তোমারে দেখব না।

সফুরা উঠে গেল। অসময়ে স্নান করল। সময় নিয়ে সাজতে বসল। ফরিদ নামের অতি ভালো মানুষটার সামনে আজ সে পরী সেজে দাঁড়াবে। গুনগুন করে একটা গীতও করবে—

মন পবনের নাওয়ের মাঝি
কই তোমারে কথা
তোমারে শুনাব আমি
দুঃখ বারতা...

গীত শুনে মানুষটা চমকাবে। কারণ সফুরা যে গীত জানে মানুষটা জানে না।

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন প্রথম পড়তে আসি তখন আমার বাবা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁর উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে—এখন তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা। তোমাকে দেখার কেউ নেই। হলে একা একা থাকবে। যা তোমার করতে ইচ্ছা করে করবে। ছাত্ররাজনীতিতে জড়াবে না। আমি দরিদ্র পুলিশ ইন্সপেক্টর, আমি যেন বিপদে না পড়ি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

বাবা বললেন, তোমার বুদ্ধি ভালো, মেধা ভালো। আমি চাই তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবে। CSP হবে। কোনো একসময় আমার এলাকা তুমি পরিদর্শনে আসবে। তখন আমি তোমাকে স্যালুট দিব।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, এইগুলি কী ধরনের কথা! বাপ ছেলেকে স্যালুট করবে কোন দুঃখে ?

বাবা বললেন, এইসব তুমি বুঝবে না আয়েশা। বাপ-ছেলের কোনো বিষয় না, এটা হলো অফিসারের সঙ্গে অফিসারের বিষয়।

বাবা আমাকে চিঠি লিখতেন ইংরেজিতে। সেইসব চিঠির উত্তরও আমাকে ইংরেজিতে লিখতে হতো। যাতে CSP পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে আমার ইংরেজিটা সড়গড় হয়। তাঁকে ইংরেজিতে চিঠি লেখায় সমস্যা ছিল। তিনি প্রতিটি ভুল লালকালিতে দাগিয়ে আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন।

তিনি কঠিন পাকিস্তানভক্ত অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁর এই ভক্তি কিছুটা হলেও আমার মধ্যে ঢুকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মতো আমার কাছেও মনে হতো, লৌহমানব আয়ুব খান একজন যোগ্য শাসক। পূর্বপাকিস্তানের নেতারা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না। তাদের কারণেই দেশের শান্তি বিনষ্ট হয়। অগ্রগতি থমকে যায়।

বাবার ধারণা নেতাদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী কিছুটা ছাড় পেতে পারেন, কারণ হুজুরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি দেশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় আগেভাগে জেনে ফেলেন। পুলিশের স্পাই হিসেবে

একবার বাবাকে দীর্ঘসময় মাওলানা ভাসানীর সহযাত্রী হিসেবে ট্রেনভ্রমণ করতে হয়েছে। এই ট্রেনযাত্রাই তাঁর জন্যে কাল হলো। মাওলানা ভাসানীর জন্যে তাঁর হৃদয়ে কোমল স্থান তৈরি হলো। তিনি বলা শুরু করলেন, মাওলানা ভাসানীকে সাধারণ হিসাবে ফেলা যাবে না। তিনি অনেক বেফাঁস কথা বলবেন, সেই বেফাঁস কথাই আসল কথা।

আমি বাবার আদর্শে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লাম। সব পিতাই অন্যায়ভাবে সন্তানের মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে চান। ইঞ্জিনিয়ার পিতা পুত্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করেন। ডাক্তার পিতার ছেলে ইচ্ছা না থাকলেও ডাক্তারি পড়ে। পাশ করার পর বেজার মুখ করে রোগী দেখে। কসাইয়ের ছেলে আশা করে তার ছেলে হবে বিখ্যাত কসাই। আধঘণ্টায় গরুর চামড়া ছিলে কেটেকুটে ফেলবে।

আমি ঠিক করলাম, বাবার কিছু কথা শুনব। কিছু শুনব না। ছাত্ররাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে, এই কথাটি অবশ্যই শুনব। ছাত্ররাজনীতির নামে গুণ্ডামি আমাকে দারুণ আহত করেছিল। একটি উদাহরণ দেই। তখন শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন ড. মুশফিকুর রহমান। তাঁর টেলিফোনটি চলে গিয়েছিল NSF এর গুণ্ডা খোকার ঘরে। খোকার বক্তব্য—আপনার চেয়ে আমার টেলিফোন বেশি দরকার।

প্রভোস্ট তেলতেলা হাসি দিয়ে বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

খোকা বলল, কোনো জরুরি কল করতে হলে আমার এখানে চলে আসবেন স্যার।

অবশ্যই আসব। অবশ্যই। ধন্যবাদ।

সেই মাতাল সময়ে ছাত্রদের রাজনৈতিক বিভাজন ছিল এরকম—

ক) ছাত্র ইউনিয়ন। যারা এই দলে ধরেই নেওয়া হতো তাদের মধ্যে মেয়েলিভাব আছে। তারা পড়ুয়া টাইপ। রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরুদেব। এরা পাঞ্জাবি পরতে পছন্দ করে। গানবাজনা, মঞ্চনাটক জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকে। এদের ভাষা শুদ্ধ। নদীয়া শান্তিপুর স্টাইল। যে-কোনো বিপদআপদে দ্রুত স্থানত্যাগ করতে এরা পারদর্শী। মিছিলের সময় পালানোর সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে এরা পেছনদিকে থাকে।

এই দলটির আবার দু'টি ভাগ। মতিয়া গ্রুপ, মেনন গ্রুপ। এক দলের ওপর দিয়ে চীনের বাতাস বয়, আরেক দলের ওপর দিয়ে রাশিয়ার বাতাস বয়।

খ) ছাত্রলীগ। পড়াশোনায় মিডিওকার এবং বডি বিল্ডাররা এই দলে। এই সময়ে তাদের প্রধান কাজ এনএসএফ-এর গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সামনে তারা খানিকটা হীনমন্যতায় ভোগে। মারদাঙ্গায় এবং হলের ক্যানটিনে খাবার বাকিতে খাওয়ায় এরা বিশেষ পারদর্শী।

গ) ইসলামী ছাত্রসংঘ। মওদুদীর বই বিলিয়ে 'দীনের দাওয়াত দেওয়া' এদের অনেক কাজের একটি। পূর্বপাকিস্তানকে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করা, মসজিদভিত্তিক সংগঠন করা এদের কাজ। দল হিসেবে এরা বেশ সংঘটিত। কথাবার্তা মার্জিত। অনেকের বেশ ভালো পড়াশোনা আছে।

ঘ) এনএসএফ। প্রধান এবং একমাত্র কাজ সরকারি ছাতার নিচে থেকে গুণ্ডামি করা। সরকার এদের ওপর খুশি। কারণ এদের কারণে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

এই জাতীয় কোনো সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার প্রশ্নই আসে না। আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। বিকেলে ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে ছয় আনা খরচ করে দু'টা গরম গরম সিঙ্গারা এবং এককাপ চা খেয়ে শরিফ মিয়ার কেন্টিনের সঙ্গে লাগোয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে ঢুকে যাই। গল্প-উপন্যাস পড়ি। ঘড়ির কাঁটার দিকে খেয়াল রাখি। সন্ধ্যা মিলানো মাত্র হলে ফিরে এসেই গ্লাস হাতে হলের ডাইনিং রুমে ঢুকে যাই। প্রথম ব্যাচে খেয়ে ফেলা।

একরাতে খেতে বসেছি। আমার পাশে কালো কিন্তু সুদর্শন এক যুবক বসেছেন। প্লেটে ভাত নিয়ে অপেক্ষা করছি—বেয়ারা মাংসের বাটি (হলের ভাষায় কাপ) এনে দু'জনার সামনে রাখল। কাপে থাকবে অতি ক্ষুদ্র দুই পিস মাংস, এক পিস আলু।

আমি মাংসের বাটিতে হাত দিয়ে মাংস নিচ্ছি। আমার পাশে বসা যুবক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার তাকিয়ে থাকার অর্থ কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হলো। আমার বাটিভর্তি মাংস। ভুল করে এই যুবকের কাপ আমি টেনে নিয়েছি। এই যুবক NSF এর পাতিগুণ্ডাদের একজন। তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

আমি বললাম, ভাই ভুল করে ফেলেছি।

যুবক বললেন, অসুবিধা নাই। খান।

আমি বললাম, আপনি বেয়ারাকে বলুন। আপনার জন্যে আবার আসবে।

প্রয়োজন নাই।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

আমার নাম মনিরুজ্জামান। আমি ইতিহাসে এমএ পড়ি। আপনাকে আমি চিনি। আপনার নাম হুমায়ূন। আপনি ম্যাজিক দেখান এবং ভূত নামান, হিপনোটাইজ করেন। এইগুলা কি সত্যি পারেন?

আমি বললাম, পারি।

একদিন করে দেখাবেন?

অবশ্যই।

এই মনিরুজ্জামানের আরেক ভাইয়ের নাম আসাদুজ্জামান। তিনি আমাদের এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায়ই কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আসতেন। রসায়ন বিভাগের শিক্ষকরা তখন সমাজশাসকের ভূমিকা পালন করতেন। একটা ছেলে একজন মেয়ের সঙ্গে রসায়ন বিভাগে কথা বলবে তা হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ছিল— প্রক্টর যদি কোনো ছেলেমেয়েকে গল্প করতে দেখেন, তাহলে ফাইন করা হবে। ফাইনের পরিমাণ পাঁচ টাকা। কোনো ছেলের যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলা বিশেষ জরুরি হয়, তাহলে প্রক্টরকে তা জানাতে হবে। প্রক্টর একটা তারিখ দেবেন। সেই তারিখে প্রক্টরের উপস্থিতিতে দু'জনকে কথা বলতে হবে।

আমি যতদূর জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইন এখনো বদলানো হয়নি। যাই হোক, মনিরুজ্জামানের ভাই আসাদুজ্জামানকে প্রায়ই রসায়ন বিভাগের আশেপাশে শুকনা মুখে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। রসায়ন বিভাগের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে বেচারা অতি বিব্রত অবস্থায় ছিল। এই আসাদুজ্জামানের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে কবি শামসুর রাহমান তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আসাদের শার্ট' লেখেন। আয়ুব গেটের নাম পাল্টে নাম রাখা হয় আসাদ গেট। সেই গল্প যথাসময়ে বলা হবে।

পরিস্থিতি বৈরী হলে শামুক তার নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে যায়। আমার কাছে পরিস্থিতি বৈরী মনে হলো। চলমান উত্তপ্ত ছাত্ররাজনীতির বাইরে নিজেকে নিয়ে গেলাম। বিচিত্র এক খোলস তৈরি করলাম। সেই খোলস ম্যাজিকের খোলস, চক্র করে ভূত নামানোর খোলস। তখন হাত দেখাও শুরু করলাম। হাত দেখে গড়গড় করে নানান কথা বলি। যা বলি তাই না-কি মিলে যায়।

এক শুক্রবারের কথা। নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে যাব, আমাকে হলের বেয়ারা বলল, আপনাকে একজন ডাকে।

কে ডাকে?

অ্যাসিসটেন্ট হাউস টিউটর সাহেবের ঘরে যান। দেখলে চিনবেন।

তোমার নাম বলতে অসুবিধা কী?

অসুবিধা আছে।

অ্যাসিসটেন্ট হাউস টিউটরের ঘরে ঢুকে আমার বুকে ছোটখাটো ধাক্কার মতো লাগল। পাচপাত্তুর একজনকে নিয়ে বসে আছে। পাচপাত্তুর অতি ভদ্র গলায় বললেন, শুনেছি আপনি ভালো হাত দেখতে পারেন। হাত দেখে দিন।

পাচপাত্তুরের হাতে গোমেদ পাথরের আংটি। আমি বললাম, আপনি গোমেদ ব্যবহার করবেন না।

পাথর চিনেন?

হ্যাঁ। আপনার সামনে মহাবিপদ। মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আপনি বহুদূর যাবেন।

মহাবিপদ কবে?

সেটা বলতে পারছি না।

আমার বিয়ের বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন?

আমি বললাম, আপনার হাত দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিবাহিত।

ঠিক আছে আপনি যান। আপনার কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন। কেন্টিনে আমি বলে দিব, ফ্রি খাবেন।

আমি বললাম, তার দরকার হবে না।

ছাত্রলীগের নেতাগোছের একজন রাত দশটায় আমার ঘরে উপস্থিত। কথাবার্তা, হাভভাব খুবই উগ্র।

হুমায়ূন আপনার নাম?

জি।

ছাত্র ইউনিয়ন করেন?

জি-না।

তাহলে কী করেন?

পড়াশোনা করি।

হাত দেখে টাকা নেন?

হাত দেখি, তবে টাকা নেই না।

আমার হাত দেখে দিন।

রাত দশটার পর আমি হাত দেখি না।

কেন?

আমি বললাম, হাত দেখায় আমার যে গুরু তাঁর নাম বেনহাম। উনি রাতে হাত দেখা নিষেধ করে গেছেন।

বেনহাম কোন দেশের?

জার্মানির।

উনি আপনার গুরু হলেন কীভাবে?

তাঁর বই পড়ে হাত দেখা শিখেছি। কাজেই তিনি আমার গুরু।

আপনি মানুষকে হিপনোটাইজ করতে পারেন বলে শুনেছি। এটা কি সত্যি?

সত্যি।

আমাকে হিপনোটাইজ করুন। যদি করতে না পারেন আপনার খবর আছে।

আমি মহাবিপদে পড়লাম। হিপনোটাইজের আমি কিছুই জানি না। একজন ম্যাজিশিয়ানকে স্টেজে হিপনোটাইজ করতে দেখেছি। পুরোটাই আমার কাছে ভাওতাবাজি মনে হয়েছে। ম্যাজিশিয়ান দর্শকদের ভেতর থেকে একজনকে চেয়ারে বসালেন। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হাত দিয়ে পাস দিলেন। তারপর বললেন, এখন হাজার চেষ্টা করলেও আপনি আর চেয়ার থেকে উঠতে পারবেন না। ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করলেন, চেয়ার থেকে উঠতে পারলেন না। দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা। আমি নিশ্চিত, যাকে মঞ্চে ডাকা হয়েছে তিনি ম্যাজিশিয়ানের নিজের লোক। হিপনোটাইজ হবার ভান করেছে। ম্যাজিকের ভাষায় এদের বলে 'কনফিডারেট'।

ছাত্রলীগের পাণ্ডা আমার সামনে চেয়ারে বসা। তার চোখমুখ চোয়াল সবই শক্ত। সে খড়খড়ে গলায় বলল, কই শুরু করেন।

আমি বাধ্য হয়ে স্টেজে দেখা ম্যাজিশিয়ান যা যা করেছিলেন তা করতে শুরু করলাম। একপর্যায়ে বললাম, এখন আপনি চেয়ারের সঙ্গে আটকে গেছেন। হাজার চেষ্টা করলেও চেয়ার থেকে উঠতে পারবেন না।

জগতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, আরেকটি ঘটল। ছাত্রলীগের পাণ্ডা চেয়ার থেকে উঠতে পারে না। সে হতভম্ব। তার সঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গরা হতভম্ব। সবচেয়ে হতভম্ব আমি নিজে।

যথেষ্ট হয়েছে, এখন ঠিক করে দিন।

আমি বললাম, এখন আমি দু'বার হাততালি দিব। হাততালির শব্দ শোনার পর উঠতে পারবেন।

দু'বার হাততালি দিলাম, তারপরেও কিছু হলো না। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। বিপদ এইদিক দিয়ে আসবে তা কখনো ভাবিনি।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হবে। তার শরীর চেয়ারে বসা অবস্থায় বেঁকে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই চ্যাংদোলা করে তাকে পাঁচতলা থেকে নামানো হলো। আমাকে অপরাধী হিসেবে সঙ্গে যেতে হলো। মহসিন হলের গেটে বিরাট জটলা—এক স্যার বেঁকে গেছে।

ডাক্তাররা বললেন, যে-কোনো কারণেই হোক শরীরের কিছু কিছু মাসল শক্ত হয়ে গেছে। তাঁরা মাসল Relax করার ইনজেকশন দিলেন। আমি একমনে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলাম।

তখন জানতাম না, বইপত্র পড়ে এখন জানি—মানুষকে হিপনোটাইজ করা কঠিন কর্ম না। মানুষের মস্তিষ্কের একটা অংশ সাজেশান নেওয়ার জন্যে তৈরি থাকে। অতি প্রাচীন সময়ে বিপদসংকুল জীবনচর্যায় লিডারের প্রতি আনুগত্য বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত ছিল। আমাদের জিনে এই বিষয়টি ঢুকে গেছে। হিপনোটিস্ট লিডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর কথা মস্তিষ্ক মেনে নেয়। তিনি যখন সাবজেক্টকে ঘুমিয়ে পড়তে বলেন, সাবজেক্ট ঘুমিয়ে পড়ে। তিনি যখন সাবজেক্টকে বলেন, তুমি চেয়ারের সঙ্গে আটকে গেছ। সে আটকে যায়।

হিপনোটিজমের ঘটনায় মহসিন হলের ছাত্রমহলে আমি বিশেষ এক সমীহের স্থান দখল করলাম। ছাত্রদের প্রতিভা প্রদর্শন অনুষ্ঠানে ম্যাজিক দেখিয়ে এবং ডিআইটি ভবনে যখন টিভি কেন্দ্র ছিল সেখানে ম্যাজিক দেখিয়ে আমি ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

আমাকে এখন আর কেউ ঘাঁটায় না। আমি মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে মানুষের মাথার খুলি এনে চিকন সুতা দিয়ে আমার ঘরের এককোনায় ঝুলিয়ে দিলাম। দেয়ালের রঙ সাদা, সুতার রঙও সাদা। ব্ল্যাক আর্টের মতো তৈরি হলো। হঠাৎ দেখলে মনে হতো, মানুষের মাথার একটা খুলি শূন্যে ভাসছে। বেশ কয়েকজন এই দৃশ্য দেখে ছুটে ঘর থেকে বের হয়েছে। আর ঢোকেনি। [এক গভীর রাতে এই খুলি চাপা গলায় আমাকে ডাকল, এই ছেলে। এই। ভয়াবহ আতঙ্কে শরীর জমে গেল। পরদিনই আমি খুলি ফেরত দিয়ে এলাম। অন্য কোনো সময়ে এই গল্প বলা যাবে।]

সম্পূর্ণ নিজের ভুবনে আমি তখন সুখে আছি। মাঝে মাঝে কবিতা লেখার ব্যর্থ চেষ্টাও চলে। মিল আসে তো ছন্দ আসে না। ছন্দ এলে মিল আসে না। বাইরের অশান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি আছি আমার আপন ভুবনে।

বাইরের অশান্ত পরিস্থিতি বিষয়ে একটু বলি। অশান্তির শুরুটা পশ্চিম পাকিস্তানে। লান্ডিকোটাল নামের এক বাজারে। বেশকিছু ছাত্র সেখানে গিয়েছে (নভেম্বর, ১৯৬৮)। কী কর্ম করেছে কে জানে, তবে সেখান থেকে ফেরার পথে চোরাচালানের কিছু মালামাল নিয়ে ফিরেছে। ল্যান্ডিকোটাল চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তাদের মালামাল বাজেয়াপ্ত করে।

ছাত্ররা শুরু করে গ্রেফতার করা ছাত্রদের মুক্তির আন্দোলন। জুলফিকার আলি ভুট্টো এই সুযোগ হাতছাড়া করেন না। তিনি তাদের সঙ্গে যুক্ত হন। আয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আবদুল হামিদ নামের পলিটেকনিকের সতেরো বছরের এক ছাত্র নিহত হয়। আবদুল হামিদ আয়ুববিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহিদ।

আয়ুব খান নিরাপত্তা আইনে প্রচুর ছাত্র গ্রেফতার করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তার প্রমাণ, আয়ুব খান পেশোয়ারে পৌঁছলে ছাত্ররাই তাকে স্বাগত জানায়। তিনি বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলে হঠাৎ হাসিম উমর জাই নামের এক ছাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে সভা পণ্ড হয়ে যায়।

হাসিম উমর জাইকে গ্রেফতার করা হয়। সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে—দীর্ঘদিন জনগণকে নির্যাতনকারী অত্যাচারীকে খুন করতে না পেরে আমি দুঃখিত।

লৌহমানব আয়ুব খানের মধ্যে তখন তাম্রমানব ভাব প্রকাশিত হয়। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা শুরু করেন। জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং ওয়ালি খানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা তখন মোটামুটি শান্ত। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতার হওয়া ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবিতে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৯ নভেম্বর বায়তুল মোকাররমের সামনে একটি সভা করে। সভাপতিত্ব করেন ডাকসুর সদস্য জনাব মফিজুর রহমান। অনেকের মধ্যে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের আব্দুর রউফ।

২২ নভেম্বর পূর্বপাকিস্তানের কিছু কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি

জসিম উদ্‌দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দিন, জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার।

পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই তখন জেলে। যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, শ্রী মণি সিং, তোফাজ্জল হোসেন, শ্রী সত্যেন সেন, ছাত্র নেতা জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন।

পশ্চিম পাকিস্তানে যে আন্দোলনের সূত্রপাত পূর্বপাকিস্তানে সেই আন্দোলন শুরুতে প্রায় এককভাবেই শুরু করেন মাওলানা ভাসানী। এই অদ্ভুত মানুষটিকে নিয়ে লেখা কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না:

সফেদ পাঞ্জাবি

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহা-প্লাবনের পর নূহের গম্ভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।...

এখন গল্পাংশে ফিরে যাই। গল্পপিপাসু পাঠকরা রাজনীতির গল্প শুনতে চান না। সত্য তাঁদের আকর্ষণ করে না। তাঁদের সকল আকর্ষণ মিথ্যায়।

ছুটির দিনের এক দুপুর। বাইরে ঝাঁঝালো রোদ। দুপুরটা কীভাবে কাটাব বুঝতে পারছি না। ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না, আবার ঘরের বাইরেও যেতে

ইচ্ছা করছে না। হলের দারোয়ান এসে খবর দিল—আমার কাছে একজন ছাত্রী এসেছে। গেস্টরুমে বসে আছে।

কে আসবে আমার কাছে? শার্ট গায়ে দিয়ে চিন্তিত মুখে নিচে নামলাম। যে মেয়েটি বসে আছে তাকে চেহারায় চিনি, নামে চিনি না। আমরা একসঙ্গে ম্যাথমেটিকস সাবসিডিয়ারি ক্লাস করি। সে পড়ে ফিজিক্সে। শ্যামলা মেয়ে। তার চেহারায় এবং চোখে এমন এক আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে যে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই তাকিয়ে থাকার জন্যে কোনোরকম লজ্জাবোধও হয় না।

মেয়েটি বলল, আমরা একসঙ্গে ম্যাথ সাবসিডিয়ারি করি।

আমি বললাম, জি।

শুনেছি আপনি খুব ভালো হাত দেখেন। আমি হাত দেখাতে এসেছি।

আমি বললাম, গেস্টরুমে আমি আপনার হাত ধরে যদি হাত দেখি বিরাট সমস্যা হবে।

মেয়েটি বলল, আপনাকে আমার হাত ধরতে হবে না। আমি দুই হাতের ছাপ কাগজে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, ছাপ কীভাবে নিলেন?

মেয়েটি বলল, স্ট্যাম্পের কালি হাতে মেখে সেই কালি দিয়ে ছাপ দিয়েছি। ছাপগুলি আপনি রেখে দিন। আপনি অবসর সময়ে ধীরেসুস্থে দেখবেন। পরে আপনার কাছে শুনব। আর এই খামটা রাখুন।

খামে কী আছে?

একটা চিঠি আছে। আর কিছু না। আচ্ছা আমি যাই।

আমি খাম খুললাম। সম্বোধনহীন একটা চিঠি। সেখানে লেখা—

> আমার নাম নাদিয়া। আমি আপনার সঙ্গে ম্যাথ সাবসিডিয়ারি করি। আপনার যেমন ম্যাজিকে আগ্রহ আমারও তাই। টেলেন্ট শোতে আমি আপনার Antigravity খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি খুব মন দিয়ে আমার হাতের ছাপ পরীক্ষা করবেন। আমি শুধু একটা জিনিসই জানতে চাই। আমার পছন্দের একজন মানুষ আছেন। তাকে কি আমি বিয়ে করতে পারব?
>
> ক্লাসে শুরুর দিকে আপনি একটা লাল শার্ট পরে আসতেন। এই শার্টে আপনাকে খুব মানাত। এখন আপনাকে এই শার্ট পরতে দেখি না। হয়তো শার্টটা চুরি হয়ে গেছে,

কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে একশ'টা টাকা আছে। আপনি অবশ্যই একটা লাল শার্ট কিনবেন। আপনি যেমন নেত্রকোনার ছেলে, আমিও নেত্রকোনার মেয়ে। ধরে নিন আমি আপনার একজন বোন। বোন কি তার ভাইকে একটা শার্ট কিনে দিতে পারে না ? আমি হিন্দু মেয়ে হলে রাখি পাঠিয়ে আপনাকে ভাই বানাতাম। দিল্লির সম্রাট হুমায়ূনকে এক রাজপুত রানী রাখি পাঠিয়ে ভাই পাতিয়েছিল।

ইতি

নাদিয়া।

একশ টাকা খরচ করে আমি লাল শার্ট কিনলাম না। দামি রেডিওবন্ড কিছু কাগজ কিনলাম। এই কাগজে কবিতা লেখা হবে। একটা ফাউনটেন পেন কিনলাম। কবিতা ভালো কলমে লেখা হবে। আমার জীবনের প্রথম কবিতা নাদিয়ার দেওয়া টাকায় কেনা কলমে লেখা হয়েছে। আমার রচনার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা এই কবিতাটির সঙ্গেও পরিচিত।

দিতে পারো একশ ফানুস এনে
আজন্ম সলজ্জ সাধ
একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই॥

হাবীব খানের বাড়িতে মাওলানা এসেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জামে মসজিদের পেশ ইমাম। নাম মাওলানা তাজ কাশেমপুরী। জনশ্রুতি আছে, তিনি একটি জ্বিন পালেন। জ্বিনের নাম খামজা। জ্বিনের মাধ্যমে তিনি জ্বিনের দেশ থেকে গাছগাছড়ার ওষুধ এনে চিকিৎসা করেন। খামজার সঙ্গে না-কি জ্বিনের বাদশার সখ্য আছে। জ্বিনের বাদশা তার প্রিয় একজনকে মানুষের হাতে বন্দি দেখে ক্ষুব্ধ। মাওলানা তাজ কাশেমপুরী কঠিন লোক বলেই এখনো কিছু করে উঠতে পারছে না। তবে যে-কোনো সময় অঘটন ঘটবে। মাওলানা তাজ কাশেমপুরী অত্যন্ত সাবধানে জীবনযাপন করেন। পুকুরে বা নদীতে গোসল করেন না। মানুষকে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে মারতে জ্বিনরা না-কি পারদর্শী। তিনি তোলা পানিতে গোসল করেন। গলায় একটা তাবিজ পরেন। তাবিজটা আল্লাহর এক অলি স্বপ্নে তাঁকে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করে তিনি ঘুমুতে গেছেন, তখন স্বপ্নে দেখেন সাদা আলখাল্লা পরা এক সুফী দরবেশ তাঁকে বলছেন, তাজ! জ্বিনের বাদশার হাত থেকে সাবধান। একটা তাবিজ তোকে দিলাম। সবসময় গলায় পরে থাকবি। না হলে মহাবিপদ। মাওলানা তাজের ঘুম ভাঙল। তিনি দেখেন, তাঁর হাতের মুঠিতে রুপার এক তাবিজ। সেই থেকে তিনি তাবিজ গলায় পরছেন।

মাওলানাকে আনা হয়েছে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে ফুঁ দেওয়ার জন্যে। সিঁড়ির শেষ ধাপে অনেকবার হাবীবের পা পিছলিয়েছে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটেনি। তাঁর ধারণা সিঁড়ির এই ধাপে দোষ আছে। দোষ কাটানোর ব্যবস্থা।

মাওলানা তাজ কাশেমপুরী সিঁড়িতে ফুঁ দিলেন। একটা তাবিজ সিঁড়ির রেলিং-এ বেঁধে সিঁড়ি বন্ধন দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'দোষী' জিনিসটা থাকে পুকুরঘাটে। সেখান থেকে উড়ে আসে। জিনিসটা যথেষ্ট শক্তিধর। তাকে পুকুরঘাট থেকে বিদায় করা যাবে না। তবে সে যেন মূলবাড়িতে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করে দিচ্ছেন। তবে বাড়ির মেয়েদের চুলখোলা অবস্থায় এবং

হয়েজ-নেফাজ চলাকালে পুকুরঘাটে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। খারাপ জিনিস মেয়েদের খোলা চুলের মুঠি ধরে বাড়িতে ঢোকে।

নাদিয়া বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মাওলানার কথা শুনছিল। সে বিরক্ত গলায় বলল, খারাপ জিনিস বলতে কী বোঝাচ্ছেন ?

মাওলানা বললেন, এটা একটা হাওয়া। খারাপ হাওয়া।

এর জীবন আছে ?

অবশ্যই আছে। তবে তাদের জীবন এবং মানুষের জীবন একরকম না। মানুষ খাদ্যগ্রহণ করে, এরা খাদ্যগ্রহণ করে না।

নাদিয়া বলল, যার জীবন আছে তার মৃত্যুও আছে। এরা কি মারা যায় ?

হাবীব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, মা, চুপ কর তো। সব বিষয় নিয়ে কথা বলা ঠিক না।

নাদিয়া বলল, একটা খারাপ জিনিস আমাদের পুকুরঘাটে বসে থাকবে, আর তার বিষয়ে জানতে চাইব না—এটা কেমন কথা! আমি এখনই এলোচুলে একা পুকুরঘাটে যাব। কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে বসে থাকব। তারপর ঘরে ফিরব। খারাপ জিনিসটা আমার চুলের মুঠি ধরে ঘরে ঢুকবে। তখন তাকে আমি শায়েস্তা করব।

হাবীব বললেন, কীভাবে শায়েস্তা করবি ?

নাদিয়া বলল, আমি কানে ধরে তাকে উঠবোস করাব।

হাবীব গম্ভীর হয়ে রইলেন। প্রণব শব্দ করে হেসে ফেলে চারদিকের পরিস্থিতি দেখে হাসি সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। হাবীব বললেন, মা, ঘরে যা।

নাদিয়া বলল, আমি ঘরে যাব না। আমি পুকুরঘাটে যাব।

সে সত্যি সত্যি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল। হাবীবের মনে হলো মেয়েকে কঠিন ধমক দেওয়া প্রয়োজন। ধমক দিতে পারলেন না। বাইরের একজন মানুষ আছে। তাছাড়া মেয়েটার সাহস দেখে তার ভালো লাগছে।

মাওলানা তাজ বললেন, উচ্চশিক্ষার কিছু কুফল আছে জনাব। প্রধান কুফল মুরুব্বিদের অবাধ্য হওয়া। ধর্মশিক্ষা না হলে এটা হয়।

হাবীব বললেন, আমার মেয়ের ধর্মশিক্ষা আছে। তাকে মুনশি রেখে কোরানপাঠ শিখানো হয়েছে। প্রতি রমজান মাসে সে কোরান খতম দেয়।

মাওলানা বললেন, আপনার মেয়ে সত্যি সত্যি পুকুরঘাটে গিয়েছে, এটা চিন্তার বিষয়। আমি একটা তাবিজ পাঠায়ে দিব। চেষ্টা নিবেন যেন তাবিজটা

পরে। আমার কেন জানি মনে উঠছে, আপনের মেয়ের উপর খারাপ বাতাসের নজর আছে। লক্ষণ বিচারে সেরকম পাই।

হাবীব বললেন, তাবিজ পাঠিয়ে দিবেন। আমি ব্যবস্থা করব যেন সে পরে।

সময় সন্ধ্যামাখা বিকাল। নাদিয়া ঘাটে, পানিতে পা ডুবিয়ে বসেছে। পুকুরভর্তি শাপলা ফুল। ফুল রাতে ফোটে। দুপুরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

নাদিয়া মাথার বাঁধা চুল খুলে দিতে দিতে মনে মনে বলল, আয় খারাপ বাতাস আয়। আমার চুল ধরে ঝুলে পড়। তোকে আমি নিজের ঘরে নিয়ে পুষব।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ নাদিয়া দেখল, শাপলা ফুলের ঝাঁকের মধ্যে একটি ডুবন্ত মেয়ের মুখ। মেয়েটির চোখ খোলা। সে পানির ভেতর থেকে নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

নাদিয়া বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে ঘাটে পড়ে গেল। বাড়ির প্রায় সবাই ছুটে এল। সবার আগে উপস্থিত হলেন প্রণব। তিনি অজ্ঞান নাদিয়াকে কোলে তুলে নিলেন।

হাবীব বললেন, কী সর্বনাশ! মাওলানা সাহেবকে আবার খবর দাও। ডাক্তার ডাকো।

নাদিয়ার জ্ঞান ফিরল এক ঘণ্টা পর। ততক্ষণে বাড়িতে কোরান পাঠ শুরু হয়েছে। মাদ্রাসার একদল তালেবুল এলেম এসে দোয়া ইউনুস খতম দিচ্ছে। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার এই দোয়া পাঠ করা হবে।

হাবীব শম্ভুগঞ্জ থেকে ভাইপীরকে আনতে লোক পাঠালেন। যত রাতই হোক ভাইপীর যেন উপস্থিত হন। হাবীব একটা গরু সদগার ব্যবস্থা করলেন।

নাদিয়ার মা জায়নামাজে বসলেন। মেয়ের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত তিনি জায়নামাজ ছেড়ে উঠবেন না।

নাদিয়ার জ্ঞান ফিরল রাত আটটা পঁচিশ মিনিটে। সে বাবার একটা হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। সে থরথর করে কাঁপছে। হাবীব বললেন, মা, আর কোনো ভয় নাই। ভাইপীর সাহেব চলে এসেছেন। তিনি এখনো দোয়াতে আছেন।

নাদিয়া বলল, বাবা, আমি ভয় পেয়েছি। আমি খুব ভয় পেয়েছি।

হাবীব বললেন, আর ভয় নাই মা। আমার সারা দুনিয়া একদিকে আর তুমি একদিকে। কেন ভয় পেয়েছ বলতে চাও? বলতে না চাইলে বলতে হবে না।

নাদিয়া বলল, বাবা, দিঘির পানির নিচ থেকে একটা মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়েটা মৃত না বাবা, জীবিত। মেয়েটা চোখের পাতা ফেলছিল। মেয়েটা খুব সুন্দর। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মতো।

থাক, আর বলার দরকার নাই। তোমার মা আজ সারা রাত তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে।

হাজেরা বিবি তখন থেকে 'ও হাবুরে, ও হাবুরে' বলে চিৎকার করছেন। তাঁর কাছে কেউ নেই। সবাই নাদিয়াকে ঘিরে আছে। তাঁর চিৎকার সবাই শুনেও শুনছে না।

হাবীব মায়ের ঘরে ঢুকলেন। হাজেরা বিবি বললেন, শুনলাম তোর মেয়ে না-কি মারা গেছে?

হাবীব বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন কু ডাক ডাকো? নাদিয়া মারা যাবে কেন? সে ভালো আছে, সুস্থ আছে। একা পুকুরঘাটে গিয়েছিল। সেখানে কী দেখে যেন ভয় পেয়েছে।

কী দেখছে?

কী দেখেছে সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নাই মা।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বল কী দেখছে?

হাবীব বললেন, সে দেখেছে দিঘির পানির নিচে একটা মেয়ে। নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

হাজেরা বিবি বললেন, এক্ষণ দিঘিতে জাল ফেলার ব্যবস্থা কর।

জাল ফেলতে হবে কেন?

হাজেরা বিবি বললেন, কোনো এক মাইয়ারে খুন কইরা দিঘির পানিতে ফেলছে। নাদিয়া দেখছে মরা লাশ। জাল ফেলার ব্যবস্থা কর।

হাবীব মা'র ঘর থেকে বের হলেন। থানায় খবর দিলেন। জাল ফেলার সময় পুলিশের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে।

রাত দশটায় জেলেরা পুকুরে জাল ফেলল। ঘাটে চারটা হ্যাজাক লাইট জ্বলছে। থানার ওসি সাহেব এবং সেকেন্ড অফিসার এসেছেন। তাদের জন্যে ঘাটের কাছে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। তারা অন্ধকারে বসেছেন। সন্ধ্যার পর ওসি সাহেবের সামান্য পানের অভ্যাস আছে। তাঁর জন্যে ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুম থেকে জিনিস এসেছে। জিনিসের সঙ্গে চিকেন কাটলেট এসেছে। (সে সময় রেলের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বিয়ার, ভদকা এবং হুইস্কি

পাওয়া যেত।) প্রণব তাদের দেখাশোনা করছেন। ওসি সাহেব বললেন, হাবীব ভাইয়ের ব্যবস্থা নিখুঁত। সবদিকে তাঁর নজর—এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এই ধরনের মানুষ দেশের লিডার হলে দেশ পাল্টে যেত।

প্রণব বললেন, রাতে কিন্তু স্যার খাওয়াদাওয়া করে তারপর যাবেন। খাসি জবেহ করা হয়েছে। হাজি নূর মিয়া বাবুর্চি চলে এসেছে।

ওসি সাহেব বললেন, তার কোনো প্রয়োজন নাই। যা ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তারচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

প্রণব বললেন, স্যার প্রয়োজন আছে। খাওয়াদাওয়ার পর স্যার আপনাকে বিশেষ কিছু কথা বলবেন। জরুরি কথা।

হাবীব ভাই কোথায়? তাঁকে দেখছি না তো।

প্রণব বললেন, গভর্নর সাহেব ঢাকা থেকে টেলিফোন করেছেন নাদিয়ার খোঁজ নিতে। এই নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

ওসি সাহেব থতমত খেয়ে বললেন, অবশ্যই। অবশ্যই।

পুকুরে জাল ফেলে কিছুই পাওয়া গেল না। দু'টা বিশাল সাইজের কাতল মাছ ধরা পড়ল। গায়ে শ্যাওলা পড়া কাতল। প্রণবের নির্দেশে একটা মাছ ওসি সাহেবের বাসায়, একটা মাছ সেকেন্ড অফিসারের বাসায় চলে গেল।

সেকেন্ড অফিসার ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, জমিদারি আইনের সময় এমন মেহমানদারি দেখেছি, তার পরে দেখি নাই।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে। হাবীব ওসি এবং সেকেন্ড অফিসারকে নিয়ে চেম্বারে বসেছেন। প্রণব নিজেও উপস্থিত আছেন। হাবীব বললেন, খানা কি মনমতো হয়েছে ওসি সাহেব?

ওসি আখলাকুর রহমান বললেন, গত দশ বছরে এমন খানা খাই নাই। পেট ফেটে মারা যাওয়ার অবস্থা। হজমি বড়ি খাওয়া লাগবে। এখন হাবীব ভাই বলেন, আপনার জন্য কী করব?

আমার জন্য কিছু করা লাগবে না। আপনাদের সামান্য সাহায্য করতে চাই। কইতরবাড়িতে যে খুন হয়েছে, সেই খুনের আসামিকে আমি খবর দিয়ে এনেছি। ফরিদ নাম। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

আখলাকুর রহমান প্রণবের দেওয়া পান মুখে দিয়ে সরু চোখে তাকালেন। হাবীব বললেন, প্রণব, ওসি সাহেবকে ঘটনা খুলে বলো। বাড়িতে এত ঝামেলা!

পরিষ্কার করে কিছু চিন্তাও করতে পারছি না। বলতেও পারছি না। দুনিয়ার কথা বলার দরকার নাই। সারসংক্ষেপ বলো।

প্রণবের মুখভর্তি পান। তিনি চিলুমচিতে মুখের পান ফেলে দিয়ে বললেন, ফরিদ ছিল হাসান রাজা চৌধুরীর খাস কামলা। উনার কাপড় ধোয়া, হাত-পা টিপে দেওয়া, গোসল দেওয়া সব দায়িত্ব তার। হাসান তাকে নিয়ে পাখি শিকারে যাবেন। বন্দুক পরিষ্কার করতে বললেন। বন্দুক পরিষ্কারের সময় দুর্ঘটনা। আচমকা গুলি বের হয়ে গেল। কাছেই হাসানের মামা ফজরের নামাজে বসেছিলেন। এক গুলিতে শেষ। স্যার, ফরিদকে নিয়ে আসি?

নিয়ে আসুন।

ফরিদ ঘরে ঢুকে জড়সড় হয়ে রইল। তার মাথায় টুপি। পরনে পাঞ্জাবি, হাতে তসবি। সে এতক্ষণ তালেবুল এলেমদের সঙ্গে দোয়া ইউনুস খতম দিচ্ছিল।

আখলাকুর রহমান বললেন, তুমি হাসান সাহেবের খাস লোক?

জি স্যার।

শিকারে যাওয়ার আগে কি উনার বন্দুক আগেও পরিষ্কার করেছ?

জি স্যার।

সেফটি ক্যাচ কাকে বলে?

ফরিদ হতাশ চোখে একবার হাবীবের দিকে আরেকবার প্রণবের দিকে তাকাল।

সেফটি ক্যাচ কী জানো না?

জি-না।

পাখি শিকারের জন্যে ছররা গুলি ব্যবহার হয়। ফায়ার করলে একসঙ্গে অনেক ছোট ছোট গুলি বের হয়। এতে পাখি মরে। মানুষের গায়ে লাগলে মানুষ জখম হয়। মরে না। সেদিন বন্দুকে ছররা গুলির বদলে বুলেট ছিল কী জন্যে?

স্যার, আমি জানি না।

বন্দুকে ট্রিগার থাকে। ট্রিগার চাপলে গুলি বের হয়, এটা তো জানো?

জি স্যার।

তোমার হাসান স্যারের বন্দুকে ট্রিগার কয়টা?

জানি না স্যার।

মোহনভোগ বলে একটা মিষ্টি আছে। মিষ্টিটা কী?

হালুয়া স্যার।

এই হালুয়াকে অল্প আঁচে অনেকক্ষণ জ্বাল দিলে হালুয়ার রস কমে যায়। হালুয়া টাইট হয়। থানায় নিয়ে আমরা প্রথম যে কাজ করি, রস কমিয়ে হালুয়া টাইট করি। তুমি বন্দুক জীবনে কোনোদিনও দেখো নাই। আর বলছ বন্দুক দিয়ে গুলি করে মানুষ মেরেছ? অপরাধ করেছে অন্য একজন। দোষ নিজের কাঁধে নিচ্ছ। ঘটনা তো এইটা?

ফরিদ হতাশ চোখে হাবীবের দিকে তাকাল।

হাবীব বললেন, ওসি সাহেব ঠিকই ধরেছেন। এইটাই ঘটনা।

আখলাকুর রহমান বললেন, আপনার মতো অতি বুদ্ধিমান লোক এত বড় ভুল করে! আসামি শিখিয়ে পড়িয়ে নিবেন না?

হাবীব বললেন, ওসি সাহেব, শিখানোর জন্যে দায়িত্ব আপনার। আপনি শিখিয়ে নিবেন। আপনাদের জন্যে ভালো নজরানার ব্যবস্থা করা আছে। প্রণব! নজরানার পরিমাণ ওসি সাহেবকে কানে কানে বলো। উনার দিলখোশ হবে।

প্রণবের কথা শুনে ওসি সাহেবের দিলখোশ হলো না। তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বললেন, হাবীব ভাই, আপনি হয়তো জানেন না আমি জুমনপুরের পীরসাহেবের মুরিদ হয়েছি। এইসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি। পীর বাবার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, বাকিজীবন দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করব। এর অন্যথা হবে না।

হাবীব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এটা অত্যন্ত ভালো খবর। এরকম অফিসারই আমাদের দরকার। সেকেন্ড অফিসার সাহেব কী বলেন?

সেকেন্ড অফিসার শুকনামুখে বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

হাবীব বললেন, যেহেতু পীরসাহেবের মুরিদ হয়েছেন, আপনার উচিত কোনো নির্জন জায়গায় বসে আল্লাখোদার নাম নেওয়া। গর্ভনর সাহেবকে বলে কাল-পরশুর মধ্যে আপনাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেই। নির্জন পরিবেশ পাবেন। আল্লাখোদার নাম নিবেন। চিল্লায় চলে যাবেন।

আখলাকুর রহমান ছোটখাটো ধাক্কার মতো খেলেন। হাবীব বললেন, আপনি মদ্যপান বেশি করেছেন বলে কার সঙ্গে কী কথা বলছেন হিসাব নাই। এইজন্যেই আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন, 'মদ এবং জুয়া উভয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ উপকার আছে। তবে উপকারের চেয়ে অপকার অধিক। ইহার পরেও কি তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত হবে না?' ওসি সাহেব! আপনি তো জুয়াও খেলেন, তাই না? সালাহউদ্দিনের বজরায় জুয়ার আড্ডা বসে। নটিবাড়ির অল্পবয়স্ক একটা নটি

মেয়েকে মাঝেমধ্যে বজরায় নিয়ে যান। মেয়েটার নাম রানী। তাকে আপনি একটা সোনার চেইন বানিয়ে দিয়েছেন। চেইনটা কেনা হয়েছে সুবল স্বর্ণকারের দোকান থেকে। ঠিক বলছি? না-কি কোনো ভুলত্রুটি করলাম?

আখলাকের নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। তার চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। হাবীব বললেন, আমি বলেছিলাম রানী মেয়েটার সঙ্গে আপনার কিছু ঘনিষ্ঠ ছবির ব্যবস্থা করে দিতে। কিছু ছবি তারা পাঠিয়েছে। ছবি ভালো আসে নাই। আপনার চেহারা বোঝা যায়, কিন্তু রানী মেয়েটার চেহারা স্পষ্ট আসে নাই। প্রণব, ওসি সাহেবরে ছবি তিনটা দেখাও।

প্রণব দ্রুত আদেশ পালন করল।

হাবীব বললেন, ওসি সাহেব কিছু বলবেন? রানী মেয়েটাকে দিয়ে আমি একটা মামলা করতে পারি, অপহরণ এবং ধর্ষণ মামলা। দশ বছরের জন্যে জেলে চলে যাবেন। আপনার সুবিধা হবে, জুমনপুরের পীরসাহেবের তরিকায় চলার সুযোগ পাবেন।

আখলাকুর রহমান বিড়বিড় করে বললেন, আমি আপনাকে বড়ভাইয়ের মতো দেখি। এখানে আপনি আমার মুরুব্বি। ছোটভাইয়ের ভুলত্রুটি বড়ভাই যদি ক্ষমা না করে, কে করবে?

হাবীব বললেন, নজরানা যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা কি ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে। অবশ্যই।

হাবীব বললেন, আসামি দিচ্ছি, আসামি নিয়ে যান। তাকে ভালোমতো শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন। হাসান রাজা চৌধুরী এবং তার পরিবারের যেন কোনো ঝামেলা না হয়।

আপনি যেভাবে বলবেন ঠিক সেই মতো কার্য সম্পন্ন হবে। আমার পীর সাবের দোহাই।

আখলাকুর রহমান আসামি নিয়ে চলে গেছেন। ঘরে প্রণব এবং হাবীব। পাংখাপুলার রশিদ পাংখা টানছে। যদিও পাংখার প্রয়োজন নাই। আবহাওয়া শীতল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া আসছে।

প্রণব বললেন, জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। সাধারণ নুন না। সৈন্ধব লবণ।

হাবীব বললেন, লবণ এখনো পড়ে নাই। লবণ পড়বে চার-পাঁচ দিনের ভিতরে। যখন তারে বদলি করা হবে রামু থানায় কিংবা খাগড়াছড়িতে।

প্রণব বললেন, এখন তাকে বদলি করলে তো আমাদের সমস্যা।

হাবীব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আমাদের কোনো সমস্যা নাই। ওসি আমার কাছে ছুটে আসবে তদবিরে। আমি তদবির করে বদলি বন্ধ করব। ওসি আমার কাছে বাকিজীবনের জন্যে বান্ধা থাকবে। এখন বুঝেছ?

জলের মতো পরিষ্কার বুঝেছি।

মেয়েছেলের কান্না শুনছি। কে কাঁদে?

ফরিদের বউ।

অল্পদিনেই দেখি স্বামীর প্রতি তার বিরাট দরদ হয়েছে।

প্রণব বললেন, তা হয়েছে।

হাবীব বললেন, হাসান রাজা চৌধুরীকে বলবে আমার বাড়িতে থাকার তার আর প্রয়োজন নাই। সে এখন নিশ্চিন্ত মনে তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে।

জি বলব। আপনার সঙ্গে ছোট্ট একটা কথা ছিল।

বলো। তোমার কোনো কথাই তো ছোট না। ডালপালায় বিশাল বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষের যেমন ঝুড়ি নামে তোমার কথারও তেমন ঝুড়ি নামে। বলো কী কথা?

প্রণব বললেন, নাদিয়া মামণির এক শিক্ষক এসেছেন ঢাকা থেকে। নাদিয়া মামণির সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে অতিথঘরে থাকতে দিয়েছি। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বাড়িতে এত ঝামেলা, এইজন্যে আপনাকে কিছু জানাই নাই।

হাবীব বললেন, না জানিয়ে ভালো করেছ। এখন না জানিয়ে সকালে জানালে আরও ভালো হতো।

হাবীব উঠে পড়লেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তালেবুল এলেমরা নিচুগলায় দোয়াপাঠ করেই যাচ্ছে। এদের গলা ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে ফরিদের স্ত্রীর কান্না।

নাদিয়াকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। লাইলী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। ঘরে হারিকেন জ্বালানো। জ্বলন্ত অগ্নির কাছে খারাপ কিছু আসতে পারে না। খাটের নিচে একটা মালশায় সরিষা এবং একগোছা চাবি রাখা হয়েছে। নাদিয়ার গলায় তিনটা ভারী তাবিজ। দু'টা দিয়েছেন শম্ভুগঞ্জের পীরসাহেব। একটা মওলানা তাজ কাশেমপুরী। নাদিয়ার ঘরে দু'জন কাজের মেয়ে। তারা ঘোমটা দিয়ে জায়নামাজে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিঃশব্দে কোরান পাঠ করছে।

হাজেরা বিবির মাথা আজ মনে হয় একেবারেই ঠিক নেই। তিনি সুর করে মাতম করছেন—আমার নাতনি মারা গেছে গো! কেউ আমারে খবর দিল না গো!

নাতনির মরামুখ আমারে কেউ দেখাইলো না গো! আমি তার শাদি দেখলাম না গো!

রাত তিনটায় নাদিয়ার ঘুম ভাঙল। সে চাপা গলায় ডাকল, মা!

লাইলী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই যে আমি।

নাদিয়া বলল, পুকুরের পানির নিচে আমি যে মেয়েটাকে দেখেছি সে কাঁদছে। আমি তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ মা?

লাইলী বললেন, পাচ্ছি। কাঁদছে ফরিদের পোয়াতি বউটা।

কেন কাঁদছে?

লাইলী বললেন, এরা গরিব দুঃখী মানুষ। এদের নানান কষ্ট। কোন কষ্টে কাঁদে কে জানে!

একটু খোঁজ নিবে মা?

সকালে খোঁজ নিব। এখন তোকে ছেড়ে যাব না।

নাদিয়া বলল, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি মা। স্বপ্নটা বলি?

দিনের বেলা বলিস। রাতে স্বপ্ন বলতে নাই।

কিচ্ছু হবে না মা। শোনো। আমি স্বপ্নে দেখি পানিতে বিরাট বড় একটা ডেগ। আমি সেই ডেগের ভেতর বসে আছি। ডেগটা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি ডেগের ভেতর থেকে মাথা বের করছি। তখন দেখি চারদিকে পানি। সমুদ্রের মতো, কিন্তু কোনো ঢেউ নেই। বাতাসও নেই। তারপরেও ডেগটা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, কিন্তু আমার একটুও ভয় লাগছে না।

লাইলী বললেন, ভালো কোনো তফসিরকারীর কাছে স্বপ্নটা বলে পাঠাব। উনি তফসির করবেন।

আমার যে স্যারের কথা তোমাকে বলেছি উনি যে-কোনো স্বপ্নের লৌকিক ব্যাখ্যা করতে পারেন।

তোর ওই হিন্দু স্যার?

হুঁ। উনার অনেক বুদ্ধি। ছাত্রদের কাছে স্যারের অনেকগুলি নাম আছে। একটা নাম হলো মালাউন শার্লক হোমস।

স্যারের কথা থাকুক মা। তুই আরাম করে ঘুমা। আমি সারা রাত তোর মাথায় বিলি করে দেব। এক গ্লাস গরম দুধ খাবি?

খাব। মা, আমার দাদির সঙ্গে ঘুমাতে ইচ্ছা করছে।

লাইলী বললেন, তুই এইখানেই ঘুমাবি।

হাবীব নাদিয়ার স্যারের সঙ্গে বসেছেন। মেহমানদের সঙ্গে তিনি বাংলাঘরে বসেন। মামলা-মোকদ্দমার লোকজনের সঙ্গে চেম্বারে।

জনাব, আমার নাম বিদ্যুত কান্তি দে।

হাবীব বললেন, আপনার নাম আমি আমার কন্যার কাছ থেকে শুনেছি। সে আপনার কাছ থেকে কী একটা ম্যাজিকও যেন শিখেছে। রাতে আপনার থাকার কি কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

না।

খাওয়াদাওয়ায় কোনো তকলিফ কি হয়েছে ? আমার মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে নিয়ে ব্যস্ততা গেছে।

এখন সে কেমন ?

সে ভালো আছে।

তার সঙ্গে একটু দেখা করব।

হাবীব বললেন, আমাদের এই বাড়ি একটা প্রাচীন বাড়ি। প্রাচীন বাড়ির প্রাচীন নিয়মকানুন। অনাত্মীয় পুরুষমানুষের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ। নাদিয়ার শরীরের এখনো এমন অবস্থা না যে সে বাইরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আপনার স্কলারশিপের কী যেন সমস্যার কথা নাদিয়া বলেছিল। কাগজপত্রগুলি যদি রেখে যান, তাহলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।

বিদ্যুত কান্তি দে বললেন, স্কলারশিপের সমস্যা সমাধানের চেয়ে নাদিয়ার সঙ্গে দেখা করা এখন আমার অনেক জরুরি।

হাবীবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি তাঁর সামনে বসা যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যুবকের কথাবার্তার মধ্যে উদ্ধত ভঙ্গি আছে। তবে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছেলে। আত্মবিশ্বাস চোখের তারায় ঝলমল করছে। হিন্দুদের চোখেমুখে একধরনের কাঁচুমাচু নিরামিষ ভাব থাকে, এর মধ্যে তা নেই। হাবীব বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরি কেন ?

বিদ্যুত বললেন, এন্টিগ্র্যাভিটি একটা ম্যাজিক শেখার তার খুবই শখ ছিল। ম্যাজিকের আইটেমটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। যেহেতু তার শরীরটা খারাপ, ম্যাজিকটা শিখলে ভালো লাগবে।

হাবীব বললেন, আপনি জিনিসটা রেখে যান, আমি মেয়ের কাছে পৌঁছে দেব।

ম্যাজিকটা কীভাবে দেখাতে হবে সেটা তো তাকে বলতে হবে।

আপনি কাগজে লিখে দিয়ে যান। তাতে হবে না ?

হ্যাঁ হবে। আচ্ছা আমি আজ ছ'টা পর্যন্ত যদি আপনার বাড়িতে থাকি, তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে?

কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় আপনি কি আমাকে দশ মিনিট সময় দেবেন? তখন ম্যাজিকের বোতলটা আপনার হাতে বুঝিয়ে দেব।

হাবীব বললেন, ঠিক আছে। সন্ধ্যা ছ'টায় আমি চেম্বারে উপস্থিত থাকব। একসঙ্গে চা খাব।

বিদ্যুত বলল, আমার ছোট্ট আর্জি—আমরা চা-টা খাব দিঘিরঘাটে। বিশেষ একটি কারণে দিঘিরঘাটে উপস্থিত থাকতে বলছি। যদি আপনার তেমন কোনো সমস্যা না হয়।

হাবীব কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ছ'টা বাজে। সূর্য ডুবিডুবি করছে। হাবীব দিঘিরঘাটে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রণব আছেন। রশিদ এসেছে ট্রেতে করে চা নিয়ে। বিদ্যুত হাবীবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি ঘাটের ঠিক এই জায়গাটায় বসবেন? আপনার মেয়ে সন্ধ্যা ছ'টার দিকে এখানে বসে ভয় পেয়েছিল। কষ্ট করে বসুন। প্লিজ।

হাবীব বসলেন।

বিদ্যুত বললেন, এখন আপনি ডানদিকে তাকান। শেষ সূর্যের আলো আপনার গায়ে পড়েছে। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়েছে দিঘিতে। আপনার কি মনে হচ্ছে—দিঘির পানির ভেতর আপনি নিজেকে দেখছেন?

হুঁ।

নাদিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে। সে ভয় পেয়েছে পানিতে নিজের ছায়া দেখে। যে-কোনো কারণেই হোক, সে আগে থেকেই ভয়ে অস্থির ছিল। দিঘির পানিতে নিজেকে দেখে সেই ভয় তুঙ্গস্পর্শী হয়েছে।

হাবীব চুপ করে রইলেন।

বিদ্যুত বললেন, সে নিজেকে চিনতে পারেনি, তার কারণ আছে। শেষ বিকেলের আলো হয় গাঢ় হলুদ থেকে লাল। অর্থাৎ Longer wave length এর আলো। নাদিয়ার গায়ের রঙ শ্যামলা। সে দেখেছে প্রায় হলুদ রঙের এক তরুণীকে।

প্রণব বললেন, আপনার বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়েছি। বিশেষভাবে চমৎকৃত হয়েছি। স্যার কী বলেন? || মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

হাবীব বললেন, এমন জটিল একটি বিষয়ে এত সহজ ব্যাখ্যা চিন্তা করি নাই।

বিদ্যুত বললেন, আমরা প্রকৃতিকে অতি রহস্যময় কিছু ভেবে দূরে সরিয়ে রাখি। প্রকৃতি কিন্তু মোটেই রহস্যময় না। প্রকৃতি বিশাল একটা সরল অংকের মতো। যার উত্তর আমাদের জানা। হয় শূন্য আর নয় ১, এর বাইরে না। আমরা দিঘিরঘাটে বসে একটা সরল অংক কষেছি। উত্তর পেয়েছি শূন্য। অর্থাৎ ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।

প্রণব বললেন, ঘাটে ভূত না থাকলেও এই বাগানে অবশ্যই আছে। একটা ঘটনা বলি—শীতের সময়, কার্তিক মাস, বাগানের দু'টা খেজুরগাছ কাটানো হবে। গাছি খবর দিয়েছি...

হাবীব প্রণবকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই গল্প এখন থাকুক।

বিদ্যুত বললেন, এই খামটা আপনি রাখুন। নাদিয়াকে পৌঁছে দেবেন। এন্টিগ্র্যাভিটি ম্যাজিকের কৌশলটা এখানে লেখা আছে। আমি চা খেয়েই ঢাকার দিকে রওনা হব।

হাবীব মেয়েকে চিঠি দেওয়ার আগে খাম খুলে নিজে পড়লেন। কাজটা যে অন্যায় তাও না। মেয়ে বড় হলে তার ওপর নজর রাখতে হয়। সন্তানের প্রতি অনেক কর্তব্যের মতো এটাও কর্তব্য। যারা কর্তব্য পালনে ভুল করে তারাই বিপদে পড়ে। হাবীব মন দিয়ে চিঠি পড়লেন। দু'বার পড়লেন। সাধারণ চিঠি, তারপরেও সাংকেতিক কিছু থাকতে পারে।

> নাদিয়া,
>
> তুমি অসুস্থ বলে তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। অসুস্থতার মূল কারণ ধরে দিয়েছি, কাজেই তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে বলে আমার ধারণা।
>
> তোমার অতি পছন্দের এন্টিগ্র্যাভিটি বটলের ম্যাজিকের কৌশলটা শোনো। বাদামি রঙের একটা কাচের বোতল এবং দড়ি দিয়ে যাচ্ছি। বোতলের মুখের ব্যাস দড়ির মুখের ব্যাসের চেয়ে বড়। কাজেই দড়ির মাথা কামড়ে ধরে বোতল শূন্যে ঝুলতে পারবে না। গ্র্যাভিটির কারণে পড়ে যাবে। বোতলের ভেতর কর্কের একটা গোল বল আছে। ম্যাজিকের মূল কৌশল ওই গোল বলে। ম্যাজিশিয়ান হিসেবে তোমার কাজ

হলো কোনোভাবে দড়ি এবং বোতলের মুখের মাঝখানে কর্কটা নিয়ে আসা।

তাহলেই কার্য সিদ্ধি হবে। বোতল মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কলা দেখিয়ে দড়ির মাথা কামড়ে ঝুলতে থাকবে।

ভালো কথা, কর্কটা শুরুতে বোতলের ভেতর থাকলে হবে না। কারণ বোতলটা দর্শক দেখতে চাইবে। কর্কের বল পাম করে হাতে লুকিয়ে রাখতে হবে।

তুমি ভালো থেকো।

ইতি

বিদ্যুত কান্তি

পুনশ্চ : সাপ এবং আপেল বিষয়ের যে বইটি তুমি দিয়েছ, তার মতো খারাপ বই আমি অনেক দিন পড়িনি। সর্বমোট আটটি গল্প। প্রতিটি একটার চেয়ে আরেকটা খারাপ। বইটির নাম হওয়া উচিত 'আটটি নিকৃষ্ট গল্প'।

হাবীব চিঠি শেষ করে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। নাদিয়া তার শিক্ষককে গল্পের বই কেন দিবে! তার সমস্যা কী?

পূর্বপাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী জানো ?

জানি না স্যার।

সবাই জানে, তুমি কেন জানবা না ? তুমি দেখি ছাগলের ছাগল।

গভর্নর মোনায়েম খান সাহেবের কথায় যিনি মাথা নিচু করলেন তিনি পূর্বপাকিস্তানের একজন বুদ্ধিজীবী। সম্মানিত মানুষ। অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। সঙ্গত কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ করা হলো না। এই অধ্যাপক মোনায়েম খানের মাসিক বেতার ভাষণ মাঝে মাঝে লিখে দেন। এ মাসের বেতার ভাষণ লিখে এনেছেন। মোনায়েম খান এখনো তা পড়েননি। দেশের বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেছেন।

মোনায়েম খান অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশের বড় সমস্যা হলো মালাউন সমস্যা। হিটলার যেমন ইহুদির গুষ্টিনাশ করেছিল, আমরাও যদি সেরকম মালাউনের গুষ্টিনাশ করতে পারতাম তাহলে শান্তির একটা দেশ পাওয়া যেত। ঠিক বলেছি কি না বলো ?

ঠিক বলেছেন।

গ্যাসের কোনো টোটকা তোমার জানা আছে ?

কিসের টোটকা বুঝলাম না!

মন দিয়ে না শুনলে কীভাবে বুঝবে ? তোমার মন অন্যত্র পড়ে আছে। গ্যাসের টোটকা চিকিৎসা আছে কি না বলো। আমার পেটে গ্যাস হচ্ছে।

বেশি করে পানি খান স্যার।

মোনায়েম খান পানি দিতে বললেন। সাধারণ পানির সঙ্গে এক দুই ফোঁটা জমজমের পানি মিশিয়ে খাওয়া তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস।

গ্যাসের সমস্যাটা তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। শশা-ক্ষিরা এই জাতীয় ফল তাঁর পেটে কখনো সহ্য হয় না। গভর্নর হাউসের বাগানের এক কোনায় মালি কিছু সবজির আবাদ করেছে। এর মধ্যে আছে শশা, কাকরুল, বরবটি। তিনি কচি

শশা ঝুলতে দেখে লোভে পড়ে তিন-চারটা খেয়ে ফেলেছেন। পাঁচ কোষ কাঁঠাল খেয়েছেন। এই দুইয়ে মিলে পেটে কঠিন গ্যাস তৈরি হয়েছে।

মোনায়েম খান দুই গ্লাস পানি খেয়ে বললেন, বিশিষ্ট মানুষের গ্যাসের সমস্যা—কঠিন সমস্যা। সাধারণ মানুষের জন্যে এটা কিছু না। বিশিষ্ট মানুষের জন্যে বিশিষ্ট সমস্যা। ধরো তোমার পেটভর্তি গ্যাস। ক্লাসে গিয়েছ। ছাত্র পড়াচ্ছ। হঠাৎ 'পাদ' মারলা। কিছু ছাত্র হাসল। ঘটনা এইখানেই শেষ। আমার কথা চিন্তা করো। আজ রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইস এডমিরাল এ আর খানের সঙ্গে আমার ডিনার। সেখানে যদি হঠাৎ পাদ দেই, বিষয়টা কী রকম হবে?

স্যার, বক্তৃতাটা পড়ে দেখবেন ঠিক হয়েছে কি না?

সবুর করো। এত ব্যস্ত কেন? তুমি যে বক্তৃতা লিখে নিয়ে এসেছ, তার পাখা নাই যে উড়াল দিয়ে চলে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ আছে, সেগুলা সারব। তারপর বক্তৃতা।

তিনি সেক্রেটারিকে বললেন, ডিআইজি সাহেবকে টেলিফোনে ধরো। পাঁচ মিনিট সময়, এর মধ্যে লাইন লাগিয়ে দিবে।

সেক্রেটারি তিন মিনিটের মাথায় লাইন লাগিয়ে দিলেন।

স্যার স্লামালিকুম।

স্লামালিকুম বলবেন না। স্লা আর শালার মধ্যে তফাত কিছু নাই। পরিষ্কার করে বলবেন আসসালামু আলায়কুম।

জি স্যার। এখন থেকে তাই বলব।

ময়মনসিংহ থানার ওসির নাম কী?

একটু জেনে তারপর বলি।

জেনে বলতে হবে না। তার নাম আখলাকুর রহমান। তাকে বদলি করে দেন দুর্গম কোনো জায়গায়। রামু, নাইক্ষ্যংছড়ি আর কী সব আছে না।

বদলি করে দেব?

অবশ্যই। তবে আপনার কাজ সহজ করে দিচ্ছি—বদলির অর্ডার যাবে। তিন দিনের মাথায় অর্ডার ক্যানসেল হবে। সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

বিষয়টা স্যার বুঝতে পারছি না।

সবকিছু বোঝার কি প্রয়োজন আছে? অর্ডার পেয়েছেন অর্ডার পালন করবেন। এর জন্যে কি আপনার আইজির পারমিশন লাগবে?

জি-না।

গুড। আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, এটা কি জানেন?

জেনে ভালো লাগল স্যার।

আমি খবর পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক গোপনে মদ্যপান করে। তার তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে দিবেন।

জি স্যার।

আচ্ছা বিদায়।

খোদা হাফেজ স্যার।

খোদা হাফেজ আবার কী? বলেন আল্লাহ হাফেজ।

স্যার সরি। আল্লাহ হাফেজ।

ইসলাম বিষয়টা মাথার মধ্যে রাখবেন এবং কথায় কথায় বলবেন, আল্লাহু আকবর। এতে দিলে সাহস হবে। আপনারা পুলিশ অফিসার। আপনাদের সাহসের দরকার।

মোনায়েম খান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। সাহসের তাঁরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ভাইস এডমিরাল এ আর খানের সঙ্গে রাতে খানা খেতে হবে ভেবে এখনই যেন শরীর কেমন করছে। সে আবার শরাব খায়। পরিমাণে বেশি খেয়ে ফেললে উল্টাপাল্টা কথা বলা শুরু করবে। মান্যগণ্য করে কিছু বলবে না। আর আগের বার তাঁর পিঠে থাবা দিয়ে বাংলায় বলেছে—গভর্নর! তুমি দুষ্ট আছ!

অল্প বাংলা শেখার এই ফল। দুষ্ট হবে পুলাপান। তাঁর মতো বয়স্ক একজন মানুষকে দুষ্ট বলা আদবের বরখেলাফ। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে ইংরেজিতে। এটা একটা বিরাট সমস্যা। কথার পিঠে ইংরেজিতে কথা বলা মানে মুসিবত।

মোনায়েম খান অধ্যাপকের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি কী লিখেছ। না থাক, দেখব না। তুমি পড়ে শোনাও। 'দেশবাসী ভাই ও বোনেরা' বাদ দিয়ে পড়ো।

অধ্যাপক পড়া শুরু করলেন—'পূর্বপাকিস্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুষ্কৃতিকারীরা ঘাঁটি পেতেছে।'

মোনায়েম খান বিরক্ত মুখে বললেন, তোমাকে কতবার বলেছি কঠিন শব্দ ব্যবহার করবে না। তোমার রন্ধ্র ফন্দ্র কয়টা লোকে বুঝবে? ডিকশনারি হাতে নিয়ে কেউ বক্তৃতা শোনে না। লেখো—'দেশের আনাচে-কানাচে দুষ্কৃতিকারী। তাদের একটাই পরিকল্পনা, ইংরেজিতে যাকে বলে Master Plan. দেশকে ইন্ডিয়ার হাতে বিক্রি করা।' লিখেছ?

একটু আস্তে আস্তে বললে লিখতে পারি।

আমি মূলটা বলি, তুমি গুছিয়ে লেখো। মূল হলো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মামলার বিচারের জন্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসেছে। ট্রাইব্যুনালের প্রধান সাবেক বিচারপতি জনাব এস এ রহমান। সঙ্গে থাকবেন বিচারপতি জনাব মুজিবুর রহমান খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম। এই ট্রাইব্যুনাল কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন দেশদ্রোহীর বিচার করবে। এই ট্রাইব্যুনালের রায় মাথা পেতে নিতে হবে। রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না।

সবশেষে লিখবে পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনতা এই নগ্ন দেশদ্রোহিতার বিচার চায়। আল্লাহু আকবার। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ। শুরু করবে আয়ুব খানের উন্নয়নের দশক দিয়ে। বলবে, জাতি এই মহামানবের অবদান কখনো ভুলবে না।

মোনায়েম খান বেল টিপে তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন, তথ্য সচিবকে জানাও যে আমি তাঁর উপর কিঞ্চিৎ নাখোশ। ঢাকা টেলিভিশন উন্নয়নের দশক ঠিকমতো প্রচার করছে না। এখন তথ্য সচিব কে ? বাঙালি না ?

জি-না স্যার। উনি মুলতানের।

তাহলে থাক, কিছু বলার দরকার নাই।

মোনায়েম খান পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন। সেখানে চুনি পাথরের একটা তসবি আছে। ছোট ছোট দানা। মন অস্থির হলে তিনি গোপনে তসবি জপ করেন। এতে মন শান্ত হয়। আজ তাঁর মন নানান কারণে অস্থির। তিনি চোখ বন্ধ করে পড়ছেন—'ইয়ামুকাদ্দেমু। ইয়া মুকাদ্দেমু।' 'হে অগ্রসরকারী। হে অগ্রসরকারী।'

অধ্যাপক পাশের ঘরে চলে গেছেন। বক্তৃতা লিখবেন। মোনায়েম খান একা আছেন। দু'বার তসবি টানা শেষ হলো। মোনায়েম খানের অস্থিরতা কমল না, বরং বাড়ল। কিছুদিন নির্জনে থাকতে পারলে ভালো হতো। এক ফাঁকে উমরা হজ্ব করে আসবেন কি না ভাবলেন। এখানেও জটিলতা। আয়ুব খানের কাছে উমরা হজ্বের বিষয়টা তুলেছিলেন। আয়ুব খান বলেছেন, বেশির ভাগ মানুষ পাপ কাটানোর জন্যে হজ্বে যায়। আপনি সুফি মানুষ। আপনার হজ্বের প্রয়োজন কী। মোনায়েম খান সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, তা ঠিক, তা ঠিক।

আয়ুব খান বললেন, দেশসেবা হজ্বের মতোই।

তা ঠিক। তা ঠিক।

এখন আপনার প্রধান কাজ ছাত্র ঠান্ডা রাখা। ছাত্ররা ঠান্ডা আছে না?

মোনায়েম খান বললেন, অবশ্যই ঠান্ডা। গাঙের পানির মতো ঠান্ডা। Cold like river water.

ছাত্রদের জন্যে আমি অনেক কিছু করেছি। ভবিষ্যতে আরও করার ইচ্ছা আছে। সিনেমার টিকেটের দাম অর্ধেক করে দিয়েছি।

মোনায়েম খান বললেন, সিনেমা পুরোপুরি ফ্রি করে দিলে কেমন হয়? দিনরাত সিনেমা দেখবে, হাঙ্গামার কথা মনে থাকবে না।

এটা ঠিক হবে না। লোকে অন্য অর্থ করবে। আমি ছাত্রদের জন্যে ট্রেন ভাড়া, বাস ভাড়া সব অর্ধেক করেছি, সেই সঙ্গে সিনেমাও হাফ করেছি। তুমি যা করবে তা হচ্ছে ছাত্রদলগুলি যেন একদল আরেকদলের সঙ্গে লেগে থাকে, সেই ব্যবস্থা। নিজেরা নিজেরা কাটাকাটি করতে থাকুক।

অবশ্যই। ব্যবস্থা করা আছে। সব দলেরই উপরের দিকে কিছু নেতা আমাদের পে লিস্টে আছে।

পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি করতে হবে। Student exchang প্রোগ্রাম আরও জোরদার করতে হবে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইন্টার ম্যারেজ হবে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দুই অংশের দু'শ ছেলেমেয়ের বিয়ে হলো। গভর্নর ভবনে সংবর্ধনা। প্রস্তাবটা কেমন?

এরচেয়ে ভালো প্রস্তাব হতে পারে না। এই দু'শ ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার দূরসম্পর্কের ভাইস্তি থাকবে, তার নাম নাদিয়া। M.Sc. পড়ছে। অত্যন্ত ভালো মেয়ে।

Inter province marriage-এর বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখবে। উন্নয়নের দশকের সঙ্গে মিলিয়ে দিবে। যখন কোনো ঝামেলা হয়, তখন জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে হয়। এই ঘটনায় দৃষ্টি ফিরবে। বুঝেছ?

ইয়েস স্যার।

পশ্চিম পাকিস্তানের যুবকরা বাঙালি মেয়েদের বিষয়ে আগ্রহী। বিয়েতে সমস্যা হবার কথা না। তবে পূর্বপাকিস্তানের কিছু ফকির মিসকিন পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ফকির মিসকিনকে বিয়ে করে লোক হাসাক তা আমি চাই না।

স্যার, আমি তো আমার ভাইস্তির কথা বলেছি, এরকম আরও জোগাড় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

মোনায়েম খান গভীর চিন্তা থেকে জেগে উঠলেন। আবার তাঁর হাত চলে গেল পাঞ্জাবির পকেটে।

তিনি তসবি টানতে টানতে বললেন, বান্দরের বাচ্চা কী লিখেছে দেখছ ?

অধ্যাপক চিন্তিত মুখে তাকালেন। বান্দরের বাচ্চা বিষয়টা ধরতে পারলেন না।

মোনায়েম খা বললেন, *ইত্তেফাকে* কী লিখেছ দেখো নাই ? লিখেছে ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্বপাকিস্তানে আমদানি করা হয়েছে ৫২ কোটি টাকার পণ্য আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৬ কোটি টাকার পণ্য। জনতা ক্ষেপাতে চায়। গাধা সাংবাদিক বুঝে না একটা যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধটা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্বপাকিস্তানে না। ওদের পণ্য বেশি লাগবে।

অধ্যাপক বললেন, কথা সত্য।

মোনায়েম খান বললেন, কথা সত্য হলে এই বিষয়ে লেখালেখি করো। মুখে বড় বড় কথা বললে তো হবে না। মোনায়েম খান বিরক্ত মুখে চোখ বন্ধ করলেন। হঠাৎ প্রবল ঘুমে তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। এই ব্যাপারটা তার ঘনঘন ঘটছে। অসময়ে ঘুম পাচ্ছে।

হঠাৎ আমার নামে রসায়ন বিভাগের ঠিকানায় একটা বিয়ারিং চিঠি এসেছে। টিকিট ছাড়া চিঠি। পিয়নের কাছ থেকে চিঠি নিতে হলে দু'আনা দিতে হবে। দু'আনায় দুই কাপ চা পাওয়া যায়। আমি নিজে এক কাপ খেতে পারি। একজন বন্ধুকেও খাওয়াতে পারি। কী করব বুঝতে পারছি না। বাসার চিঠি না। বাসার চিঠি বাবার আরদালি আনা-নেওয়া করে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি কেউ টিকিট ছাড়া পাঠাবে না। পিয়নকে ফিরিয়েই দিচ্ছিলাম। কী মনে করে দু'আনা গচ্চা দিয়ে খাম নিলাম। খুলে দেখি নাদিয়া পাঠিয়েছে। সে লিখেছে (সম্বোধনহীন চিঠি)—

> প্রথমেই বলি বিয়ারিং চিঠি কেন পাঠিয়েছি। বিয়ারিং চিঠি কখনো মিস হয় না। রেজিস্ট্রি চিঠিও প্রায়ই হারায়। পোস্টাপিস থেকে খুলে দেখে ভেতরে টাকা আছে কি না। বিয়ারিং চিঠি কেউ খোলে না।
>
> এখন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে কথা বলব। আমরা ক্লাসের মেয়েরা নিজেরা তুমি তুমি করে বলি। ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে তুমি তুমি করে বলে। অথচ একটা ছেলে যখন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তখন 'আপনি'। ব্যাপারটা কি যথেষ্টই হাস্যকর না? এখন থেকে আমি তোমাকে তুমি করে বলব। তুমিও অবশ্যই আমাকে তুমি বলবে।
>
> আমি এই চিঠিটা তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে লিখছি। তুমি আমার হাতের ছাপ দেখে খুব গুছিয়ে অনেক কিছু লিখেছ। তুমি লিখেছ—আমার হাত বিজ্ঞানীর হাত। আমি মাদাম কুরির মতো বড় বিজ্ঞানী হব।
>
> মাদাম কুরী হওয়ার আমার কোনো শখ নেই। আমি পার্ল এস বাকের মতো লেখিকা হতে চাই।
>
> আমি প্রথম যে উপন্যাসটা লিখব তার নাম 'হাজেরা বিবির উপাখ্যান'। হাজেরা বিবি হচ্ছেন আমার দাদি।

উপন্যাসের প্রথম লাইনটাও ঠিক করা—'আজ হাজেরা বিবির বিয়ের দিন।' এই লাইনটা আমি অবশ্যি পার্ল এস বাকের কাছ থেকে চুরি করেছি। উনার লেখা *গুড আর্থ* উপন্যাসের প্রথম লাইন হচ্ছে—আজ ওয়াং লাং-এর বিয়ের দিন।

আমি অবশ্যি আমাকে নিয়েও একটা উপন্যাস লিখতে পারি। সেটাও খারাপ হবে না। নিজেকে নিয়ে যদি লেখি তার প্রথম লাইনও হবে—'আজ তোজল্লীর বিয়ের দিন।' তোজল্লী আমার আরেকটি নাম। এই নামে শুধু দাদি আমাকে ডাকেন।

তুমি আমার হাতের ছাপ দেখে লিখেছ—আপনার বিয়ে নিয়ে আপনি যতটা ঝামেলা হবে বলে আশা করছেন তত ঝামেলা হবে না। আপনি আপনার পছন্দের কাউকে বিয়ে করবেন, তবে আপনি বিয়ের পরপর দেশ ত্যাগ করবেন। কখনো দেশে ফিরবেন না।

আমার বিয়ে নিয়ে নানান ঝামেলা কিন্তু হচ্ছে। হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার বিয়ে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের এক নওজোয়ানের সঙ্গে। এতে পূর্বপাকিস্তান-পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। ইত্যাদি। আমি তখন বাবাকে গিয়ে বললাম, 'পিতাজি হামনে মাগরেবি পাকিস্তানকা নওজোয়ান শাদি নাহি করুঙ্গি।'

বাবা আমার বেয়াদবি দেখে হতভম্ব হলেন। তাঁর মেয়ে উর্দু কথা বলে তার সঙ্গে ফাজলামি করবে এটা তিনি নিতেই পারলেন না। আমি কিন্তু মোটেই ফাজলামি করছিলাম না।

আমি দাদিজানকে ঘটনা বললাম। দাদিজান বললেন, আমারে একটা হাছুন দে। হাছুন দিয়া পিটায়া তোর বাপের মাথা থাইকা পশ্চিম পাকিস্তান বাইর করতেছি।

ওই সমস্যার সমাধান হলেও নতুন সমস্যায় আছি। বাবা এখন যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছেন সে একজন খুনি। নিজের মামাকে গুলি করে খুন করেছে। এই খুনি কিন্তু দেখতে রাজপুত্রের মতো। মাইকেল এঞ্জেলো তাকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পাথর কেটে মূর্তি বানানো শুরু করতেন।

দেখলে কত লম্বা চিঠি লিখছি! রাত জেগে চিঠি লিখতে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি জানিয়েছ আমার হাতে সুলেমানস রিং আছে। যাদের হাতে এই চিহ্ন থাকে, তারা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

আমার কোনোই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই। ভয় পাওয়ার ক্ষমতা আছে। দিঘির জলে নিজের ছায়া দেখে এমনই ভয় পেয়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা অচেতন ছিলাম। এখন ভালো। বাবা বলছেন, শরীর পুরোপুরি সারলে ঢাকায় যেতে পারব, কিন্তু দিঘির ঘাটে কখনোই যেতে পারব না।

তবে আমি নিয়মিতই দিঘির ঘাটে যাচ্ছি। মা আমার জন্যে তাঁর দেশের বাড়ি থেকে বারো বছর বয়েসী একটি মেয়ে আনিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটার নাম বিছুন (অর্থাৎ পাখা)। আমি তার নাম বদলে রেখেছি পদ্ম। কারণ সে পদ্মের মতোই সুন্দর। মেয়েটার ডিউটি হচ্ছে, সে এক সেকেন্ডের জন্যেও আমাকে চোখের আড়াল করতে পারবে না।

তা সে করছে না। সে আমার সঙ্গে ছায়ার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে আছে। অন্ধকারে মানুষের ছায়া থাকে না। সে অন্ধকারেও থাকে এবং টকটক করে সারাক্ষণ কথা বলে। তার প্রধান আগ্রহ শিল্লুকে। রোজ আমাকে চার-পাঁচটা শিল্লুক ধরবে। উদ্ভট উদ্ভট সব শিল্লুক। যেমন—

'কৈলাটির নানি
হাত দিয়া ধরলে পানি।'

এই শিল্লুকের অর্থ হলো, আকাশ থেকে পড়া শিল। শিল হাত দিয়ে ধরলে পানি হয়ে যায়। এখন তুমি বলো কৈলাটির নানির সঙ্গে শিলের কী সম্পর্ক?

তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। আমার মন বলছে, তুমি এই চিঠি তোমার সব বন্ধুদের পড়াবে এবং বলবে, 'নাদিয়া নামের একটি মেয়ে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।' এই কাজটি করো না। আমি প্রেমেপড়াটাইপ না।

ভালো থেকো।

তোজল্লী, নাদিয়া, দিয়া

পুনশ্চ : পদ্ম মেয়েটিকে নিয়ে যা লিখলাম সবই মিথ্যা। পদ্ম নামে কেউ নেই। আমি যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা শিখে গেছি তা প্রমাণ করার জন্যেই পদ্ম। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে ফেলেছ পদ্ম বলে একজন আছে।

মোটামুটি অপরিচিত কোনো তরুণীর কাছ থেকে পাওয়া আমার জীবনের দীর্ঘতম পত্র। প্রথমেই ইচ্ছা হলো, কেমিস্ট্রির সব ছাত্রছাত্রীকে একত্র করে চিঠিটা পড়ে শোনাই।

অনেক কষ্টে এই লোভ সামলালাম। বিকালে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছিল। ক্লাস বাদ দিয়ে চলে গেলাম পাবলিক লাইব্রেরিতে। গুড *আর্থ* আগেই পড়া ছিল। মনে হলো আমার এই বই আরেকবার পড়া উচিত।

রাত আটটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা। আটটা পার করে হলে ফিরলাম। হলে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা। তিনটা ডেডবডি গেস্টরুমের সামনে পড়ে আছে। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

ডেডবডিগুলি কার ? এখানে কেন ? ঘটনা কী ? কিছুই জানি না। ডেডবডি মানেই কান্নার শব্দ, আতরের গন্ধ। এখানে তার কিছুই নেই। হলের কর্মকর্তা প্রভোস্ট হাউজ টিউটর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দারোয়ানদের শুকনো মুখে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। হলের ভেতরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া কিছুই হচ্ছে না।

ডাইনিং হল খোলা আছে। ক্ষুধার্ত ছাত্ররা রাতের খাবার খেতে যাচ্ছে। আমিও খেতে গেলাম। ইমপ্রুভড ডায়েট ছিল। পোলাও-মাংস-দৈ। খাওয়া শেষ করে হলের স্টোর থেকে দশ পয়সা দিয়ে একটা ক্যাপসটেন সিগারেট কিনে লম্বা টান দিলাম। জীবনের প্রথম সিগারেট। যেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি, সেখান থেকে তিনটা ডেডবডি দেখা যাচ্ছে। আমি বিকারশূন্য অবস্থায় সিগারেট টানছি। যেন আশেপাশের জগতের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি সিস্টেমের ভেতরের কেউ না। আমি সিস্টেমের বাইরের একজন।

তার পরদিন দুপুরে আরেকটি ঘটনা ঘটল। মহসিন হলের পাশেই জিন্নাহ হল। জিন্নাহ হলের পাঁচতলায় একজন এনএসএফ নেতার ঘরে সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণী। এক পর্যায়ে এই তরুণী নিজেকে বাঁচানোর জন্যে পাঁচতলার জানালা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। কাকতালীয়ভাবে এই মেয়েটির নামও নাদিয়া। অনেকের সঙ্গে আমিও মেয়েটিকে দেখতে গেলাম। মধ্যবিত্ত ঘরের মায়া মায়া চেহারার এক তরুণী। চোখে কাজল দেওয়া। তার

গায়ে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি। নীল শাড়ির ওপর রক্ত ভেসে উঠছে। সালভাদর দালিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সৌন্দর্য কী ?'

তিনি বলেছিলেন, 'সৌন্দর্য হচ্ছে রঙের সঙ্গে রঙের খেলা।'

যে ছাত্রের ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে মেয়েটি মারা গেল, তার কিছুই হলো না। সে বহাল তবিয়তে বাস করতে লাগল। তার একটা ভারী মোটর সাইকেল ছিল। সে বিকট শব্দে মোটর সাইকেলে করে ঘুরতে লাগল।

মহসিন হলের ক্যান্টিনে সে কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেতে বসেছে। আমি তাদের পাশের টেবিলে আছি। তাদের আলোচনা শুনছি। আলোচনার বিষয়বস্তু রাশিয়ান ছবি 'Ballad of a Soulder'। মোটরসাইকেলওয়ালা নাকি এই ছবি পাঁচবার দেখেছে। এবং প্রতিবারই কেঁদেছে।

পাঠ্যবই পড়তে কারোরই ভালো লাগার কথা না। শুকনা বই থেকে বিদ্যা আহরণ। সন্ধ্যার পর দরজা লাগিয়ে এই কাজটি নিয়মিত করি। আমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করতে হবে। বাবার স্বপ্ন CSP অফিসার হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। শুনেছি CSP-দের ইংরেজির ভালো দখল থাকতে হয়। হলের রিডিংরুমে পত্রিকা আসে। প্রায়ই গম্ভীর মুখে *Observer* পত্রিকার এডিটরিয়েল পড়ি। ইংরেজি শেখার জন্যে না-কি এডিটরিয়েলের বিকল্প নেই। ইংরেজি গল্প-উপন্যাসও পড়ি। পড়ার আনন্দের জন্যে পড়া না, ইংরেজি শেখার জন্যে পড়া।

দেশ যখন সংঘাতের দিকে যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বোনা হচ্ছে, তখন আমি চোখ বন্ধ করে পাকিস্তানের অফিসার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

নাদিয়া লেখিকা হতে চায় এই বিষয়টা আমাকে অবাক করেছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর—এইসব হওয়া যায়। লেখক কি হওয়া যায় ? লেখক হওয়ার সুযোগ থাকলে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকত। আগ্রহীরা ঔপন্যাসিক হবার ক্লাসে অনার্স নিত।

নাদিয়ার চিঠি কি কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল ? মনে হয় করেছে। এক হরতালের দিনে আমি দরজা বন্ধ করে একটা ছোটগল্প লিখে ফেললাম। নাম 'গন্ধ'। লেখা শেষ করে নিজে পড়লাম। আমার পাশের রুমে থাকতেন ফিজিক্সের ছাত্র আনিস সাবেত। তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনি বললেন, গল্পের নাম 'গন্ধ' না দিয়ে 'দুর্গন্ধ' দিলে ভালো হতো। গল্প থেকে দুর্গন্ধ আসছে।

গল্প ছিঁড়ে কুটিকুটি করে কেমিস্ট্রিতে মন দিলাম।

বাইরে অশান্ত নগরী। মিটিং, মিছিল, হরতাল। আমার জীবন তরঙ্গহীন। ক্লাস থাকলে ক্লাসে যাই। ক্লাস না থাকলে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি। নিউ মার্কেটের ভেতর একটা চায়ের দোকান আছে, নাম 'লিবার্টি কাফে'। এই কাফেতে চা ছাড়াও মহার্ঘ পানীয় কফি পাওয়া যায়। চায়ের দাম দু'আনা, কফি আট আনা। আমার খুব যখন মেজাজ খারাপ থাকে, তখন লিবার্টি কাফেতে কফি খেতে যাই। একটা বইয়ে পড়েছি কফি এবং চকলেট মেজাজ ঠিক করে।

একদিন লিবার্টি কাফেতে কফি খেতে গেছি। কেবিন থেকে একজন কেউ ডাকল, হুমায়ূন, চলে আসেন।

তাকিয়ে দেখি মনিরুজ্জামান ভাই। NSF-এর পাতিনেতা। সঙ্গে অনেকে আছেন। দোলনকে চিনলাম। ভয়ে বুক কেঁপে গেল। কেবিনে যাওয়ার অর্থই হয় না। না গিয়েও উপায় নেই।

আমি কেবিনে ঢুকলাম। মনির ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। স্ট্যান্ড করা। হিপনোটিজম জানে। ম্যাজিক জানে।

দোলন বিরক্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কাটলেট খাবেন?

আমি বললাম, না।

অন্য কিছু খাবেন?

না।

দোলন আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মন দিলেন। আলোচনার বিষয় NSF দুই ভাগে ভাগ হয়ে ভালো হয়েছে। ভাগাভাগি আরও আগে হওয়াই উচিত ছিল।

NSF দুই ভাগে ভাগ হয়েছে—এই তথ্য আমি জানতাম না। লিবার্টি কাফেতে ঢোকার কারণে জানলাম NSF-এর এক ভাগ আয়ুবপন্থী এবং পুরোপুরি পাকিস্তানপন্থী। তাদের প্রধান জমির আলী। দ্বিতীয় ভাগের প্রধান দোলন। তারা মোনায়েম-বিরোধী।

এই সময় আমার এক বন্ধু জনৈকা তরুণীর প্রেমে পড়ল। তরুণীর নাম রূপা। বন্ধুর প্রেমপত্র লিখে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব পড়ল আমার হাতে। রূপার চিঠি সে আমাকে এনে দেয়। আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি। উত্তর লিখতে বসি। চিঠি চালাচালি চলতে থাকে। রূপা আমাকে চেনে না। আমিও তাকে চিনি না। গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে তাকে চিঠি লিখে যাই। মাতাল সময়ে লেখা প্রেমপত্রগুলিই হয়তোবা আমার প্রথম সাহিত্যকর্ম।

আমার বন্ধুর সঙ্গে রূপা মেয়েটির বিয়ে হয়নি। আমার বন্ধু তার পরিচিত এক আত্মীয়াকে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় ইংল্যান্ড চলে গেল। তার বিয়ের দাওয়াতে কুমিল্লা গিয়েছিলাম। বিয়ের আসরে বন্ধুপত্নীকে দেখে ধাক্কার মতো খেলাম। অতি স্বাস্থ্যবতী কন্যা। মাথা শরীরের তুলনায় ছোট। মেয়েটিকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো। সে সারাক্ষণই হাসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির সারাক্ষণ হাসির কারণ বের করলাম। তাঁর দাঁত মুখের বাইরে। ঠোঁট দিয়েও সেই দাঁত ঢেকে রাখা যায় না।

রূপাকে আমি দেখি নি। তার ছবি দেখেছি। কী মিষ্টি কী শান্ত চেহারা! পটে আঁকা ছবি। রূপা যেন হারিয়ে না যায় তার জন্যেই হিমুর বান্ধবী হিসেবে আমি তাকে নিয়ে আসি। হিমুকে নিয়ে লেখা প্রতিটি উপন্যাসে রূপা আছে।

আমরা কাউকেই হারাতে চাই না, কিন্তু সবাইকেই হারাতে হয়।

ফরিদের মামলা কোর্টে উঠেছে। পুলিশ চার্জশিট আগেই দিয়েছিল। ফরিদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন উকিল মুসলেম উদ্দিন। হাবীব খানের জুনিয়র। রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণের চেষ্টা করছে খুন হয়েছে। মুসলেম উদ্দিন বলছেন, দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মামলা সাজানোর পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আছে। ফরিদকে দেখানো হচ্ছে হাজি রহমত সাহেবের কেয়ারটেকার হিসাবে। বন্দুকের লাইসেন্স হাজি সাহেবের নামে। তাঁর কেয়ারটেকারের পক্ষেই বন্দুক পরিষ্কার করা যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া হাসানকে কোনো কিছুতেই রাখা হচ্ছে না। হত্যাকাণ্ডের সময় সে অকুস্থলেই ছিল না। ময়মনসিংহে এসেছিল সিনেমা দেখতে। দুই রাত হোটেলে ছিল। হোটেলের রেজিস্ট্রারে ব্যাকডেটে তার নাম তোলা হয়েছে।

হাজি সাহেবের সাক্ষ্য ভালোমতো হয়েছে। তিনি কোনো ভুল করেননি। বেফাঁস কথা বলেন নি। যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তা-ই বলেছেন। বিশ্বাসযোগ্যভাবে সুন্দর করে বলেছেন।

আপনি এই বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করেন? (বন্দুক দেখানো হলো)

জি।

রোজ শিকার করেন?

হঠাৎ হঠাৎ করি, রোজ না।

কী পাখি?

বক, হরিয়াল, ঘুঘু।

ছররা গুলি ব্যবহার করেন?

জি।

তাহলে বন্দুকের ভেতর ছররা গুলি থাকার কথা। বুলেট ছিল কেন?

একটা বাঘডাশা খুব উপদ্রপ করছিল। হাঁসমুরগি নিয়ে যায়। একটা ছাগলও নিয়ে গিয়েছিল। বাঘডাশা মারার জন্য বুলেট ভরেছিলাম।

বাঘডাশা মারতে পেরেছিলেন?

জি জনাব। দু'নলা বন্দুকের একটা গুলি খরচ হয়েছে। আরেকটা হয় নাই। বন্দুকে একটা গুলি আছে, ফরিদ বুঝতে পারে নাই। বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এখানে তার যতটা দোষ, আমারও ততটাই দোষ। বুলেট আমি কেন সরায়ে রাখি নাই? আপনারা শাস্তি দিতে চাইলে আমাকে দিবেন। আমারই শাস্তি হওয়া উচিত।

হাজি সাহেব শেষের কথাগুলি জজ সাহেবের দিকে হাতজোড় করে বললেন। বলার সময় তাঁর গলা ভেঙে গেল। তাঁর কাঁধে রাখা চাদরে চোখ মুছলেন।

ডিসট্রিক জজ বললেন, ঠিক আছে আপনি যান। অন্য কোনো সাক্ষী থাকলে আসুক।

পরের সাক্ষীর নাম আমেনা বেগম। সে প্রত্যক্ষদর্শী। হাবীব জেরা করার জন্যে তাঁর জুনিয়রকে উঠতে দিলেন না। নিজেই উঠলেন।

হাবীব : আপনার নাম আমেনা বেগম?

আমেনা : জি।

হাবীব : আপনি কী করেন?

আমেনা : আমি কইতরবাড়িতে পাকশাকের কাম করি।

হাবীব : ফরিদকে আপনি চেনেন?

আমেনা : জে। হে আমারে খালা ডাকে।

হাবীব : ফরিদ ছেলে কেমন?

আমেনা : হে ফেরেশতার মতো। আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখি নাই।

হাবীব : ওইদিনের ঘটনা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

আমেনা : জি।

হাবীব : কী দেখেছেন বলুন।

আমেনা : ফরিদ সকালবেলা আমারে কইল, খালাজি, আমারে এককাপ চা দেন। চা খায়া বন্দুক সাফ করব।

আমি বললাম, কাইল একবার বন্দুক সাফ করলি, আইজ আবার?

সে বলল, গতকাইল বাঘডাশা মারা হইছে—নলে ময়লা জমেছে। বড়সাব যদি পক্ষী শিকারে যাইতে চান।

আমি বললাম, তুই যা বন্দুক সাফা কর, আমি চা নিয়া আসতেছি।

সে বলল, মামার জন্যেও এক কাপ চা আনবা। মামা নামাজে দাঁড়াইছেন। নামাজ শেষ কইরা চায়ে চুমুক দিলে ভালো লাগব।

হাবীব : মামা কে?

আমেনা : যিনি খুন হইছেন তারে ফরিদ মামা ডাকত। উনারে ফরিদ অত্যধিক সম্মান করত। মামা মামা ডাইকা পিছনে ঘুরত।

হাবীব : আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নাই।

আমেনা : স্যার, ঘটনা ক্যামনে ঘটছে সেইটা জিগান। বর্ণনা করি। আরেকটু হইলে আমি গুলি খায়া মরতাম। ভাইগ্নার হাতে খালার মৃত্যু। বন্দুকের নল ছিল আমার দিকে। ইয়া মাবুদে এলাহি।

হাবীব নিজের জায়গায় এসে বসলেন। প্রণব চাপা গলায় বলল, সাক্ষী কেমন জোগাড় হয়েছে দেখেছেন স্যার! সব ঠোঁটস্থ। প্রশ্নের আগে উত্তর।

হাবিব বললেন, বেশি মুখস্থ হওয়াও ভালো না। বেশি মুখস্থের স্বাক্ষী সন্দেহজনক। কেউ বিশ্বাস করে না।

প্রণব গলা আরও নামিয়ে বলল, গতকালের *ময়মনসিংহ বার্তা* পড়েছেন স্যার?

ময়মনসিংহ বার্তা আমি পড়ি না।

প্রণব বলল, আমিও পড়ি না। একজন আমার হাতে দিয়ে গেছে। নেন পড়েন। পড়া প্রয়োজন। শেষ পৃষ্ঠা।

হাবীব *ময়মনসিংহ বার্তার* শেষ পৃষ্ঠা পড়লেন। সেখানে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' নামে একটা খবর ছাপা হয়েছে। খবরের বিষয়বস্তু হলো—খুন করেছে একজন, বিচার হচ্ছে আরেকজনের। ফরিদের মামলার পুরো বিবরণ সেখানে লেখা। মূল খুনি কে এই নাম শুধু বাদ।

হাবীব বললেন, পত্রিকার সম্পাদককে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

কবে দেখা করবে?

আজ রাত আটটার পর। ওসি সাহেবকেও বলবে।

রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট থেকে জিনিস আনায়ে রাখব?

অবশ্যই। হেকিমের দোকানের পরোটা মাংস যেন থাকে। ওসি সাহেব পছন্দ করেন।

নাদিয়া আম্মা আজ ঢাকা যাবে না?

না। এই গণ্ডগোলে তারে ঘরের বাইরে পাঠাব না। প্রয়োজনে এক বৎসর মিস দিবে, পরের বৎসর পড়বে।

আম্মা কি রাজি হবেন?

তার রাজি হওয়া না-হওয়ার কিছু নাই।

বৌদি স্বীকার পেয়েছেন ?

তারও স্বীকার পাওয়া অস্বীকার পাওয়ার কিছু নাই। সংসার একটা গাড়ির মতো। সেই গাড়ির চালক একজন। দুইজনে একসঙ্গে গাড়ি চালায় এমন কথা কেউ শুনে নাই।

হাবীবের অতি কঠিন সিদ্ধান্তের কারণ গত বৃহস্পতিবার রাতে, ফজরের আজানের আগে আগে দেখা একটা স্বপ্ন। অতি পরিষ্কার স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রোকেয়া হল থেকে মিছিল বের হয়েছে। আয়ুববিরোধী মিছিল। অনেকের হাতে প্লাকার্ড। প্লাকার্ডে সাধারণ যে সব কথাবার্তা থাকে সেই সবই লেখা। শুধু নাদিয়ার প্লাকার্ডে লাল কালি দিয়ে লেখা—

রক্ত খাই।
আয়ুব খানের রক্ত খাই।

স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর মনে হলো, এটা কী! 'আয়ুব খানের ফাঁসি চাই' লেখা থাকতে পারে, কিন্তু তার রক্ত খাবে কেন ?

মিছিল পাবলিক লাইব্রেরির কাছে আসতেই পুলিশ গুলি করল। কারও গায়ে গুলি লাগল না। শুধু নাদিয়ার পেটে গুলি লাগল। রাস্তায় কোনো লোকজন নাই, পুলিশও নাই। নাদিয়া চিৎকার করছে, পানি! পানি! তখন বিদ্যুত কান্তি ছুটে এল। সে পানি খাওয়ানোর বদলে নাদিয়ার শাড়ি-ব্লাউজ টেনে খুলতে শুরু করল। এই পর্যায়ে হাবীবের ঘুম ভেঙে গেল।

এমন এক স্বপ্ন দেখার পর মেয়েকে ঢাকা পাঠানোর প্রশ্নই আসে না। স্বপ্নের দোষ কাটানোর জন্যে তিনি একটা মোরগ ছদকা দিয়েছেন, দশটা কবুতর আজাদ করেছেন। তিনজন এতিম খাইয়েছেন। শম্ভুগঞ্জের পীরসাহেবের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। তিনি চিল্লায় বসে বিশেষ দোয়া করবেন।

হাবীব মেয়েকে স্বপ্নের কথা বলেছেন। বিদ্যুত নামে শিক্ষকের অংশটি বলেননি। নিজের মেয়েকে এই বিষয় বলা যায় না। নাদিয়া বলেছে, দেশজুড়ে আন্দোলন হচ্ছে, এই কারণেই এমন স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নাই।

হাবীব বললেন, আমি তোমার মতো জ্ঞানী না। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। তোমার ঢাকা যাওয়া বন্ধ। দেশ যদি কোনোদিন শান্ত হয় ঢাকায় যাবে।

শান্ত না হলে যেতে পারব না ?

না।

আমি এখানে থেকে কী করব ?

যা করতে ইচ্ছা হয় করবে। আমি তোমার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার দাদি মৃত্যুশয্যায়। তিনি নাতজামাইয়ের মুখ দেখতে চান।

বাবা, আমার খুব ইচ্ছা আমি পড়াশোনা শেষ করি। Ph.D করি। ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করি।

তোমার কপালে থাকলে যা চাও হবে। কপালে না থাকলে হবে না। শেখ মুজিব পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন করে তার প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিল—এখন সে ঝুলবে ফাঁসিতে, কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াড। ফায়ারিং স্কোয়াড হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মিলিটারিরা ফাঁসি পছন্দ করে না। তুমি কি আর কিছু বলতে চাও?

নাদিয়া বলল, না।

জানি তুমি রাগ করেছ। আমি তোমার রাগ নিয়ে থাকতে পারব। অনেকেরই আমার উপর রাগ আছে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

নাদিয়া বলল, সেটাই ভালো। বাবা আমি উঠলাম। দিঘির ঘাটে গিয়ে বসে থাকব। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে না। আমি তোমার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারি, কিন্তু যাব না।

সন্ধ্যাবেলা হাজেরা বিবি নাতনির জন্যে অস্থির হয়ে গেলেন। চিলের মতো চিৎকার, ও তোজল্লী! ও তোজল্লী! আমার তোজল্লী কই?

নাদিয়া দাদির কাছে ছুটে গেল। হাজেরা বিবি করুণ গলায় বললেন, এইটা কী খবর শুনলাম?

দাদি, কী শুনেছ?

পুলিশ নাকি তোর পেটে গুলি করেছে? তোর মৃত্যু হয়েছে?

নাদিয়া বলল, যার মৃত্যু হয় সে কি তোমার খাটে বসে গল্প করতে পারে?

হাজেরা বিবি বললেন, তোর মৃত্যু যদি না হয়ে থাকে তাইলে এমন কথা কেন রটল? সবাই জানে, যাহা রটে তাহা বটে।

নাদিয়া শান্ত গলায় বলল, দাদি। বাবা আমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তুমি এই দুঃস্বপ্নের কথা শুনেছ। তুমি ভালোমতোই জানো আমি বেঁচে আছি, তারপরেও নাটক করার জন্যে কিছুক্ষণ হইচই করলে। তুমি প্রমাণ করতে চাও তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার মাথা যে ষোলআনা ঠিক আছে সেটা আর কেউ না জানুক আমি জানি।

হাজেরা বিবি বললেন, জানলে জানস। এখন আমারে বোতলের মিজিকটা আরেকবার দেখা।

বোতলের ম্যাজিক তোমাকে অনেকবার দেখিয়েছি। আর দেখাতে ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া আমার মনটা আজ খারাপ।

বাপ আটক দিছে এইজন্যে মন খারাপ ?

দাদি তুমি তো সবই জানো। শুধু শুধু কেন জিজ্ঞেস করছ ?

হাজেরা বিবির চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, আমারে একবার আমার শ্বশুরআব্বা আটক দিয়েছিলেন। বাপের বাড়ি নাইয়র যাইতে দিবেন না। আমারে নাইয়র নিতে আমার বড় ভাইজান আসছে। বিরাট নাও নিয়া আসছে। শ্বশুরআব্বা তারারে ফিরত পাঠাইছেন। আমি খবর পাইয়া কী করলাম শুনবি ?

শুনতে চাচ্ছি না, ভয়ঙ্কর কিছু তুমি করেছ বুঝতে পারছি।

হাজেরা বিবি হাসিমুখে বললেন, শুন না, শুনলে মজা পাবি। আমি শ্বশুরআব্বার মাথা কামানির ক্ষুর হাতে নিয়া তার কাছে গেলাম। তারে বললাম, আপনে যদি এক্ষণ আমারে বাপের বাড়ি না পাঠান এই ক্ষুর আমি নিজের গলায় বসায়ে দিব। কথা শেষ কইরা ক্ষুর বাইর কইরা গলার কাছে ধরলাম। শ্বশুরআব্বা বললেন, হাত থাইকা ক্ষুর নামাও। আমি ব্যবস্থা নিতেছি।

নাদিয়া বলল, আমি কি বাবার একটা ক্ষুর নিজের গলার কাছে ধরব ?

হাজেরা বিবি পান ছেঁচনি হাতে নিতে নিতে বললেন, সেইটা তোর বিবেচনা।

ময়মনসিংহ বার্তা পত্রিকার সম্পাদকের নাম নিবারণ চক্রবর্তী। সম্পাদকের রাত আটটায় আসার কথা। তিনি আটটা বাজার আগেই চলে এসেছেন। ছোটখাটো মানুষ। পুরুষ্ট গোঁফ আছে। ধুতির ওপর কালো কোট পরেছেন। ধূর্ততা মাখানো ছোট ছোট চোখ। চিন্তিত মুখে হাবীবের চেম্বারে বসে আছেন। জরুরি তলবের কারণ ধরতে পারছেন না। হাবীব ঠিক আটটায় চেম্বারে ঢুকলেন।

নারায়ণ চক্রবর্তী হাতজোড় করে বললেন, নমস্কার।

হাবীব বললেন, আদাব। ভালো ?

জি ভালো।

পত্রিকা কেমন চলছে ?

আমার পত্রিকা অপুষ্ট রুগ্নশিশু, কোনোমতে বেঁচে আছে। নিজের প্রেস থাকায় রক্ষা। প্রেস না থাকলে পত্রিকা কবেই উঠে যেত।

কত কপি ছাপেন ?

দুইশ আড়াইশ কপি।

বিক্রি কত কপি হয়?

অল্প কিছু হয়। সবই চলে যায় সৌজন্যে। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াই।

হাবীব বললেন, আপনি সাহসী মানুষ। আপনার সাহসের তারিফ করি।

সাহসের কী দেখেছেন?

হিন্দুরা ধুতি ছেড়ে দিয়েছে। আপনি পরছেন। সাহসী কর্মকাণ্ড। মাঝে মাঝে এমন কিছু খবর ছাপেন যা অন্য কেউ ছাপবে না। সাহসের অভাবেই ছাপবে না। আপনার সাহস আছে, আপনি ছাপেন।

কোন খবরের কথা বলছেন?

উদোর পিণ্ডি নিয়ে একটা খবর পড়লাম।

না জেনে ছাপাই নাই। জেনে ছাপায়েছি।

তাই তো করা উচিত। কেউ আপনাকে বলল, চিলে আপনার কান নিয়ে গেছে। আপনি কানে হাত না দিয়েই *ময়মনসিংহ বার্তায়* লিখলেন, একটা বড় চিল, *ময়মনসিংহ বার্তার* সম্পাদকের কান নিয়া আকাশে উড়িয়া গেছে। সেটা কি ঠিক?

নারায়ণ চক্রবর্তী অস্বস্তি নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁর চোখ পিটপিট করছে। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমাকে একজন এই খবরটা দিয়েছে।

একজনটা কে?

সম্পাদকের নীতিমালায় খবরের সোর্স বলা যায় না।

আপনি যে বিরাট নীতিবাগিশ লোক সেটা জানা ছিল না। দেশ থেকে নীতি উঠে গেছে। আপনার মধ্যে আছে। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আচ্ছা আপনি যান। আপনার সঙ্গে কথা শেষ।

নারায়ণ চক্রবর্তী বললেন, আমাকে কী জন্যে ডেকেছেন তা পরিষ্কার বুঝলাম না।

যথাসময়ে বুঝবেন। যে হাজি সাহেবের মামলা নিয়ে সংবাদ ছেপেছেন তিনি যখন কুড়ি লাখ টাকার মানহানির মামলা করবেন তখন বুঝবেন। টাকাপয়সা কি আছে?

আমি দরিদ্র মানুষ।

একটা প্রেস আছে, দরিদ্র হবেন কেন? প্রেস বেচে দিবেন। ইন্ডিয়াতেও নিশ্চয়ই বিষয়সম্পত্তি করেছেন। বসতবাটি আছে না?

জল খাব।

অবশ্যই জল খাবেন। মুসলমান বাড়িতে এসেছেন বলে আপনাকে পানি খাওয়ায়ে দিব তা না। প্রণব, উনাকে কাঁসার গ্লাসে জল দাও।

নারায়ণ চক্রবর্তী ভীত গলায় বললেন, খবরটা যদি ভুল হয় রিজয়েন্ডার দিলে ছাপায়ে দিব।

হাবীব বললেন, জয়েন্ডার রিজয়েন্ডার কিছু কেউ দিবে না। গায়ের চামড়া রক্ষার জন্যে নিজেই যা করার করবেন। দেশরক্ষা আইনে যারা গ্রেফতার হচ্ছে তারা সবাই হিন্দু। এই বিষয়টাও খেয়াল রাখবেন। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' এই বাগধারা কি শুনেছেন?

শুনেছি।

'ছেলে বোবা কালা, বাপ নাম রেখেছে তর্কবাগিশ'—এটা শুনেছেন?

না।

আপনার পত্রিকা বোবা কালা, আপনি নাম রেখেছেন তর্কবাগিশ। কাজটা ঠিক হয় নাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর করব না। আপনি জল খেয়ে চলে যান। ওসি সাহেব আসবেন, তার সঙ্গে জরুরি আলোচনা। আপনার বিষয়েই আলোচনা।

আমার বিষয়ে কী আলোচনা?

পুলিশ একটা হত্যা মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে। মামলা শেষ পর্যায়ে, এখন আপনি উল্টাগীত গাইছেন। পুলিশ কি বিষয়টা সহজভাবে নিবে?

যে-কোনো ভুলেরই সংশোধন আছে।

সংশোধনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে দেন। হাতে সময় বেশি নাই।

ওসি সাহেব রাত ন'টায় এলেন। তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে হাবীব মিটিং করলেন। খাওয়াদাওয়া করে ওসি সাহেব সাড়ে দশটার দিকে চলে গেলেন। ভোর তিনটায় *ময়মনসিংহ বার্তা* সম্পাদক গ্রেফতার হলেন দেশরক্ষা আইনে। *ময়মনসিংহ বার্তা* বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

মফস্বল শহরের ছোট্ট একটা পত্রিকার বাজেয়াপ্তের খবর কোথাও উঠল না। নারায়ণ চক্রবর্তী জেলহাজতে বসেই খবর পেলেন, তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর কিশোরী কন্যা সীতাকে নিয়ে গেছে। সীতার বয়স চৌদ্দ। সে এই বছরই এসএসসি পরীক্ষা দিবে।

সীতা অপহরণের খবর *ইত্তেফাক* পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছাপা হলো। মওলানা ভাসানী বগুড়ার এক জনসভায় সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে সীতার অপহরণের প্রসঙ্গ তুললেন।

ফরিদের মামলা আবার কোর্টে উঠেছে। হাবীব কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে দোতলা থেকে নামতেই প্রণব ছুটে হাবীবের হাত থেকে ব্রিফকেইস নিতে নিতে বলল, আপনার কাছে আমার একটা আবদার।

হাবীব বললেন, বলো কী আবদার ?

আবদার রক্ষা করলে সারা জীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

হাবীব বললেন, কেনা গোলাম তো হয়েই আছ। নতুন কেনা গোলাম কীভাবে হবে ?

প্রণব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, তাও ঠিক।

আবদারটা কী বলো।

নারায়ণ চক্রবর্তীর মেয়ে সীতাকে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা যদি আপনি করেন। মেয়েটাকে আমি দেখেছি। ফাংশানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। পরীর মতো মেয়ে, কিন্নর কণ্ঠ।

হাবীব বললেন, তোমার কথায় যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছি। তোমার কি ধারণা ডাকাতি আমি করিয়েছি ?

না না, ছিঃ ছিঃ কী বলেন!

তাহলে মেয়েটাকে উদ্ধার করব কীভাবে ?

আপনি যদি একটু ওসি সাহেবকে বলে দেন। পুলিশের পক্ষে এটা কোনো বিষয়ই না। সব অপরাধীর সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ।

হাবীব বললেন, সুযোগমতো বলব।

প্রণব হঠাৎ হাবীবকে চমকে দিয়ে মেঝেতে বসে দু'হাতে তার পা চেপে ধরল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্যার মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিন। স্যার স্যার গো...

হাবীব বললেন, ভালো বিপদে পড়লাম তো।

প্রণব বললেন, আপনি স্বীকার না করা পর্যন্ত আপনার পা আমি ছাড়ব না। ভগবান সাক্ষী, আমি ছাড়ব না।

বিদ্যুত কান্তি দে'র বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার চাকরিটা চলে গেছে। বৈধভাবেই গিয়েছে। সে ছিল লিভ ভ্যাকেনসিতে। যার ছুটির কারণে বিদ্যুত চাকরি পেয়েছে। তিনি Ph.D করে চাকরিতে জয়েন করেছেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, বিদ্যুত, ভেরি সরি। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট একজন শিক্ষককে আমরা রাখতে পারছি না।

বিদ্যুত বলল, আমি হিন্দু এই কারণে রাখতে পারছেন না।

এই ধরনের কথা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন জানো।

বিদ্যুত বলল, লিভ ভ্যাকেন্সিতে আমরা তিনজন ছিলাম। দু'জন মুসলমান একজন হিন্দু। চাকরি শুধু হিন্দুটার গেছে। যদিও সেই হিন্দু মালাউনের একাডেমিক কেরিয়ার সবচেয়ে ভালো। সে অনার্সেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, আবার এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে।

বিদ্যুত, তুমি উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলছ।

স্যার, আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন। আমার কণ্ঠস্বর এবং মাথা সবসময় নিচু রাখতে হবে।

তুমি আরও কিছু বলবে, নাকি কথা শেষ?

যাবার আগে আপনাকে প্রণাম করে একটা কথা শুধু বলব।

প্রণামের প্রয়োজন নাই—কী কথা বলতে চাও বলো।

বিদ্যুত প্রণাম করতে করতে বলল, আমরা প্রয়োজনের কাজের চেয়ে অপ্রয়োজনের কাজ বেশি করি। যাই হোক, কথাটা বলি। স্যার, পাথরে ঘুণ ধরে না।

তার মানে কী?

আপনি পচা কাঠ। পাথর না, তাই ঘুণ ধরেছে। আমি পাথর। ঘুণ আমাকে ধরবে না।

নরসিংদীর এক গ্রাম, নয়নাতলা।

বিদ্যুত মাথা নিচু করে তার বাড়ির উঠানে বসে আছেন। টিনের বাড়ি। নতুন টিন লাগানোয় ঝকঝক করছে। বাড়ির উত্তরে কুয়া কাটানো হয়েছে। কুয়ায় পানি ওঠেনি, তারপরের কুয়াতলা বাঁধানো। বাড়ির পেছনে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। টিউবওয়েলের পানি মিষ্টি।

সবই করেছে বিদ্যুত। বেতনের টাকার প্রায় সবটাই বাড়ির পেছনে চলে গেছে। এখন সে নিঃস্ব। বাড়িতে আসার খরচ জোগাড় করার জন্যে সে হাতঘড়ি এবং *লেকচারস অব ফাইনম্যান* বই বিক্রি করেছে।

সময় দুপুর। বিদ্যুৎ রোদে পিঠ মেলে বসে আছে। রোদে গা চিড়বিড় করছে, সে নড়ছে না। বিদ্যুতের মা সরলা দরজা ধরে দাঁড়ালেন। মানুষটা ছোটখাটো। চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। সরলা বললেন, বাবা তোর হাত কি খালি?

বিদ্যুৎ হ্যাঁ--সূচক মাথা নাড়ল।

বড় মাছের একটা টুকরা ভেজে দেই, খা।

মাছ কোথায় পেয়েছ?

সরলা জবাব দিলেন না। বিদ্যুৎ বলল, বাবার পুরানা অভ্যাস যায় নাই?

সরলা বললেন, না।

বাবা কই?

জানি না। মনে হয় মেতোকাজের হাটে গেছে। আজ হাটবার।

মা, ঘরে কি লেখার কাগজ--কলম আছে?

কলম আছে। কাগজ নাই।

বিদ্যুৎ বলল, ঠিক আছে লাগবে না।

সরলা বললেন, আমার কাছে একটা স্বর্ণের চেইন আছে নিয়া যা, স্বর্ণকারের দোকানে বেইচা দিয়া কাগজ কিন্যা আন।

কাগজ লাগবে না।

বাবা একটা কথা বলি, রাখবি?

রাখার মত কথা হলে রাখব। অন্যায় কথা রাখব না।

অন্যায় কথা না। বাস্তব কথা। চল ইন্ডিয়া চলে যাই।

নিজের দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

ইন্ডিয়ায় গেলে তুই সহজে চাকরি পাবি।

চাকরি আমি এখানেই পাব। দেশজুড়ে আন্দোলনের কারনে সব বন্ধ। আন্দোলন একটু কমুক। চাকরি না পেলেও চলবে।

কীভাবে চলবে?

মা, আমার অনেক বুদ্ধি। বুদ্ধি বেঁচে টাকা জোগাড় করব।

বুদ্ধি কার কাছে বেচবি?

যার বুদ্ধি নাই তার কাছে।

সরলা বললেন, আমার কাছে বেচ, আমার বুদ্ধি নাই।

বলতে বলতে সরলা হাসলেন, বিদ্যুৎ হাসল।

বিদ্যুতের বাবা হরি সেতাবগঞ্জের হাটে একটা ছাগলের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পুরুষ্ট ছাগল, ভালো দাম পাওয়ার কথা। হরি অল্পদামেই ছাগল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। কুড়ি টাকা পেলেই তিনি ছেড়ে দিবেন।

ছাগলটা তাঁর না। হাঁটে আসার পথে এক বেগুনক্ষেত থেকে তিনি ধরেছেন। ছাগলের মালিকের এই হাটে আসার সম্ভাবনা আছে। তবে সে তার ছাগল দেখে চিনতে পারবে না। ছাগলের দাড়ি তিনি কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কেটে দিয়েছেন। ছাগলের মুখের কাছের সাদা রঙ কালো জুতার কালি ঘষে কালো করেছেন। এইসব সরঞ্জাম সবসময় তার সঙ্গেই থাকে।

মাছ ধরায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। গভীর রাতে জাল ফেলে অন্যের পুকুরের মাছ। বিষয়টাকে তিনি চুরি হিসেবে দেখেন না। অন্যের আছে তার নাই। যার আছে তার ধনের ওপর যার নাই তার কিছু অধিকার থাকবেই।

বিদ্যুত মাস্টারি পাওয়ার পর তিনি গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করেছেন। ছেলে মানিঅর্ডারে ভালো টাকা পাঠাচ্ছে। মাছ চুরি, ছাগল চুরির প্রয়োজন কী? ঝিম ধরে বাড়ির উঠানের কাঁঠালগাছের নিচে বসে মন্ত্র জপ করা।

কিছুদিনের মধ্যেই মন্ত্রের ওপর তার ঘেন্না ধরে গেল। রাতে ঘুম হয় না। খাওয়াদাওয়ায় রুচি নাই।

তারপর এক মাঝরাতে বছির মাতবরের গোয়াল থেকে মাঝারি সাইজের এক বলদ নিয়ে হাঁটা দিলেন। সারা রাত হাঁটলেন। কী উত্তেজনার হাঁটা। বুকের ভেতর গুড়গুড় করছে। কেউ যদি দেখে ফেলে সে আতঙ্ক আছে, আবার সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার রোমাঞ্চও আছে। আতঙ্ক, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা—এর নামই তো জীবন।

তিনি ভোরবেলা নীলগঞ্জ বাজারে পৌঁছলেন। কসাইয়ের কাছে পঁচাত্তর টাকায় বলদটি বিক্রি করলেন।

ছাগল পনেরো টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। হরি চাল-ডাল কিনলেন। ছেলে মাংস পছন্দ করে। এক পোয়া খাসির মাংস কিনলেন। ছেলেটা ঝামেলায় পড়েছে, চাকরি চলে গেছে। একবেলা আরাম করে খাক। তিনি পোলায়ের চাল এবং ঘি কিনলেন। আজ রাতে পোলাও-মাংস হোক। বাপ-বেটা আরাম করে খাবে। সংসার আর কয়দিনের?

এই আসছি এই নাই
দুই দিনের খাই খাই॥

বিদ্যুত উঠানে চক্রাকারে হাঁটছে। মাঝখানে হারিকেন জ্বলছে। সরলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের কাণ্ড দেখছেন। তাঁর ছেলেটা এরকম কেন?

সরলা বললেন, বাবা চা খাবি?

না।

বাবা এরকম করছিস কেন?

একটা ছোট্ট পরীক্ষা করলাম।

কী পরীক্ষা?

তুমি বুঝবে না।

বলে দেখ। বুঝতেও তো পারি।

আমি পরীক্ষা করে বের করলাম, যারা লেফট হ্যান্ডার তারা Anticlokwise দ্রুত ঘুরতে পারে। রাইট হ্যান্ডারা দ্রুত ঘুরে Clokwise। কিছু বুঝেছ?

সরলা হতাশ গলায় বললেন, বুঝেছি।

বিদ্যুত হো হো করে হাসছে। সরলা মুগ্ধ হয়ে ছেলের হাসি দেখছেন।

শ্রাবণ মাস।

হাসান রাজা চৌধুরী ভাটিপাড়া বাড়ির ছাদে অনেকক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছে মূর্তির মতো। তার দৃষ্টি হাওরের দিকে। বিস্তীর্ণ হাওর। বড় বড় ঢেউ উঠছে। অনেক দূরে ছোট্ট একটা নৌকা। নৌকা খুব দুলছে। সন্ধ্যার দিকে হাওয়া জোরালো হয়। সমুদ্রের মতো বড় ঢেউ ওঠে।

হাসানকে ঘিরে অসংখ্য পায়রা। এরা এখন আর উড়ছে না। সন্ধ্যার পর পায়রা আকাশে উড়ে না। বাকবাকুম শব্দও করে না। এরা কীভাবে যেন টের পেয়ে গেছে যে সন্ধ্যা অতি রহস্যময় এক সময়।

ছোট সাব, আজান হয়েছে।

হাসান চমকে তাকাল। জায়নামাজ বগলে নিয়ে বারেক দাঁড়িয়ে আছে। বারেকের বয়স বারো। তাকে হাসানের ফুটফরমাস করার জন্যে রাখা হয়েছে। তার মুখের ভাষায় সিলেটের আঞ্চলিকতা নেই। সুন্দর শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। কাজেকর্মে দক্ষ। সবচেয়ে বড় কথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা মেয়েলি। ঘাঁটুগানের দল থেকে তাকে আনা হয়েছে। আশেপাশে কেউ না থাকলে সে গুনগুন করে গানে টান দেয়।

যমুনার জল দেখতে কালো
ছান করিতে লাগে ভালো
যৌবন মিশিয়া গেছে জলে...

হাসান বলল, আমার অজু নাই। নামাজ পড়ব না।

অজুর পানি কি দিব ?

না।

ছোট সাব, কী দেখেন ?

নৌকাটা দেখি। অনেকক্ষণ এক জায়গায় আছে। বাতাসের কারণে আসতে পারছে না।

চেয়ার এনে দিব ? বসবেন ?

না।

বারেক চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ছাদে উপস্থিত হলো। তার মাথায় কাঠের চেয়ার। হাতে এক নলের দুরবিন। এই বাড়িতে দু'টা দুরবিন আছে। ঝড়বৃষ্টির সময় দুরবিনে দূরের বিপদগ্রস্ত নৌকা দেখা যায়। তখন সাহায্যের জন্যে এ বাড়ি থেকে নৌকা যায়।

হাসান চেয়ারে বসেছে। হাতে দুরবিন নিয়ে নৌকা দেখছে। বিপদগ্রস্ত কোনো নৌকা না। নৌকার মাঝি ছেলেকে নিয়ে মাছ মারতে বের হয়েছে। ছিপ ফেলেছে। হাসান বলল, সন্ধ্যাবেলায় কি মাছ আধার খায়?

বারেক বলল, সব মাছে খায় না। বোয়াল মাছে খায়। বোয়ালের পেটে ক্ষিধা বেশি। তার বুদ্ধিও কম।

মাছের মধ্যে বুদ্ধি বেশি কার?

খইলসা মাছের। খুইলসা মাছ ধরা কঠিন। ছোট সাব, চা খাবেন? চা এনে দিব?

না।

বারেক চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিশাল এক কাপ ভর্তি চা নিয়ে উপস্থিত হলো। বারেক সব কাজ নিজের মতো করে। হাসান চা খেতে চায়নি, এটাকে সে গুরুত্ব দেয়নি। তার মনে হয়েছে এই সময় চা খেতে ছোট সাহেবের ভালো লাগবে। সে চা নিয়ে এসেছে।

বারেক, লেখাপড়া জানো?

জে-না।

শিখতে চাও?

না।

কেন না?

আমার দাদাজানের নিষেধ আছে। তিনি খোয়াবে পেয়েছেন—লেখাপড়া শিখলে আমার প্যানিতে ডুবে মৃত্যু হবে।

সাঁতার জানো?

জানি।

ভালো জানো?

জানি।

এইখান থেকে সাঁতার দিয়ে নৌকা পর্যন্ত যেতে পারবে?

পারব।

ভালো করে চিন্তা করে বলো। অনেকখানি দূর।

পারব। সময় লাগবে, কিন্তু পারব।

হাসান হাত থেকে দুরবিন নামিয়ে বলল, আচ্ছা যাও।

সত্যি যাব?

হ্যাঁ, সত্যি যাবে। তোমাকে সাঁতার দিয়ে নৌকা পর্যন্ত যেতে বলেছি, তার কারণ আছে। কারণটা পরে বলব।

হাসান চায়ের কাপে চুমুক দিল। তার দৃষ্টি আকাশে। সূর্য পশ্চিমে ডুবছে, কিন্তু লাল হয়ে আছে পুবের আকাশ। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। মানুষের চারদিকে সবসময় আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে। খুব কম মানুষই তা নজর করে।

হাওরের ঘাট থেকে বারেক সাঁতার দিতে শুরু করেছে। তার গা খালি, পরনে সাদা প্যান্ট। সাদা রঙের কারণে দূর থেকে প্যান্টটা দেখা যাচ্ছে। হাসান চোখে দুরবিন লাগিয়ে সাঁতারুর অগ্রযাত্রা লক্ষ রাখছে। বারেক এগুচ্ছে খুব সহজ ভঙ্গিতে। তার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া নেই।

মাগরেবের নামাজ শেষ করে হাসানের বাবা হাজি সাহেব বিছানায় চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছের বড় জানালাটা খোলা। জানালায় পর্দা নেই। হাওরের হাওয়া হু-হু করে ঢুকছে। তাঁর শীত করছে। জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। ঘরে হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের আলো চোখে লাগছে। সন্ধ্যাবেলা ঘর অন্ধকার করে রাখতে নেই বলেই হারিকেন জ্বলছে। একতলায় গানবাজনা হচ্ছে। গানের আওয়াজও তাঁর কানে লাগছে। অসুস্থ অবস্থায় কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তিনি ইচ্ছা করলেই কাউকে ডেকে গান বন্ধ করার কথা বলতে পারেন। তা তিনি বলছেন না। এই বাড়িতে কিছুদিন আগেই বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সবকিছু আগের মতো করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা বন্ধ করা উচিত না।

হাজি সাহেব গানের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। গায়কের গলা শ্লেষ্মামাখা। কোনো কিছুই পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। খোল-করতাল এবং হারমোনিয়ামের বাদ্যই প্রবলভাবে শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ গায়ক গাইছেন—

ও সুন্দর গৌরারে পিয়ারি মনচোরারে
প্রেমভাবে নাচে গৌরা ও পিয়ারি মনচোরারে
যাইতে যমুনার জলে
ও দেইখে পাইলাম প্রাণবন্ধুরে
আচানক চটক লাগলরে
আমি নারীর চিত্ত বাউরা
ও পিয়ারি মনচোরারে।

হাজি সাহেবের খাস লোক সুলতান ঢুকল। তার হাতে ফরসি হুক্কা। তামাকের গন্ধ হাজি সাহেবের ভালো লাগছে। অসুস্থ অবস্থায় তামাকের গন্ধ ভালো লাগার কথা না। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। হাজি সাহেব বিছানায় উঠে বসে হুক্কার নল হাতে নিলেন। একটা টান দিতেই শরীর গুলিয়ে উঠল। তিনি নল পাশে রেখে দিলেন।

সুলতান বলল, আপনার শরীরটা কি খারাপ?

হাজি সাহেব হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

সুলতান বলল, ছোট সাহেব একটা পত্র লিখেছেন। পত্রটা আমার হাতে দিয়েছেন যেন পৌঁছানোর ব্যবস্থা করি।

হাজি সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, পত্র কাকে দিয়েছে?

ময়মনসিংহের উকিল সাহেবের মেয়েকে। তার নাম নাদিয়া। পত্রটা কি পড়ে দেখবেন?

হাজি সাহেব হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। সুলতান ফতুয়ার পকেট থেকে খামবন্ধ চিঠি বের করে হাজি সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বলল, রাতে কী খাবেন?

হাজি সাহেব বললেন, রাতে কিছু খাব না। একগ্লাস চিড়া ভিজা পানি আর পেঁপে। তুমি দরজা বন্ধ করে চলে যাও। গান কানে লাগতেছে।

শরীরে হাত দিয়া দেখব জ্বর কেমন?

দেখো।

সুলতান কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখল। সে খানিকটা হকচকিয়ে গেল। হাজি সাহেবের গায়ে অনেক জ্বর। জ্বর যে এত বেশি তা তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

একজন ডাক্তার কি খবর দিব?

না। তুমি এখন ঘর থেকে যাও। আমি না ডাকলে আসবা না।

হাজি সাহেব চিঠি হাতে নিলেন। তাঁর পুত্র উকিল সাহেবের মেয়েকে চিঠি লিখতে পারে—এটা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না।

হাসান লিখেছে—

> নাদিয়া,
>
> আমি হঠাৎ করে চলে এসেছি বলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি নাই। তাছাড়া আপনি অসুস্থও ছিলেন। আশা করি এখন সুস্থ হয়েছেন। আপনার ভূত দেখা রহস্যের যে সমাধান আপনার শিক্ষক বিদ্যুত বাবু করেছেন তাতে

আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি আমার মুগ্ধতা কখনোই ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারি না। উনার কাছেও প্রকাশ করতে পারি নাই। আপনি দয়া করে আমার মুগ্ধতা তাকে জানাবেন।

আপনি আমাকে যে দড়ির ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন, আমি সেই রহস্য ভেদ করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। আমার খুব ইচ্ছা আপনাকে ম্যাজিকটা দেখাব।

আমাদের ভাটি অঞ্চলে বর্ষাকালে নৌকায় বেদেরা আলতা-চুড়ি বিক্রি করতে আসে। তারা সাপের খেলা দেখায় এবং অদ্ভুত সব ম্যাজিক দেখায়। আমি ঠিক করেছি তাদের কাছ থেকে কিছু ম্যাজিক শিখে আপনাকে দেখাব। এবং আপনাকে শিখিয়ে দিব।

আমি যে আমাদের বাড়িতে আপনাকে আসার জন্যে দাওয়াত করেছি তা কি মনে আছে ? কষ্ট করে যদি একবার আসেন তাহলে আনন্দ পাবেন।

এখানে আমি মোটামুটি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছি। বই পড়ার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত। কারণ এখানে কোনো বই নাই। ঢাকা বা ময়মনসিংহ থেকে প্রচুর বইপত্র যে কিনব তাও সম্ভব না। কারণ বিশেষ কারণে আমি গৃহবন্দি। গৃহবন্দির কারণটি কোনো একদিন আমি আপনাকে বলব।

ইতি

হাসান রাজা চৌধুরী

ভাটিপাড়া, কইতরবাড়ি।

চিঠি শেষ করে হাজি সাহেব সুলতানকে ডাকলেন। নিচুগলায় বললেন, এই চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন নাই। চিঠি নষ্ট করে ফেলবে এবং ছোট সাহেবকে বলবে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সুলতান বলল, জি আচ্ছা।

চিঠি চালাচালির বিষয় উকিল সাহেব জানলে বেজায় রাগ হবেন।

জি হবেন। রাগ হওয়ার কথা।

হাজি সাহেব বললেন, চিঠি এখনই পুড়িয়ে ফেলো। আর রাশেদাকে খবর দাও, তার সঙ্গে আমার জরুরি আলাপ আছে। সে যেন এক-দুই দিনের ভেতর চলে আসে। রাশেদার মেয়েটার নাম কী ?

রেশমা।

সে কি বিবাহযোগ্য হয়েছে?

মনে হয়।

রাশেদাকে বলবে সে যেন তার মেয়েকে নিয়ে আসে।

জি আচ্ছা।

এখন বিদায় হও।

হাসান যে মামাকে খুন করেছে, রাশেদা তাঁরই স্ত্রী। হাজি সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাশেদার মেয়ের সঙ্গে হাসানের বিয়ে দিবেন। যে অন্যায় হয়েছে তার কিছুটা প্রতিকার হবে। রাশেদা এতে আপত্তি করবে এরকম মনে হয় না। রাশেদা হাসানকে অত্যন্ত পছন্দ করে।

বারেক ফিরে এসেছে। মাথা নিচু করে হাসানের ঘরে বসে আছে। সে খানিকটা লজ্জিত। কারণ সাঁতরে তাকে নৌকা পর্যন্ত যেতে হয়নি। নৌকার মাঝি তাকে দেখতে পেয়ে নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে পানি থেকে টেনে তুলেছে।

হাসান আধশোয়া হয়ে খাটে বসে আছে। রাতের খাবারের ডাক এসেছে। সে জানিয়েছে খাবে না। ক্ষিধে নেই। সে উকিল সাহেবের বাড়ির প্রণব বাবুর মতো একবেলা খাওয়ার চেষ্টায় আছে। চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। গভীর রাতে ক্ষুধা হচ্ছে। তখন বারেককে পাঠিয়ে খাবার আনাচ্ছে।

বারেক!

জি ছোট সাব।

তুমি তো সাঁতার খুব ভালো জানো। সাঁতরে অনেক দূর গিয়েছিলে।

বারেক চুপ করে রইল। মাথা তুলল না। হাসান বলল, পানিতে ডুবে মরার সম্ভাবনা তোমার খুবই কম। কাজেই পড়াশোনা করবে। আমি বই-খাতার ব্যবস্থা করব। ঠিক আছে?

বারেক জবাব দিল না।

হাসান বলল, মূর্খ মানুষ আর গরু ছাগলের মধ্যে কোনো তফাত নাই। গরু-ছাগলও পড়তে পারে না। এখন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও। আমার হাতে এটা কী?

দড়ি।

তাকিয়ে থাকো। দেখো আমি কী করি। দড়িটা কাচি দিয়ে মাঝখানে কাটলাম। এখন আমি ফুঁ দিব। ফুঁ দিলেই দড়ি জোড়া লেগে যাবে। তাকিয়ে থাকো।

বারেক তাকিয়ে থাকল। দড়ি জোড়া লাগানো দেখল। দেখে চমৎকৃত হলো এরকম মনে হলো না। হাসান বলল, কীভাবে হয়েছে বলো তো।

বারেক বলল, মন্ত্র দিয়া করছেন।

হাসান বলল, ঠিক বলেছ। মন্ত্র দিয়ে করেছি। লেখাপড়াও মন্ত্র। লেখাপড়া মন্ত্র দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। বুঝেছ?

বুঝেছি।

প্রতিদিন তোমাকে একটা করে অক্ষর শিখাব। আজ থেকে শুরু। বলো 'ক'।

বারেক ভীত গলায় বলল, ক।

হাসান কাগজে ক লিখল। বারেকের হাতে কাগজটা দিয়ে বলল, এই কাগজটা সঙ্গে রাখবে। মাঝে মাঝে কাগজটার দিকে তাকাবে আর বলবে 'ক'। মনে মনে বলবে না। শব্দ করে বলবে।

আচ্ছা।

টেবিলের উপর একটা বই আছে, বইটা হাতে নাও। বইয়ে যে কয়টা ক পাবে প্রত্যেকটা কলম দিয়ে কাটবে। কীভাবে কাটবে দেখিয়ে দিচ্ছি। বইটা দাও আর কলম দাও।

হাসান একটা ক কেটে দেখাল। আর তখন সুলতান এসে বলল, বড় সাব ডাকেন। হাসান উঠে দাঁড়াল। সুলতান বলল, বড় সাবের শরীর ভালো না। বেজায় জ্বর আসছে।

হাসান কাঁচি এবং দড়ি হাতে নিল। হঠাৎ করেই তার ইচ্ছা করছে বাবাকে সে এই ম্যাজিকটা দেখাবে।

হাজি সাহেব খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। হাতে হুক্কার নল। তিনি নল মুখে দিচ্ছেন না। খাটের পাশে চেয়ার রাখা। হাসানকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি চোখ মেললেন। ছেলেকে ইশারায় বসতে বললেন। হাসান বসল।

হাজি সাহেব বললেন, প্রায়ই শুনি তুমি রাতে খানা খাও না। রাতে খানা না খেলে শরীর থেকে এক চড়ুই পাখির রক্ত কমে। রাতে খানা অবশ্যই খাবে।

হাসান জবাব দিল না।

হাজি সাহেব বললেন, তোমাকে অতি জরুরি একটা বিষয় বলার জন্যে ডেকেছি। মন দিয়ে শোনো। তোমার হাতে দড়ি কী জন্যে?

আপনাকে দড়ি কাটার একটা ম্যাজিক দেখাব।

হাজি সাহেব বললেন, ম্যাজিক দেখানো বেদে-বেদেনির কাজ। তোমার কাজ না। বুঝেছ?

জি।

জরুরি কথাটা এখন বলি। অপরাধ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তুমি একটা বড় অপরাধ করেছ। এখন প্রায়শ্চিত্ত করবা।

কীভাবে?

তোমার মামাতো বোন রেশমাকে তুমি বিবাহ করবা। এটা আমার হুকুম।

রেশমাকে বিবাহ করব?

হুঁ। তার গায়ের রঙ শ্যামলা। শ্যামলা গাত্রবর্ণের মেয়েদের মন হয় ফর্সা।

হাসান বলল, এই মেয়ে সারাক্ষণ জানবে আমি তার বাবাকে খুন করেছি। এটা কি তার জন্যে ভালো হবে?

হাজি সাহেব বললেন, তুমি তোমার ভালো চিন্তা করবে। তার ভালো চিন্তা করার প্রয়োজন তোমার নাই। এখন দড়ি দিয়ে কী ম্যাজিক দেখাতে চেয়েছ দেখাও।

হাসান দড়ি কেটে জোড়া লাগাল। হাজি সাহেব বিস্মিত হলেন। নিজের অজান্তেই বললেন, সোবাহানআল্লাহ!

হাসান বলল, আপনি কি আরও কিছু বলবেন? আর কিছু না বললে আমি উঠব।

হাজি সাহেব বললেন, ম্যাজিকটা আরেকবার দেখাও।

হাসান বলল, কোনো ম্যাজিক দুইবার দেখানো যায় না।

হাজি সাহেব বললেন, আমি দেখাতে বললাম তুমি দেখাও।

হাসান কঠিন গলায় বলল, না।

হাজি সাহেব বললেন, তুমি আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছ।

হাসান বলল, আপনি অন্যায় আবদার করা শুরু করেছেন। এটা উচিত না।

হাজি সাহেব বললেন, আমাকে তুমি উচিত অনুচিত শেখাও? আমি তোমার জন্মদাতা পিতা।

হাসান উঠে দাঁড়াল। হাজি সাহেব বললেন, উঠে দাঁড়িয়েছ কী জন্যে? বসো। আমার কথা শেষ হয় নাই।

হাসান বসল না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হাজি সাহেব হুক্কার নল মুখে নিয়ে টানতে লাগলেন। অসুস্থ শরীরে তামাকের গন্ধ অসহনীয় লাগছে, তারপরেও

তিনি ফুসফুস ভর্তি করে ধোঁয়া নিচ্ছেন। তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সামান্য শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, সুলতান! সুলতান!

সুলতান খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। হাজি সাহেব বললেন, হাসান আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। বিরাট বেয়াদবি।

সুলতান বিড়বিড় করে বলল, বয়স কম।

হাজি সাহেব বললেন, বেয়াদবি বয়স কমের কারণে করে নাই। বিকারের কারণে করেছে। বিকার মাথায় উঠে গেলে মানুষ বেয়াদবি করে, খুন খারাপি করে। বুঝেছ?

জি।

বিকার নামানোর অনেক বুদ্ধি আছে। পাখি শিকার, জীবজন্তু শিকার। রক্ত দর্শনে বিকার কমে। আবার যৌনকর্মেও বিকার কমে। এইজন্যেই কিছুদিনের জন্যে হলেও ঘাঁটুপুত্র রাখা দোষের না। বুঝেছ?

জি।

বারেক নামের ছেলেটা ঘাঁটু দলের না?

জি।

তোমার ছোট সাহেব কি তাকে ব্যবহার করে?

না।

জেনে না বললা, না-কি অনুমানে বললা?

অনুমানে বলেছি। ছোট সাহেব অন্য ধাঁচের মানুষ। ভালো মানুষ।

ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ বিবেচনার মতো বুদ্ধি তোমার নাই।

জি, ঠিক বলেছেন।

উত্তরের দালানের যে বড় ঘরটা আছে, তার সঙ্গে টাট্টিখানা কি আছে?

আছে।

হাজি সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার ছোট সাহেবকে উত্তরের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখো। খানা দিবা জানালা দিয়া। আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তালা খুলবা না। এটা বেয়াদবির শাস্তি।

জি আচ্ছা।

সামনে থেকে যাও। যা করতে বলছি করো।

আপনার জ্বর কি আরেকবার দেখব?

দেখো।

সুলতান কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বর আরও বেড়েছে।

হাজি সাহেব বললেন, জ্বর বেড়েছে, কমবে। ব্যস্ত হবার কিছু নাই।

সুলতান বলল, জ্বরের ঘোরে ছোট সাহেবের শাস্তির বিধান দিয়েছেন। জ্বর অবস্থায় বিধান দেওয়া ঠিক না।

হাজি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাকে যা করতে বলেছি করো। আমাকে বিধান শিখাবা না।

হাসানকে উত্তরের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে তা নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করছে না। উত্তরের ঘরের একটা জানালা দিয়ে হাওর দেখা যায়। সে বেশিরভাগ সময় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাওর দেখে। বাকি সময়টা ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত হাঁটে। খাটের চারপাশে চক্রাকারে ঘোরে। প্রতি সন্ধ্যায় একটা খাতায় কী যেন লেখে। খাতাটার সে একটা নাম দিয়েছে—'মাতাল হাওয়া'। হাওরের উথালপাথাল হাওয়ার কারণেই মনে হয় এমন নাম।

বারেক তার ঘরের বাইরে সারাক্ষণ বসে থাকে। রাতে চাদর পেতে তালাবন্ধ দরজার সামনেই ঘুমায়। তিনটা অক্ষর তার শেখা হয়েছে। ক, খ, গ। ঘুমের ঘোরে সে বিড়বিড় করে—ক খ গ, ক খ গ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বজরায় করে হাসানের মামি রাশেদা কইতরবাড়িতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর সতেরো বছরের মেয়ে রেশমা। রেশমার মুখ গোলগাল। পাতলা ভুরু। নাক খানিকটা চাপা। শ্যামলা এই মেয়েটির চেহারায় অন্য এক ধরনের সৌন্দর্য যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তার চোখে চিরস্থায়ী বিষণ্ণতা।

হাজি সাহেব রাশেদাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাশেদা খাটের পাশে রাখা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। হাজি সাহেব বললেন, ভালো আছ রাশেদা?

রাশেদা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হাজি সাহেব বললেন, আমার ছেলের বিষয়টা কি ঠিকমতো জানো?

রাশেদা বললেন, কোন বিষয়?

খুন হাসান করে নাই, আমার খাস লোক ফরিদ খুন করেছে। সে পুলিশের হেফাজতে আছে। সব স্বীকার পেয়েছে।

রাশেদা বললেন, এইসব মিথ্যা কোর্টের জন্যে, আমার জন্যে না। খুন কে করেছে আপনি যেমন জানেন আমিও জানি।

মানুষের সব জানা ঠিক না। জানায় ভুল থাকে। সেই ভুল ঠিক করতে হয়।

এইটা বলার জন্যেই কি আপনি আমাকে আনায়েছেন?

তোমাকে একটা প্রস্তাব দিব বলে আনিয়েছি।

কী প্রস্তাব?

হাজি সাহেব শান্ত গলায় বললেন, একটা বিবাহের প্রস্তাব। আমি রেশমার সঙ্গে হাসানের বিবাহ দিতে চাই।

হতভম্ব রাশেদা বললেন, এইসব কী বলেন? আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন? উন্মাদও তো এরকম কথা বলবে না।

হাজি সাহেব নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলেন। রাশেদা বললেন, আপনার টাকাপয়সা আছে। ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। নিজে খুন করে সেই দোষ অন্যের ঘাড়ে ফেলতে পারেন। আপনার কাছে আমি এবং আমার মেয়ে তুচ্ছ। তারপরেও একটা খুনির সঙ্গে আমি মেয়ের বিবাহ দিব না।

হাজি সাহেব বললেন, ঠিক আছে।

আমি আপনার এইখানে থাকব না। চলে যাব। আজই যাব।

হাজি সাহেব বললেন, আমি তো জোর করে তোমার মেয়ের বিবাহ দিব না। আজই চলে যেতে হবে কেন?

আমি থাকব না। আমি চলে যাব।

হাজি সাহেব বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিলেন, এখন উঠে বসলেন। হুক্কার নল নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, এই বাড়ি থেকে তুমি যেতে পারবে না। মামলার রায় হওয়ার পরে যাবে। মামলা যেভাবে সাজানো হয়েছে, তুমি তাতে ঝামেলা করতে পারো। সেই সুযোগ তোমাকে আমি দিব না।

আমাকে আটকায়ে রাখবেন?

হ্যাঁ।

আমাকে আটকায়ে রাখার ক্ষমতা আপনার নাই।

হাজি সাহেব বললেন, গলা নামায়ে কথা বলো। তুমি উঁচুগলায় কথা বলছ। লোকজন শুনছে। এটা ঠিক না। মাথা ঠান্ডা করো। খাওয়াদাওয়া করো। তুমি আমার ছেলের শাশুড়ি হবা। তোমার এই বাড়িতে অনেক মর্যাদা।

রাশেদা বললেন, আপনি যত কিছুই করেন, আমার মেয়ে কোনোদিনই রাজি হবে না। এই জাতীয় কোনো প্রস্তাব তার কানে গেলে সে হাওরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আপনাকে আল্লার দোহাই লাগে এই ধরনের কোনো কথা যেন আমার মেয়ের কানে না যায়। এখন ইযাযত দেন আমি বিদায় হই।

ইযাযত দিলাম।

রাশেদা দ্রুত ঘর থেকে বের হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আজ রাতেই ফিরে যাবেন। ঘাটে বজরা বাঁধা আছে। ডিঙ্গাপুতার হাওর রাতে রাতে পাড়ি দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়া। কইতরবাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না। রাতে খাওয়াদাওয়া করে বজরায় উঠবেন। রেশমাকে এই মুহূর্তে কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজন নাই।

রাতের খাওয়ার সময় রেশমা তার মায়ের কানে ফিসফিস করে বলল, ঘটনা কী জানো মা? হাসান ভাইকে তালাবন্ধ করে রেখেছে।

রাখুক।

কী জন্যে তালাবন্ধ সেটা কেউ জানে না।

না জানুক। তুই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কর। আমরা আজ রাতেই ফিরব।

কেন? ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

বজরায় ঘুমাবি।

রাশেদা হাজি সাহেবের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বজরায় উঠলেন। বজরা ছেড়ে দিল। রেশমা ঘুমাচ্ছে। তিনি রেশমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন। নৌকার দুলুনিতে তাঁর গাঢ় ঘুম হলো।

ঘুম ভাঙল ফজরের আজানের শব্দে। তিনি বজরা থেকে বের হয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, বজরা কইতরবাড়ির ঘাটে বাঁধা। মাঝিরা কেউ নেই। তিনি স্তব্ধ হয়ে বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কইতরবাড়ির মসজিদ দেখা যাচ্ছে। মুসল্লিরা নামাজ পড়তে যাচ্ছে।

দোতলার উত্তরমুখী ঘরটা রাশেদাকে দেওয়া হয়েছে। তার স্যুটকেস, হোল্ডসল, এই ঘরে এনে রাখা হয়েছে। রাশেদা খাটের একপ্রান্তে হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। রেশমা জানালার শিক ধরে হাওরের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি বিশেষ দৃশ্য তাকে মোহিত করেছে। বিশাল বকের ঝাঁক হাওরের একটা বিশেষ জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে, ফিরে আসছে, আবার যাচ্ছে। ওই জায়গাটায় কী আছে তার জানতে ইচ্ছা করছে। রাশেদা বললেন, আমাদের আটক করেছে। বিষয়টা বুঝেছিস?

রেশমা মা'র দিকে না তাকিয়ে বলল, বুঝি নাই। তার দৃষ্টি বকের দিকে।

রাশেদা বললেন, কী জন্যে আটক করেছে জানতে চাস?

চাই।

কাছে আয় বলি।

রেশমা বলল, কাছে আসব না। তুমি বলো আমি শুনছি।

রাশেদা বললেন, এরা জোর করে খুনিটার সঙ্গে তোর বিবাহ দিতে চায়। তোর উপরে আদেশ—প্রয়োজনে ফাঁসিতে ঝুলবি, কবুল বলবি না।

রেশমা বলল, ফাঁসিতে ঝুলার মধ্যে আমি নাই মা।

খুনিটারে বিবাহ করবি?

কথায় কথায় খুনি বলবা না। শুনতে খারাপ লাগে।

খুনিরে সাধুপুরুষ বলব?

কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি খুনের পিছনে বিরাট ঘটনা আছে। ঘটনা জানলে হাসান ভাইরে ক্ষমা করা যাবে। একদিন আমি ঘটনা জানব।

কীভাবে জানবি?

রেশমা স্বাভাবিক গলায় বলল, বিবাহের পর উনারে জিজ্ঞাস করব। স্ত্রীর কথা উনি ফেলতে পারবেন না।

রাশেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুই কী বললি?

রেশমা বলল, তামাশা করলাম। তোমার মন মেজাজ ভালো না। এইজন্যেই তামাশা!

আর একবার যদি এমন তামাশা করস তোরে আমি জীবন্ত কবর দিব।

সকালের নাশতা চলে এসেছে। চালের আটার রুটি। ভুনা হাঁসের মাংস, পায়েস।

রাশেদা বললেন, সব নিয়া যাও। আমি কিছু মুখে দিব না। আমার মেয়েও মুখে দিবে না। এই বাড়িতে আমরা পানিও স্পর্শ করব না।

রেশমা বলল, আমার ভূখ লাগছে। আমি খাব। হাঁসের মাংস আমার প্রিয়।

রেশমা এখনো জানালা ধরে আছে। বক রহস্যের সমাধান হয়েছে। বকরা ঠোঁটে মাছ নিয়ে ফিরছে। এতক্ষণ হয়তো তারা ঝাঁক বেধে মাছ খুঁজছিল।

অক্টোবর মাস।

পনেরো তারিখ।

এনএসএফের কিছু পাণ্ডা তুমুল আড্ডায় বসেছে। চপ-কাটলেট এসেছে। কফি এসেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় কেবিন অন্ধকার। স্থান 'লিবার্টি কাফে'। কাফের কোনার দিকে শুকনো মুখে নির্মলেন্দু গুণ একা বসে আছেন। তিনি খানিকটা বিষণ্ণ। তার পকেট ধুপখোলার মাঠ। এক কাপ চা কিনবেন সেই উপায় নাই। নির্মলেন্দু গুণ কবিতা লেখা শুরু করেছেন, তবে কবি স্বীকৃতি তখনো পাননি। কবিতা নিয়ে তাকে শরীফ মিয়ার ক্যানটিনে আড্ডা দিতে দেখা যায়। সেই আড্ডায় কবিতা-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা থেকে উকুন বাছেন এবং সশব্দে উকুন ফোটান। তার পাশের লোকজনদের বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাস করেন, উকুন ফোটাবেন ? নেন আমার কাছ থেকে। কোনো অসুবিধা নাই। সাপ্লাই আছে। তখন তার বিষয়ে প্রচলিত ছড়াটা হলো—

নির্মলেন্দু গুণ
মাথায় উকুন।

লিবার্টি কাফেতে নির্মলেন্দু গুণ উকুন বাছা শুরু করেছেন। তার সামনে এক কাপ কফি। এবং একটা চিকেন কাটলেট। খাবারের দাম কীভাবে দেবেন—এই নিয়ে তার মধ্যে সামান্য শঙ্কা কাজ করছে। তবে তিনি প্রায় নিশ্চিত দুপুরের মধ্যে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কপাল ভালো থাকলে তার ওপর দিয়ে দুপুরের খাবারটা হয়ে যাবে। লিবার্টি কাফের মোরগপোলাও অসাধারণ।

নির্মলেন্দু গুণের মাথায় একটা কবিতার কয়েকটা লাইন চলে এসেছে। লাইনগুলি তাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিচ্ছে। লিখে ফেললে যন্ত্রণা কমত। সঙ্গে কাগজ-কলম না থাকায় যন্ত্রণা কমাতে পারছেন না।

কী মনে করে মাথার একটা উকুন তিনি কফির কাপে ফেলে দিলেন। কফি খেতে খেতে একটা উকুন কীভাবে মারা যায়, সম্ভবত এই দৃশ্য তার দেখতে ইচ্ছা করল। মাথার ভেতরের কবিতা এবং চুলে উকুন এই দুইয়ের যন্ত্রণায় তিনি

অস্থির। কবিতার প্রতিটি শব্দ আলাদা করা যাচ্ছে। উকুনগুলি আলাদা করা যাচ্ছে না। নির্মলেন্দু গুণ মনে মনে একের পর এক লাইন সাজাতে লাগলেন।

আমি যখন বাড়িতে পৌছলুম তখন দুপুর,
চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর—;
আমার শরীরে ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অতি বিখ্যাত কবিতাটির নাম 'হুলিয়া'। এই একটি কবিতাই তাঁর নামের আগে কবি শব্দটি চিরস্থায়ীভাবে বসিয়ে দিল।

কবি নির্মলেন্দু গুণের পাশের কেবিনে আলোচনা বন্ধ হয়েছে। এনএসএফের খোকা এসে সবাইকে নিয়ে গেল। লিবার্টি কাফেতে সময় নষ্ট করার কিছু নাই। আজ নানান আমোদের ব্যবস্থা আছে। মহসিন হলে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা জুয়া চলবে। সন্ধ্যাবেলায় এসএম হলে ফিস্ট। ফিস্ট শুধুমাত্র এসএম হলের ছাত্রদের জন্যে, কিন্তু এনএসএফের নেতারা সব ফিস্টের বিশেষ সম্মানিত অতিথি। ফিস্টে যাওয়ার আগে জ্বিনের খেলা। ছাত্রলীগের এক পাণ্ডা, নাম রোস্তম, ভৈরব থেকে জ্বিনসাধক ধরে এনেছে। সে জ্বিন নামাবে।

খোকা লিবার্টি কাফের ম্যানেজারকে সবার খাবারের বিল দিল। কবি নির্মলেন্দু গুণের বিলও দিল। খোকা কবি গুণের দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা কী করেন?

গুণ হাসিমুখে বললেন, উকুন মারি।

মারেন, উকুন মারেন। উকুন মারার প্রয়োজন আছে।

সেই সময় মহসিন হলে এনএসএফের দখলে তিনটি রুম ছিল। একটা অ্যাসিসটেন্ট হাউস টিউটরদের বরাদ্দের দুই কামরার বড়ঘর। এটি ব্যবহার করা হতো মেয়েঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপে। দোতলায় সাউথ ব্লকের একটিতে জুয়া খেলা হতো।

সেই দুপুরের জুয়া অসম্ভব জমে গেল। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। জুয়াড়ির সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় রোস্তম খেলায় অংশ নিতে পারল না। সে জুয়াড়িদের সাহায্যে নিয়োজিত থাকল। প্রধান সাহায্য বিশেষ পানীয়ের গ্লাস হাতে তুলে দেওয়া। কর্মকাণ্ড দেখে জ্বিনসাধক সামান্য ভড়কে গেছে। খোকা আসরে নেই। সে গেছে এসএম হলে। ফিস্টের তদারকিতে।

সন্ধ্যার পরপর এসএম হলে সবার যাওয়ার কথা। কিন্তু তিন তাসের খেলা এমনই জমে গেল যে কেউ উঠতে পারছে না। আরেক দান আরেক দান করে খেলা চলছেই।

রাত আটটায় ঘরে ঢুকল খোকা। তার চক্ষু রক্তবর্ণ। চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত। তার কাছেই জানা গেল, কিছুক্ষণ আগে এসএম হলে পাচপাত্তুরকে ছুরি মারা হয়েছে। অবস্থা গুরুতর। পাচপাত্তুর খাওয়াদাওয়া করে নিজের ঘরে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছিল, তখন ছাত্র ইউনিয়নের মজনু এবং করিম গল্প করার ছলে পাচপাত্তুরের ঘরে ঢুকে তাকে ছুরি মেরে নিমিষের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়।

পাচপাত্তুর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০ তারিখ মারা যায়। এর দু'মাসের মাথায় খোকার ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটে। তাকে নারায়ণগঞ্জের এক পতিতাপল্লী থেকে ধরে খুন করে ফেলে রাখা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

যে-কোনো মহৎ আন্দোলনের পেছনে বড় কিছু মানুষের ভূমিকা থাকে। জাতি এদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখে। তাদের নামে সড়কের নাম হয়, মহল্লার নাম হয়। ঋণাত্মকভাবে এখানে আসে খোকা এবং পাচপাত্তুরের নাম।

ঘৃণ্য দুই ঘাতকের মৃত্যু ঊনসত্তরের গণআন্দোলনকে বেগবান করে। অন্য ছাত্র সংগঠনগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের কর্মকাণ্ড বিপুল উৎসাহে শুরু করে। খোকা এবং পাচপাত্তুর জীবিত থাকলে তা এত সহজ হতো না।

হাবীব সহজে বিচলিত হওয়ার মানুষ না। তাঁর চরিত্রে 'হংসভাব' প্রবল। হাঁসের গায়ে পানি লাগে না। হাবীবের মনে রাগ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা তেমন ছায়া ফেলে না। তবে আজ নিশ্চয়ই বড় কিছু ঘটেছে। সকাল থেকে তিনি চেম্বারে ঝিম ধরে বসে আছেন। বলে দিয়েছেন কোনো মক্কেলের সঙ্গে আজ আর বসবেন না। যত জরুরি কথাই থাকুক চলে যেতে হবে।

প্রণব বলল, শরীর কি খারাপ ?

হাবীব জবাব দিলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। প্রণব বলল, শরীর খারাপ বোধ করলে চেম্বারে বসে না থেকে বিছানায় শুয়ে থাকেন। কাউকে বলুন গা-হাত-পা টিপে দিবে।

হাবীব কিছুই বললেন না। টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজ হাতে নিলেন। খবরের কাগজটা বাসি। গতপরশুর কাগজ। একবার পড়া হয়েছে। বাসি খবরের কাগজ বিষ্ঠার কাছাকাছি। হাতে লাগলেও গা ঘিনঘিন করে। হাবীব পাতা উল্টালেন। প্রণব বলল, আপনার মক্কেল সবুর বসে আছে। টাকাপয়সা নিয়ে এসেছে।

তুমি রেখে দাও।

আমার হাতে দিবে না। আপনার হাতে দিতে চায়। দুটা মিনিট সময় দেন। টাকা দিয়ে চলে যাক। ভাটি অঞ্চলের মক্কেল তো, টাকা সহজে বের করে না।

হাবীব হাত থেকে খবরের কাগজ রাখতে রাখতে বললেন, একবার বলে দিয়েছি দেখা হবে না। এখন টাকা দিবে বলে দেখা করব, এটা কি ঠিক ? তাহলে কথার ইজ্জত কি থাকে!

প্রণব বলল, ঠিক বলেছেন। বাস্তব চিন্তা। আমার মাথায় বাস্তব চিন্তা আসে না। সব অবাস্তব চিন্তা।

হাবীব খান উঠে দাঁড়ালেন। দিঘির ঘাটলায় কিছুক্ষণ বসবেন। মন শান্ত করবেন। পানির দিকে তাকিয়ে থাকলে মন শান্ত হয়। প্রাচীন সাধুসন্ন্যাসীরা এই জন্যেই কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে মন্ত্র-তন্ত্র পড়তেন।

হাবীব খানের মন বিক্ষিপ্ত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে। তিনি একটা বেনামি চিঠি পেয়েছেন। বেনামি চিঠিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা ঠিক না। তিনি নিজেও করছেন না। কিন্তু মন শান্ত করতেও পারছেন না। চিঠির বিষয়টা নিয়ে প্রণবের সঙ্গে আলাপ করবেন কি না তাও বুঝতে পারছেন না। জটিল সমস্যায় কাছের মানুষের সাহায্য নিতে হয়। হাবীব হঠাৎ লক্ষ করলেন, তার কাছের মানুষ কেউ নেই।

দিঘির ঘাটে ছাতিমগাছের ছায়া। ছাতিমের ফুল ফুটেছে। মাথা ধরে যাবার মতো উগ্র গন্ধ। বসতবাড়ির আশেপাশে ছাতিম গাছ রাখতে নেই। ছাতিম ফুলের গন্ধে নেশা হয়। সেই নেশার ঝোঁকে কুকর্ম করতে মন চায়।

হাবীব ছাতিম গাছের নিচের ছায়াতে বসলেন। বাইরে কড়া রোদ। ছায়াতে বসে থাকতে ভালো লাগছে। গাছটা কাটিয়ে ফেলতে হবে। তখন আর গাছের ছায়ায় বসা যাবে না। তাঁর মনে হলো, প্রতিটি কাজের কিছু উপকার আছে আবার কিছু অপকারও আছে। দুইয়ে মিলে সমান সমান।

দিঘির জলে শাপলা ফুটেছে। দেখতে সুন্দর লাগছে। এই সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরও আছে। অসুন্দরটা কী? ফুলের অসুন্দর নিয়ে চিন্তা করতে করতে হাবীব নিজের অজান্তেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেনামি চিঠি বের করলেন। তিন-চারবার পড়া চিঠি তিনি আবারও পড়লেন।

> জনাব,
>
> আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনার কন্যা নাদিয়ার বিষয়ে আমি আপনাকে একটি গোপন তথ্য দিতেছি। নাদিয়া তাহার এক শিক্ষককে কোর্টে বিবাহ করিয়াছে। শিক্ষক হিন্দু। তাহার নাম বিদ্যুত কান্তি। আপনার মতো একজন সম্মানিত মানুষের মুসলিম কন্যার সহিত এক হিন্দু খৎনাবিহীন লিঙ্গ দ্বারা প্রতি রাতে যৌনকর্ম করিবে, ইহা কি সহ্য করা যায়? এখন কী করিবেন আপনার বিবেচনা।

হাবীব চিঠিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়লেন। নোংরা চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঘোরা ঠিক না। কখন কার হাতে পড়বে! তিনি চিঠির টুকরা দিঘির পানিতে ছুড়ে মারলেন। বাতাসের কারণে টুকরাগুলো পানিতে পড়ল না। তার গায়ে ফিরে এল। হাবীবের শরীরে জলুনির মতো হলো।

চায়ের কাপ নিয়ে প্রণব আসছেন। তার পেছনে হুক্কা হাতে একজন। তাকে হাবীব আগে দেখেননি। মহিষের মতো বলশালী চেহারা। গাত্রবর্ণও মহিষের মতো কালো। শরীরের তুলনায় মাথা ছোট। মাথার চুল কদমছাট করা। প্রণব চায়ের কাপ হাবীবের পাশে রাখতে রাখতে বললেন, এর নাম ভাদু। কোচ চালনায় ওস্তাদ। জেলখাটা লোক। আপনি বললে রেখে দিব। বাড়িতে পাহারার লোকের সংখ্যা কম। রাতে বাড়ি পাহারা দিবে, দিনে ফুটফরমাশ খাটবে। এখন সময় খারাপ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝুলাবে, তখন সমস্যা আরও বাড়বে। ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টে আরও সৈন্য এসেছে। এখন বলুন, ভাদুকে রাখব ?

এত অকারণ কথা কেন বলো ? রাখতে চাইলে রাখবা।

প্রণব বললেন, এই ভাদু, বড় সাহেবকে কদমবুসি করে চলে যা।

ভাদু কদমবুসি করল। হাবীব বললেন, কাগজের টুকরাগুলি তুমি তুলে দিঘির পানিতে ফেলো, এটা তোমার প্রথম কাজ।

হাবীব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। ভাদু কাগজের টুকরা একটা-একটা করে বাঁ হাতে জমাচ্ছে। আগ্রহ করে দেখার মতো কোনো দৃশ্য না। তারপরেও মানুষ মাঝে মাঝে তুচ্ছ বিষয়ে আগ্রহ বোধ করে। এখন ভাদু কাগজের টুকরাগুলি দিয়ে বল বানাচ্ছে। এখন সে কাগজের বল দিঘির দিকে ছুড়ে মারল। কাগজের বল দিঘির প্রায় মাঝখানে ভেসে রইল। হাবীব বললেন, তোমার প্রথম কাজে আমি সন্তুষ্ট। তুচ্ছ কাজ থেকে বোঝা যায় বড় কাজ কেউ পারবে কি না। তুমি কি কখনো খুন করেছ ?

জি-না। তবে বললে করতে পারব।

আচ্ছা এখন সামনে থেকে যাও।

ভাদু থপথপ শব্দ করে চলে যাচ্ছে। প্রণব আবারও দৃষ্টি ফেরালেন দিঘির দিকে। কাগজের বল পানিতে জেগে আছে। বাতাসে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে আসছে। হাবীব খান অস্বস্তি বোধ করছেন। এই কাগজের বল কখন ডুববে! তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, প্রণব! তুমি নাদিয়াকে আমার কাছে পাঠাও।

এক্ষণ পাঠাইতেছি।

হাবীব বললেন, থাক দরকার নাই। তুমি সামনে থেকে যাও। আমি কিছুক্ষণ একা থাকব।

নাদিয়া তার দাদির খাটে বসে দাদির জন্যে পান ছেঁচে দিচ্ছে। খটখট শব্দ হচ্ছে। নাদিয়া বলল, পান ছেঁচার যন্ত্র থাকলে ভালো হতো, তাই না দাদি ? সুপারি-পান-চুন যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। বোতাম টিপলাম। মিকচার বের হয়ে এল।

হাজেরা বিবি বললেন, তোর হাতে যেইটা আছে সেইটাও তো যন্ত্র।

নাদিয়া বলল, তা ঠিক। এই যন্ত্রটা চলছে শরীরের শক্তিতে। আমি যে যন্ত্রের কথা বলছি সেটা চলবে বিদ্যুতের শক্তিতে।

হাজেরা বিবি হঠাৎ গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, যন্ত্রের একটা গফ শুনবি ?

নাদিয়া বলল, কী গল্প ?

হাজেরা বিবি বললেন, কাছে আয় কানে কানে বলি। এইটা উঁচাগলার গফ না। কানাকানির গফ।

নিশ্চয়ই নোংরা কোনো গল্প। আমি শুনব না।

হাজেরা বিবি খলবলিয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর চোখ এখন আনন্দে চকচক করছে। তিনি পানের জন্যে হাত বাড়ালেন। নাদিয়া পান-সুপারির গুঁড়া তার হাতে ঢালতে ঢালতে বলল, তোমাকে নিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখছি। পড়ে শোনাব ?

না। তুই আমার গফ শুনবি না, আমিও তর গফ শুনব না।

প্রথম লাইনটা শুধু শোনো—'আজ বারোই চৈত্র। হাজেরা বিবির বিবাহ।'

তুই তারিখে ভুল করছস। চৈত্র মাসে বিবাহ হয় না।

দাদাজানের লেখা খাতা থেকে তারিখ নিয়েছি।

তোর দাদাজান আমার বিষয়ে যা লিখেছে সবই ভুল। আমার নামও ভুল। হাজেরা আমার নাম না।

তোমার নাম কী ?

এখন বিস্মরণ হয়েছি। তোর দাদাজান নাম বদলায়েছে। সে বলল, ডাক দেওয়া মাত্র হাজির হবা। তাই নাম দিলাম হাজিরন বিবি। সেই থাইকা হাজেরা বিবি। তারপর কী হইল শোন। আমি উনারে বললাম, একদিন আমার দিন আসব। আমি আপনারে ডাক দিব। আপনি হাজির হইবেন। আপনার নাম বদলায়ে আমি নাম রাখব হাজির বাবা।

নাদিয়া বলল, তুমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা শুরু করেছ। বিয়ের সময় তোমার বয়স দশ বছর। দাদাজানের ত্রিশ বছর। দশ বছরের বালিকা এমন বয়স্ক একজনকে এ ধরনের কথা বলতে পারে না।

হাজেরা বিবি বললেন, আমি পারি। এখন তুই বিদায় হ।

চলে যাব ?

হুঁ।

নাদিয়া খাট থেকে নামল। হাজেরা বিবি তাঁর পুত্রকে ডাকতে লাগলেন, হাবু। হাবু। হাবুরে। তিনি ডেকেই যাচ্ছেন।

নাদিয়ার এখন কিছু করার নেই। লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই আনা হয়েছে। ভোরবেলা গল্পের বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না। গল্পের বই পড়তে হয় দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শরীর এলিয়ে গল্পের বই পড়তে পড়তে কিছুক্ষণের ভাতঘুম। একটা কাজ অবশ্য করা যায়। বই নিয়ে দিঘির ঘাটে চলে যাওয়া যায়। ছাতিম গাছে হেলান দিয়ে বই পড়া।

নাদিয়া বই হাতে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে দিঘির ঘাট চোখে পড়ে। সে দেখতে পাচ্ছে তার বাবা দিঘির ঘাটে বসে আছেন। তামাক খাচ্ছেন। এই সময় তাঁর দিঘির ঘাটে বসে থাকার কথা না। তিনি কি কোনো সমস্যায় আছেন? দিঘির ঘাটের দিকে তাকালেই নাদিয়ার মনে আসে বিদ্যুত স্যারের কথা। কী বুদ্ধি মানুষটার! মাস্টারি বাদ দিয়ে মানুষটা যদি 'সমাধান' নাম দিয়ে অফিস খুলত তাহলে সবার উপকার হতো। সমস্যায় পড়তেই সমাধান অফিসে চলে যাওয়া। স্যারের কাছ থেকে সমাধান নিয়ে আসা।

নাদিয়া দোতলা থেকে নামল। দিঘির ঘাটের দিকে রওনা হলো। হাবীব মেয়েকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, প্রণবকে তো নিষেধ করেছিলাম তোকে খবর দিতে।

নাদিয়া বলল, কেউ আমাকে খবর দেয় নাই বাবা। আমি নিজ থেকে এসেছি। এখানে বসে আছ কেন?

হাবীব জবাব দিলেন না। হুক্কার কয়লা নিভে গেছে। তারপরেও তিনি অভ্যাসবশে টেনে যাচ্ছেন।

বাবা, কোনো সমস্যা?

সমস্যা হলে কী করবি? সমাধান করবি?

চেষ্টা করতে পারি।

নাদিয়া বাবার পাশে বসল। হাবীব অন্যমনস্কভাবে বললেন, একটা বেনামি চিঠি পেয়েছি।

নাদিয়া বলল, চিঠিতে কী লেখা? তোমাকে খুন করবে এই ধরনের কিছু?

না।

কী লেখা বলো।

হাবীব চুপ করে রইলেন। নাদিয়া বলল, আমাকে নিয়ে নোংরা কোনো কথা?

হুঁ।

এটাই তোমার সমস্যা ?

হ্যাঁ।

বাবা শোনো, তোমাদের আদালত কি বেনামি চিঠি গ্রহণ করে ?

না।

কাজেই বেনামি চিঠি গুরুত্বহীন। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে, নাম বকুল। মেয়েটার মাথায় মনে হয় কোনো গণ্ডগোল আছে। সে তার ক্লাসমেটদের ঠিকানা জোগাড় করে এবং তাদের বাবা-মা'র কাছে কুৎসিত সব কথা বেনামিতে লিখে পাঠায়। আমি নিশ্চিত আমাকে নিয়ে চিঠিটা সে-ই পাঠিয়েছে। আমি তার হাতের লেখা চিনি। চিঠিটা দাও পড়লেই বুঝব।

হাবীব দিঘির দিকে তাকালেন। কাগজের বল ডুবে গেছে। তিনি হুক্কার নল পাশে রাখতে রাখতে বললেন, চিঠি নষ্ট করে ফেলেছি।

নাদিয়া বলল, সামান্য একটা চিঠির কারণে মুখ ভোঁতা করে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় ? তুমি আমাকে চেনো। আমাকে দিয়ে ভয়ঙ্কর কোনো অন্যায় হবে না। আমি ভালো মেয়ে।

হাবীব বললেন, বড় বড় অন্যায় ভালো মানুষরা করে।

নাদিয়া বলল, তাহলে মনে হয় আমি ভালোমানুষ না। বড় অন্যায় দূরের কথা ছোট অন্যায়ও আমি করতে পারব না।

পাংখাপুলার রশিদ এসেছে। সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে। হাবীব বিরক্ত গলায় বললেন, কী চাও ?

রশিদ ভীত গলায় বলল, বড় মা আপনেরে ডাকে।

হাবীব বললেন, উনি সারা দিনে এক হাজারবার আমাকে ডাকেন। তাই বলে এক হাজারবার আমাকে খবর দিতে হবে ? সামনে থেকে যাও।

রশিদ প্রায় দৌড়ে সরে গেল। হাবীব তাকালেন মেয়ের দিকে। কী সহজ সুন্দর মুখ মেয়েটার! তার মা'র চেহারাও সুন্দর, তবে সে সৌন্দর্যে কাঠিন্য আছে। নাদিয়ার মধ্যে তা নেই।

নাদিয়া বলল, কী দেখো বাবা ?

হাবীব কিছু বললেন না। দৃষ্টি ঘাটের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, নাদিয়া তার বান্ধবী বকুল সম্পর্কে যা বলেছে তা মিথ্যা। নাদিয়া জানে তাকে নিয়ে এধরনের বেনামি চিঠি আসতে পারে। কাজেই সে বেনামি চিঠির কারণ নিয়ে গল্প বানিয়ে রেখেছে। নাদিয়াকে ঠিকমতো জেরা করলেই সব

বের হয়ে যাবে। তাঁর জেরার মুখে কঠিন আসামিও মাখনের মতো গলে যায়। আর এই মেয়ে তো শুরুতেই মাখন। তিনি হুক্কার নল মুখে নিয়ে কয়েকবার টানলেন।

নাদিয়া বলল, আগুন নিভে গেছে বাবা। কাউকে বলি কল্কে সাজিয়ে দিক।

না। তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, জবাব দিবি।

নাদিয়া হাসিমুখে বলল, জবাব দেওয়ার আগে কি আদালতের মতো প্রতিজ্ঞা করব—যাহা বলিব সত্য বলিব!

প্রতিজ্ঞা লাগবে না। তোদের ক্লাসের মেয়েটার নাম বকুল ?

হ্যাঁ।

কীভাবে নিশ্চিত হলি বেনামি চিঠি সে-ই পাঠায় ?

তার রুমমেট বলেছে। সে হাতেনাতে ধরেছে।

রুমমেটের নাম কী ?

শেফালি।

শেফালির নামেও চিঠি পাঠিয়েছিল ?

হ্যাঁ। শেফালিকে নিয়ে আর হলের দারোয়ানকে নিয়ে জঘন্য এক চিঠি।

বকুলের ভালো নাম কী ?

বকুল বালা।

হিন্দু মেয়ে ?

হ্যাঁ।

শেফালির ভালো নাম কী ?

শেফালি হক।

তার সাবজেক্ট কী ?

পলিটিক্যাল সায়েন্স।

রুম নাম্বার কত ?

তিনশ এগারো।

হাবীব বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন। নাদিয়া বলল, জেরা শেষ ?

হাবীব বললেন, জেরা আবার কী ? ঘটনা জানতে ইচ্ছা করল বলে প্রশ্ন করলাম।

আমি সত্যি জবাব দিয়েছি না মিথ্যা দিয়েছি তা ধরতে পেরেছ ?

মিথ্যা জবাব কেন দিবি ?

দিতেও তো পারি। কেউ মিথ্যা বলছে কি না তা ধরার টেকনিক আছে। টেকনিকটা কি তোমাকে বলব ?

বল।

টেকনিকটা আমরা শিখেছি বিদ্যুত স্যারের কাছে। স্যার বলেছেন যখন কেউ মিথ্যা বলে তখন তার ব্রেইনে বাড়তি চাপ পড়ে। এই কারণে ব্রেইনের অক্সিজেন লাগে বেশি। কাজেই মিথ্যাবাধী বড় করে শ্বাস নেয়। ব্রেইনের বাড়তি চাপের জন্যে চোখের মণির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। চোখের মণি হয় ডাইলেটেড। তোমাকে তো প্রায়ই আসামি জেরা করতে হয়। আসামির চোখের মণির দিকে তাকালেই তুমি কিন্তু ধরে ফেলতে পারবে সে সত্যি বলছে না মিথ্যা বলছে।

হাবীব দিঘির ঘাট ছেড়ে চেম্বারে যাচ্ছেন। আগামী পরশু হাসান রাজা চৌধুরীর মামলার আবার তারিখ পড়েছে। ফরিদকে জেরা করা হবে। কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখা দরকার। মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই নাদিয়ার বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি দরকার। তবে মামলা ঠিকমতো যাচ্ছে। সাজানো মামলা রেললাইনের ওপরের রেলগাড়ি। কখনো লাইন ছেড়ে যাবে না।

চেম্বারে ঢোকার মুখে প্রণবের সঙ্গে দেখা। হাবীব বললেন, হাসান রাজা চৌধুরীর মামলার কাগজপত্রগুলা বের করো।

এখন দেখবেন ?

হুঁ।

আপনার শরীরটা খারাপ, আজ বাদ দেন।

তোমাকে যা করতে বললাম করো। আরেকটা খবর এনে দাও। রোকেয়া হলের তিনশ এগারো নম্বর রুমে যে মেয়ে দু'টা থাকে তাদের নাম। তারা কোন সাবজেক্টে পড়ে এই তথ্যও লাগবে।

ব্যবস্থা করব। তিনশ এগারোর মেয়ে দু'টার নাম। সাবজেক্ট।

হাবীব মামলার নথির পাতা উল্টাচ্ছেন। মন বসাতে পারছেন না। হাজেরা বিবির গলার আওয়াজ আসছে। ভাঙা রেকর্ডের মতো তিনি ডেকেই যাচ্ছেন— হাবু, হাবু, ও হাবু।

নাদিয়া সিঁড়ি বেয়ে পানির কাছাকাছি চলে গেল। দিঘির জলে ছায়া দেখতে ইচ্ছা করছে। যদিও সে জানে এখন ছায়া পড়বে না। সূর্যের অবস্থান ঠিক নেই। নাদিয়া বুঝতে পারল না দূর থেকে একজন তাকে লক্ষ করছে। তার নাম ভাদু মিয়া। একজনের মনের কথা অন্যজন ধরতে পারে না। ধরতে পারলে নাদিয়া অবশ হয়ে যেত। ভাদু মিয়া প্রকাণ্ড একটা কাঁঠালগাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

নাদিয়ার ওপর থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে এখনই মেয়েটার মুখ চেপে ধরে বাগানের ভেতরের কোনো আড়ালে চলে যেতে। কাজ সমাধার পর দেয়াল টপকে পালিয়ে যাওয়া। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলাল। এখন না, আরও পরে। দিনের আলোয় ঘটনা ঘটালে তার ভালো লাগত। কিন্তু ঘটনা ঘটাতে হবে রাতে। ঘটনার পর কিছুক্ষণ মেয়েটার গলা টিপে ধরে রাখতে হবে, তারপর ফেলে দিতে হবে দিঘির পানিতে। এটা কোনো ব্যাপারই না।

ভাদু মিয়া দেখল মেয়েটা উঠে আসছে। সে চট করে গাছের আড়ালে সরে গেল। নাদিয়া বলল, কে ? গাছের পেছনে কে ?

ভাদু মিয়া বের হয়ে এল। তার দৃষ্টি মাটির দিকে। মেয়েটা যেন তার চোখ দেখতে না পায়। মেয়েরা চোখ দেখে অনেক কিছু বুঝে ফেলে। তাকে চোখ দেখতে দেওয়া যাবে না।

নাদিয়া বলল, আপনি কে ?

আমি নতুন কাজ পাইছি। আমার নাম ভাদু মিয়া।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন ?

আপনারে দেইখা শরম পাইছি।

আমাকে দেখে শরম পাওয়ার কী আছে ?

মেয়েছেলে দেখলে আমি শরম পাই।

নাদিয়া হেসে ফেলল। মহিষের মতো জোয়ান একজন, সে মেয়েছেলে দেখলে শরম পায়। কত বিচিত্র মানুষই না এই পৃথিবীতে আছে!

আমাকে দেখে শরম পাওয়ার কিছু নেই। আমি এ বাড়ির মেয়ে। আমার নাম নাদিয়া। আপনাকে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। আপনি আমার দিকে তাকাতে পারেন।

ভাদু মিয়া বলল, জে-না।

আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি শরম পেতে থাকুন।

ভাদু মনে মনে বলল, শরম কারে কয় তুমি বুঝবা। সবুর করোগো সোনার কইন্যা। সবুর।

হাজেরা বিবির সামনে বিরক্তমুখে হাবীব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, সারাক্ষণ আমাকে ডাকো কেন মা ?

হাজেরা বিবি বললেন, তোরে ছাড়া কারে ডাকুম ? তোর কামলাগুলারে ডাকুম ?

কিছু বলবেন ?

হুঁ।

বলেন শুনি।

এখন ইয়াদ আসতেছে না। তুই আমার সামনে ‘ব’। আমি ইয়াদের চেষ্টা নেই।

হাবীব বললেন, আপনি ইয়াদ করেন। যদি ইয়াদে আসে আমারে ডাকবেন। আমার কাজ আছে আমি যাই।

ইয়াদ হইছে। তুই ‘ব’ দেহি। তোরে বলতেছি। কথাটা গোপন। কাছে আয়।

আর কাছে আসতে পারব না। আপনার যা বলার বলেন।

কথাটা তোজল্লী বিষয়ে।

কী কথা ?

তোর মেয়ে শাদি করেছে।

আপনাকে নাদিয়া বলেছে ?

আমারে কেউ কিছু বলে না। যা বুঝার আমি অনুমানে বুঝি।

অনুমান করলেন কীভাবে ?

গন্ধ দিয়া অনুমান করেছি। কুমারী মেয়ের শরীরের গন্ধের এক ভাও, বিয়া হউরা মেয়ের আরেক ভাও। আবার গাভিন মেয়ের অন্য ভাও। কথায় আছে—

কুমারী কন্যার ঘ্রাণ হইল
পানের কচি পাতা
বিয়া হউরা কন্যা হইল
পাকনা ফল আতা
গর্ভিনি নারীর শইলে টক ঘ্রাণ পাই
বিধবা নারীর শইলে কোনো গন্ধ নাই।

হাবীব বললেন, আমাকে বলেছেন ঠিক আছে। এই জাতীয় কথা আর কাউকে বলবেন না।

আচ্ছা বলব না। হাজেরা বিবি পান ছেঁচনি নিয়ে বসলেন। টক টকাস শব্দ হতে থাকল।

ভাদু মিয়াও শব্দ করছে। সে কুড়াল দিয়ে কাঠ ফেড়ে রান্নার খড়ি বের করছে। কেউ তাকে কাঠ ফাড়তে বলেনি। বিশ্বাস অর্জনের জন্যে নিজ থেকে আগ্রহ নিয়ে এইসব কাজ করতে হয়। সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হলো নিজেকে বোকা

হিসেবে দাঁড় করানো। বুদ্ধিমানকে কেউ বিশ্বাস করে না। বোকাকে বিশ্বাস করে। বোকা সাজা কঠিন কোনো কাজও না।

প্রণব গায়ে তেল মাখছিলেন। কাঠ ফাড়া শেষ করে ভাদু প্রণবের সামনে দাঁড়াল। প্রণব বললেন, কিছু বলবি ?

ভাদু বলল, গায়ে তেল দিয়া দেই ?

না। মুসলমানের হাতের ডলা নেওয়া নিষেধ। মন্ত্র নিয়েছি তো। মন্ত্র নেওয়ার পর নানান বিধিনিষেধ।

মন্ত্র কী ?

ঈশ্বরের নাম। কানে একটা নাম গুরু দিয়ে দেন। সেই নাম জপ করতে হয়।

কী নাম ?

কী নাম সেটা তো বলতে পারব না। নিষেধ আছে।

আমি কাউরে বলব না।

নাম জেনে তুই করবি কী ? নাম জপ করবি ?

ক্যামনে জপ করতে হয় শিখায়া দিলে করব। কাজ শিখায়া দিলে আমি পারি। না শিখাইলে পারি না।

কথাবার্তা শুনে তোকে তো বিরাট গাধা মনে হচ্ছে।

ভাদু বলল, জে-না আমি গাধা না। আমার বুদ্ধি আছে। আপনার শইলে তেল ডইলা দেই ?

একবার তো বলেছি, না।

আরাম পাইবেন।

গাধা চুপ কর।

ভাদু মনে মনে হাসল। তার গাধা পরিচয়টা দ্রুত স্থায়ী করতে হবে। গাধা সাজতে হলে একই কথা কমপক্ষে তিনবার বলতে হবে। শরীরে তেল মাখার কথা দু'বার বলা হয়েছে। আরও একবার বলা দরকার। তৃতীয়বারের জন্যে ভাদু অপেক্ষা করছে। অপেক্ষাতেই আনন্দ।

পাংখাপুলার রশিদ এসে প্রণবের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বড় সাব আপনেরে ডাকে।

প্রণব বিরক্ত হয়ে বললেন, কানাকানি করতেছ কেন ? উনি আমারে ডাকেন এইটা গোপন কোনো কথা না। মেয়েছেলে কানে কথা বলতে পছন্দ করে। তুমি মেয়েছেলে না।

ভাদু আনন্দিত গলায় বলল, অত্যধিক সত্য কথা। সে মেয়েছেলে না।

প্রণব বলল, এই বেকুব, সব কথায় কথা বলবি না।

ভাদু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

হাবীব বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। পাশেই মোড়া পাতা। এতক্ষণ মোড়ায় লাইলী বসে ছিলেন। উনি উঠে যাওয়াতে মোড়া খালি। প্রণব মোড়ায় বসতে বসতে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

হুঁ। সীতা মেয়েটার সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রণব বলল, সীতা কে?

হাবীব বিরক্ত হয়ে বললেন, সাত খণ্ড রামায়ণ নিজে লিখে এখন বলো সীতা কে? সীতা নারায়ণ চক্রবর্তীর মেয়ে। যাকে উদ্ধারের জন্যে তুমি আমার পায়ে ধরলা।

প্রণব লজ্জিত গলায় বলল, ভুলে গেছি।

হাবীব হাই তুলতে তুলতে বললেন, এখন মেয়েটার কী ব্যবস্থা করবে করো।

প্রণব বলল, আমি কী ব্যবস্থা করব? মেয়ের বাবা-মা ব্যবস্থা করবে।

হাবীব বললেন, মেয়েটার বাবা-মা কোনো ব্যবস্থা নিবে না। মেয়ের কারণে তারা পতিত হয়েছে। মেয়ে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে ছিল। টানবাজার কী জানো?

না।

বেশ্যাপল্লী। যে মেয়ে বেশ্যাপল্লীতে ছিল, তোমাদের সমাজে তার জায়গা নাই। কথা কি ঠিক?

প্রণব বলল, মেয়েটা আছে কোথায়?

থানা হাজতে। ওসি সাহেব মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন, তার মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তারা মেয়েকে নিবে না। এখন তুমি বলো কী করা যায়?

প্রণব বলল, আমি কী বলব স্যার? আমি বাক্যহারা হয়েছি।

আমি ওসি সাহেবকে বলেছি মেয়েটাকে আমার এখানে দিয়ে যেতে। রাত এগারোটার দিকে আসবে। তুমি মেয়েটাকে চেম্বারে বসাবে। তুমি তার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। যা বলার আমি বলব। আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ওসি সাহেবের সঙ্গে এখন কোনো কথা বলব না। তাকে চলে যেতে বলবে।

চেম্বারে সব ক'টা দরজা-জানালা বন্ধ। একটা দরজা খোলা। সেখানে পর্দা দেওয়া। বাইরের বাতাসে পর্দা কাঁপছে। টেবিলে রাখা দু'টা মোমবাতির শিখাও

কাঁপছে। মোমবাতি ছাড়া ঘরে একটা হারিকেনও আছে। কারেন্ট নেই। মোমবাতি এবং হারিকেনের আলোয় অন্ধকার কমছে না।

সীতা চাদরে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে জড়সড়ো হয়ে বসে আছে। তার চোখে আতঙ্ক ছাড়া কিছু নেই। মাঝে মাঝে সে কাঁপছে। তার দৃষ্টি মোমবাতির দিকে। দমকা বাতাসে একটা মোমাবাতি নিভে গেল। সীতা প্রবলভাবে কাঁপল এবং অস্ফুট শব্দ করল, আর তখনই হাবীব ঢুকলেন।

তোমার নাম সীতা?

সীতা জবাব দিল না। তার দৃষ্টি এখনো মোমবাতির শিখার দিকে।

তোমার বাবা মা তোমাকে নিতে রাজি না—এই খবর পেয়েছ?

সীতা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

হাবীব বললেন, তুমি আমার এখানে থাকবে। আমার কোনো অসুবিধা নাই। থাকবে?

সীতা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। হাবীব বললেন, আমার একটা বুদ্ধি শোনো, কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। হিন্দুর গায়ে যতটা দোষ লাগে, মুসলমানের লাগে না। মুসলমান হবে?

সীতা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

হাবীব বললেন, তোমার বয়স অল্প। মাঝে মাঝে অল্প বয়সে বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শম্ভুগঞ্জের পীরসাহেব আগামী বুধবার আসবেন। তাঁর কাছে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবা। তোমার নতুন একটা নাম লাগবে। তোমার নাম দিলাম হোসনা। হোসনা শব্দের অর্থ সৌন্দর্য। তোমার চেহারা সুন্দর, এই জন্যেই হোসনা নাম।

বাতাসে দ্বিতীয় মোমবাতিটাও নিভে গেল। সীতা আবারও চমকে উঠে অস্ফুট শব্দ করল।

শম্ভুগঞ্জের পীরসাহেব এসেছেন। তিনি রোজা ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ইফতার করে মাগরেবের নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে ঘোষণা করলেন এশার নামাজের পর বেতরের নামাজ পড়বেন। তারপর হিন্দু কন্যাকে মুসলমান বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করবেন। কন্যাকে বড়ইপাতা ভেজানো পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে। নখ কাটতে হবে।

সীতাকে গোসল দেওয়া হলো। সে জলচৌকিতে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। পীরসাহেব সীতার সঙ্গে কিছু কথা বলার চেষ্টাও করলেন। তিনি একতরফা বললেন, সীতা শুধু শুনে গেল।|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

কোরানপাঠ শিখবে। রোজ ফজরের নামাজের পর পাক কোরান পাঠ করবে। কোরানপাঠ শিখে নিবে।

হায়াজ নেফাসের পর অপবিত্র চুল সব ফেলতে হবে। একটা চুল থাকলেও শরীর শুদ্ধ হবে না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে পীরসাহেব গলা নামিয়ে আরও কিছু কথা বললেন। সবই অত্যন্ত অশ্লীল কথা। কোনোভাবেই একটি মেয়েকে বলা যায় না। পীরসাহেব অবলীলায় বলে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি নোংরা কথাগুলি বলে আনন্দ পাচ্ছেন।

এশার নামাজের পর হাজেরা বিবি ভীষণ হৈচৈ শুরু করলেন। হাবু রে, হাবু রে, হাবু রে।

হাবীব মা'র কাছে গেলেন। শান্তগলায় বললেন, মা, তোমার সমস্যা কী?

হাজেরা বিবি বললেন, সমস্যা আমার না। সমস্যা তোর। শুনলাম নটিপাড়ার এক হিন্দু নটি মেয়ে তুই নিয়া আসছস। তারে এখন মুসলমান বাইনতাছস। নটির আবার হিন্দু-মুসলমান কী? নটি হইল নটি।

মা চুপ করো।

আমি চুপ করব না। তুই চুপ কইরা আমার কথা শুন। শম্ভুগঞ্জের বদ পীরটারে হাছুনের বারি দিয়া বিদায় কর।

কেন?

এই পীররে অনেক দিন ধইরা আমি লক্ষ করছি। হে মেয়েছেলের চোখের দিকে কোনো সময় তাকায় না। তাকায় বুকের দিকে।

মা! তোমার যন্ত্রণায় আমি অস্থির।

তুই আমার যন্ত্রণায় অস্থির না। আমি তোর যন্ত্রণায় অস্থির। তুই এক্ষণ বুনিচাটা পীর বিদায় করবি। কতবড় হারামজাদা! চউখ দিয়া বুনি চাটে।

মেয়েটা কি সফুরা? ফরিদের বউ!

কিছুক্ষণের জন্যে হাবীব বিভ্রান্ত হলেন। ভ্রান্তি কাটতে সময় লাগল না। মেয়েটা সফুরাই। হলুদ চাদরে শরীর ঢেকে রেখেছে। চাদর থেকে হলুদ আভা পড়েছে মুখে। সামান্য আলোছায়া কী করতে পারে ভেবে হাবীব যথেষ্ট বিস্ময় বোধ করলেন। সফুরা রূপবতী, কিন্তু এতটা রূপবতী না যে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। অতি রূপবতীরা বর পায় না। সফুরা বর পেয়েছে। কাজেই সে অতি রূপবতীর একজন না। হাবীব কোর্টের কর্মকাণ্ডে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

কোর্টের অবস্থা গ্রামের হাটের মতো। লোকজন ঢুকছে, বের হচ্ছে। আঙুলের ডগায় চুন নিয়ে পান চিবুচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে উঁকি মেরে দেখছে কোর্টরুমে কী ঘটছে।

টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে বারান্দায় মারামারি বেধে গেল। হুটাপুটি শব্দ। গালাগালি। শুরুটা দুজনের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিন-চারজন যুক্ত হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কেউ একজন বলল, 'মাইরালছে রে। আমারে মাইরালছে।' এর মধ্যেই কোর্টে বিচারকার্য শুরু হলো।

আসামি ফরিদ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। হাবীব লক্ষ করলেন, সে বেশ রোগা হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি। সে তাকিয়ে আছে সফুরার দিকে। অবাক হয়ে স্ত্রীকে দেখছে। একবার হাবীবের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে সালামের ভঙ্গি করল। কাজটা ভুল। কোর্টরুমে তিনি ফরিদের পরিচিত কেউ না।

হাবীব তাঁর পাশে বসা প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, খবরের কাগজ পড়া এখন বন্ধ রাখো।

প্রণব বললেন, গরম খবর আছে।

যত গরম খবরই থাকুক কাগজ বন্ধ।

প্রণব কাগজ বন্ধ করলেন। হাবীব নিচুগলায় বললেন, ফরিদের স্ত্রী সফুরা এখন থাকে কই?

আমাদের কাছে থাকে।

তারে কখনো দেখি না কেন ?

নিজের মনে থাকে। পোয়াতি মেয়েছেলেরা পুরুষের সামনে আসতে লজ্জা পায়।

তারে বলবা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

এখন বলব ?

না, সে বাড়িতে যাক তারপর বলবা। কোনো কাজে হুটহাট আমার পছন্দ না।

প্রণব কানেকানে বললেন, স্যার লক্ষ করেছেন মেয়েটা এখন কেমন সুন্দর হয়েছে। শাস্ত্রে বলে স্বামী যদি দীর্ঘদিনের জন্যে পরবাসে যায় তাহলে পরবাস যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীর চেহারা পূর্ণশশীর মতো হয়।

হাবীব বললেন, এখন চুপ করো।

পাবলিক প্রসিকিউটর জেরা করার জন্য এগিয়ে আসছে। হাবীব বিরক্তি নিয়ে তাকালেন। পাবলিক প্রসিকিউটরের নাম হারুন। বয়স অল্প, কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ ভালো শিখেছে। অতি বুদ্ধিমান। লম্বায় খাটো। কোর্টে তার নামে প্রচলিত ছড়া হলো—

বাইট্যা হারুন
চাইট্যা খায়॥

হাবীব বললেন, হারুন কি বিবাহিত ?

প্রণব বললেন, বাঁটকুটারে বিয়ে করবে কে ? স্যার কি জানেন, ইবলিশ শয়তান বাঁটি ছিল ?

না।

আমি বইয়ে পড়েছি, এইজন্যেই কথায় আছে, 'বাঁটি শয়তানের লাঠি।'

এখন চুপ থাকো। বাঁটুটা সওয়ালজবাব কী করে শুনি।

হাবীবের সিগারেটের তৃষ্ণা হয়েছে। তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট স্পর্শ করলেন। তাঁর মনে হলো, কোর্টরুমে সিনিয়র আইনজীবীদের এবং জজ সাহেবের সিগারেট খাওয়ার অনুমতি থাকলে ভালো হতো। প্রায় সময়ই জটিল মামলায় চিন্তার গিট্টু লাগে। সিগারেটের ধোঁয়া সেই গিট্টু খুলতে পারে।

আপনার নাম ফরিদ ?

জি।

আপনি ভালো আছেন ?

জি।

মুখে বলছেন ভালো আছেন। আপনি তো ভালো নাই। আপনার চোখ লাল। চোখের নিচে কালি। রাতে তো আপনার ঘুম হয় না।

হাবীবের ইশারায় তার জুনিয়র আব্দুল খালেক বললেন, অবান্তর প্রশ্ন। অবজেকশন ইউর অনার।

হারুন বলল, অবজেকশন যখন উঠেছে তখন এই বিষয়ে কথা বলব না। আমি স্বাভাবিক সৌজন্যে প্রশ্ন করেছি।

মূল প্রশ্নে যান। 'আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ?'—এইসব বাদ থাক।

কোর্টরুমে হাসির শব্দ উঠল। অনেকেই হাসছে, তাদের সঙ্গে হারুনও হাসছে। হঠাৎ সে হাসি থামিয়ে বলল, ফরিদ সাহেব, আপনি গল্প-উপন্যাস পড়তে পছন্দ করেন, তাই না?

জি।

আমি খোঁজ নিয়েছি জেলখানার লাইব্রেরি থেকে আপনি প্রায়ই বই নিয়ে পড়েন। গতকাল রাতে কি কোনো বই পড়েছেন?

আব্দুল খালেক বললেন, অবজেকশন ইউর অনার। অবান্তর প্রশ্ন। জজ সাহেব কিছু বললেন না। তাকে খানিকটা কৌতূহলী মনে হলো। ফরিদ বলল, রবি ঠাকুরের লেখা একটা বই পড়েছি স্যার। নাম 'নৌকাডুবি'।

কবিতার বই?

জি-না স্যার। উপন্যাস। ঘটনাটা বলব?

ঘটনা বলার প্রয়োজন নাই। একটা বিষয় জানতে চাই, আপনি যখন হাজি রহমত রাজা চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তখন কি বই পড়ার সুযোগ ছিল?

জি-না।

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আপনি তার সঙ্গে তিন বছর ছিলেন। তাহলে ধরে নিতে পারি এই তিন বছর বই পড়তে পারেন নাই।

ফরিদ জবাব দিল না। হারুন বলল, ময়মনসিংহ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক বই, এই তথ্য কি আপনি জানেন?

জানি।

কীভাবে জানেন? পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যাওয়ার অভ্যাস কি ছিল?

ফরিদ অস্বস্তি নিয়ে জজ সাহেবের দিকে তাকাল। তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সে কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

আপনি তো সবসময় হাজি সাহেবের সঙ্গেই থাকেন। তাই না?

জি।

হঠাৎ হঠাৎ উনি যখন ময়মনসিংহ আসেন, তখন আপনিও আসেন।

জি।

ক্ষিতিশ বাবু নামে কাউকে চিনেন?

ফরিদ বিড়বিড় করে বলল, চিনি না।

মনে করার চেষ্টা করুন। উনি ময়মনসিংহ পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান।

চিনি না স্যার।

হারুন বলল, আপনি বলছেন চেনেন না, কিন্তু ক্ষিতিশ বাবু ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর ভাষ্যমতে আপনি নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই আনা নেওয়া করেন। আপনি শরৎচন্দ্রের লেখা 'বিন্দুর ছেলে' বইটা পড়েছেন?

জি পড়েছি।

পাবলিক লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছেন?

ইয়াদ নাই।

আপনি সর্বশেষ এই বইটা ইস্যু করেছেন। আপনি থাকেন এক জায়গায়, বই আনা নেওয়া করেন আরেক জায়গায়। ঘটনা কী?

ফরিদ ঢোক গিলল। তাকাল হাবীবের দিকে। তার চোখে হতাশা।

ঘটনা কি এরকম যে, অন্য একজন খুন করেছে আপনি তার দায়ভাগ সেধে নিচ্ছেন, বিনিময়ে অর্থ পাচ্ছেন?

ফরিদ অস্পষ্ট গলায় বলল, পানি খাব স্যার। তিয়াস লাগছে। জজ সাহেব ইশারায় পানি দিতে বললেন। টিনের গ্লাসে তাকে পানি দেওয়া হলো। ফরিদ তৃষ্ণার্তের মতো পানি খাচ্ছে না। চা খাওয়ার মতো খাচ্ছে।

হারুন বলল, আদালতের কাছে আমি ক্ষিতিশ বাবুকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করার অনুমতি প্রার্থনা করছি। জজ সাহেব হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। হারুন বিপদজনক দিকে যাচ্ছে। ক্ষিতিশ বাবু, লাইব্রেরি—এইসব তথ্য হারুন ডিটেকটিভের মতো বের করেছে তা হয় না। উকিলরা সিনেমা উপন্যাসে ডিটেকটিভ হয়। বাস্তবে পান সিগারেট খেয়ে অবসর কাটায়। হারুনকে কেউ একজন তথ্য দিয়েছে। সেই কেউ একজনটা কি ফরিদের স্ত্রী সফুরা? হারুন যখন ক্ষিতিশ বাবু সম্পর্কে কথা বলছিল তখন তাকিয়ে ছিল সফুরার দিকে।

হাবীব কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। আয়োজন করে হাই তুললেন। এর অর্থ এতক্ষণ যে আলোচনা হলো তা হাই তোলার মতো গুরুত্বহীন। ডাক্তার এবং উকিল এই দুই শ্রেণীর মানুষদের নিজ নিজ বিদ্যার পাশাপাশি অভিনয়ও জানতে হয়। হাবীব জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউর অনার। ডুবন্ত মানুষ খড়খুটা আঁকড়ে ধরে। আসামি ফরিদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আদালতকেও বলেছে। আমি তার পক্ষের আইনজীবী। এমন সব তথ্য তার বিষয়ে এখন উপস্থিত হচ্ছে যা আমি নিজে জানি না। ক্ষিতিশ বাবু ভুল করেছেন। সমিল চেহারার মানুষ থাকে। বলা হয় একই চেহারার মানুষ সাতজন করে তাকে। এদের একটা নাম আছে। পুরুষ হলে এদের বলে সপ্ত ভ্রাতা। মেয়ে হলে সপ্ত ভগ্নি। আমি চাই ক্ষিতিশ বাবু আদালতে উপস্থিত হয়ে বলুক এই সেই আসামি যে নিয়মিত বই আনা নেওয়া করে।

হাবীবের বক্তৃতার পর পর আদালত মুলতবি হয়ে গেল। হাবীব এসে বসলেন প্রণবের পাশে। প্রণব বললেন, স্যার আপনার কোনো তুলনা হয় না।

হাবীব বললেন, কোনো মানুষেরই তুলনা হয় না। সারা পৃথিবীতে আমি হাবীব একজনই, আবার তুমি প্রণবও একজন। বুঝেছ?

হুঁ।

পত্রিকাটা নামাও। সারাক্ষণ মুখের উপর পত্রিকা ধরা।

বললাম না গরম খবর আছে। পড়বেন?

না।

আমি সুরুবাকে বলেছি আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কখন বললা?

এক ফাঁকে বলেছি। সে খুব চিন্তিত। তার হাত দেখে কে যেন বলেছে তার স্বামীর ফাঁসি হবে।

হাবীব বললেন, একটা পান দাও।

প্রণব পানের কৌটা বের করলেন। কোর্টরুম খালি হয়ে গেছে। হাবীব এবং প্রণব এখনো বসে আছেন। হাবীব অস্থির বোধ করছেন। অস্থিরতার কারণ ধরতে পারছেন না। প্রণব বললেন, জজ সাহেবের মেয়ের বিয়ের কথা মনে আছে স্যার?

মনে আছে। উনার মেয়ের নাম কী?

শাহেদার জন্য। উনি বিরাট আয়োজন করেছেন। শুনেছি ঢাকা থেকে বাবুর্চি আসবে। মিষ্টির কারিগরও আসবে।

বিয়ের তারিখ যেন কী?

জানুয়ারির ২০ তারিখ।

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। জজ সাহেব খাস কামরায় আছেন। তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হওয়া দরকার।

ডিসট্রিক জজ আবুল কাশেম ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। হাবীবকে দেখে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, চেয়ারটা কাছে এনে বসুন। কোমরের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। বেশিক্ষণ সোজা হয়ে বসে থাকতে পারি না।

আমার পরিচিত এক কবিরাজ আছে। সে গাছগাছড়া দিয়ে মালিশ করার তেল তৈরি করে। অনেকেই উপকার পেয়েছে। আপনাকে তৈরি করে দিতে বলব ?

বলুন। আমার মেয়ে রাতে ইন্ডিয়ান বাম ঘষে দেয়, লাভ কিছু হয় না।

হাবীব বসতে বসতে বললেন, আপনার কোন মেয়ে, যার বিয়ের আলাপ হচ্ছে সে ? শাহেদা বানু ?

হুঁ।

মেয়ে চলে গেলে আপনার তো খুব কষ্ট হবে।

তা তো হবেই। এই মেয়ে বাপঅন্ত প্রাণ। রোজ দুপুরে টেলিফোন করে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছি কি না। টিফিন কেরিয়ারে নিজে খাবার ভরে দেয়।

হাবীব বললেন, এই কয়দিন কোর্টে খাওয়াদাওয়া না করে বাসায় মেয়ের সঙ্গে খান।

কথাটা মন্দ বলেন নাই।

বিয়েতে খাবারের আয়োজন কী করেছেন, একটু কি বলবেন ?

অবশ্যই বলব। সবই আমার স্ত্রী ঠিক করেছেন। প্রথম মেয়ের বিয়ে, ধুমধাম করতে চায়।

উনি একা তো ধুমধাম করবেন না। আমরা সবাই মিলে করব।

জজ সাহেব আগ্রহ উত্তেজনায় উঠে বসলেন। আনন্দিত গলায় বললেন, পোলাও, মুরগির কোরমা, খাসির কালা মাংস, দই মিষ্টি, পিঠা, পান-সুপারি।

গরু রাখবেন না ?

হিন্দু অতিথিদের জন্য নিরামিষের আলাদা পাক ব্যবস্থা নিয়েছি।

হাবীব বললেন, হিন্দু-মুসলমান এক টেবিলে খাবে না। ওরা মুরগি দিয়ে খাবে। মুসলমান মেয়ের বিয়েতে গরু না থাকলে চলে ? গোমাংস ছাড়া বাকি সব মাংসই নিরামিষের পর্যায়ে পড়ে।

দেখি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করি।

আপনার মেয়ের বিয়েতে আমার একজন অতিথি নিয়ে আসার বাসনা আছে। উনি আবার গোমাংস পছন্দ করেন।

জজ সাহেব বললেন, অতিথি কে ?

গভর্নর সাহেব। মোনায়েম খান। উনি সামাজিক উৎসবে যেতে পছন্দ করেন। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। অবশ্যি আপনি যদি অনুমতি দেন।

জজ সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, অবশ্যই উনাকে বলবেন। এটা হবে আমার মেয়ের জন্যে বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার। আমি তো চিন্তাই করতে পারি না আমার মেয়ের বিয়েতে স্বয়ং গভর্নর উপস্থিত।

হাবীব বললেন, বরযাত্রী এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে আমি একটা আইটেম আপনাকে করে দিতে চাই। মাছের আইটেম। পাবদা মাছ। এককেটা বোয়ালের মতো সাইজ। মাছটা মাখনের মতো। মুখে নিলে মুখের মধ্যেই গলে যায়। আমাদের গভর্নর সাহেবের পছন্দের মাছ।

পাবদা মাছের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। খরচ যা লাগে আমি দিব।

তাহলে তো স্যার হবে না। শাহেদা বানু মায়ের জন্যে আমি কিছু করব না ? আর যে পাবদা মাছের কথা বলেছি টাকা দিলে সেটা পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। আমি ব্যবস্থা করে আপনার কাছ থেকে টাকা নিব ? স্যার বলুন আমি কি মাছের ব্যবসা করি ?

জজ সাহেব বললেন, আপনার কথায় যুক্তি আছে। করুন ব্যবস্থা। ভালো কথা, গভর্নর সাহেবের দাওয়াতের চিঠি কি আপনার কাছে দিব ?

হাবীব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমার কাছে দেবেন। এই শুক্রবারে ঢাকায় যাচ্ছি। চিঠি হাতে হাতে পৌঁছে দিব।

মাগরেবের নামাজ শেষ হয়েছে। হাজেরা বিবি নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সেজদার জন্যে মাথা নিচু করলে সেই মাথা খাড়া করতে কষ্ট হয়। আমেনা বলে এক তরুণীকে রাখা হয়েছে, সে হাজেরা বিবির হয়ে নামাজ পড়ে। নিজের জন্যে পড়ে না। মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে ফতোয়া আনা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় এটা সম্ভব। বদলি-হজের মতো বদলি-নামাজ। বদলি-হজ যে করে সে হজের সোয়াব পায় না, যার জন্যে হজ করা হয় তিনি সোয়াব পান। বদলি-নামাজেও একই ব্যাপার। নামাজি সোয়াব পায় না, যার জন্যে নামাজ পড়া হচ্ছে তিনি সোয়াব পান।

আমেনাকে বলা হয়েছে তাকে বদলি-হজে পাঠানো হবে। হাজেরা বিবির হয়ে বদলি-হজ করে আসবে। আমেনা অতি আনন্দে আছে। সে অন্দরমহলেও বোরকা পরে। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তাকে সময়ে অসময়ে নামাজ পড়তে দেখা যায়। যখন নামাজ পড়ে না, তখন তার হাতে লম্বা তসবি ঘুরে। এই তসবি দুই হাতে ধরে রাখতে হয়। সে দাসীমহলে কিছু গল্প চালুর চেষ্টা চালাচ্ছে। একটি গল্প জ্বিন নিয়ে। তার বাবার একটা পালা জ্বিন ছিল। জ্বিনটা তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল ছিল। জ্বিনের কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত হয়ে আমেনার বাবা জ্বিনকে আজাদ করে দেন। তবে সেই জ্বিন এখনো আশা ছাড়ে নাই। এখনো বছরে একবার শীতের সময় আসে। আমেনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

লাইলী তাঁর নতুন দাসীকে তাঁর শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। নতুন কেউ বাড়িতে দাখিল হওয়ার পর তিনি প্রথম পনেরো দিন তাকে দেখেন। তারপর একদিন ডেকে পাঠান। সেইদিন ঠিক হয় নতুন দাসী চাকরি করতে পারবে নাকি তাকে চলে যেতে হবে।

আমেনা 'আসসালামু আলায়কুম' বলে ঘরে ঢুকল। তার হাতে যথারীতি লম্বা তসবি।

লাইলী বললেন, এক জ্বিন তোমার প্রেমে দেওয়ানা হয়েছে বলে শুনতে পাই। ঘটনা কি সত্য?

জি আম্মা।

সে একাই দেওয়ানা হয়েছে, না-কি তুমিও দেওয়ানা?

সে একাই দেওয়ানা। আমি কোন দুঃখে জ্বিন বিবাহ করব! জ্বিন-মানুষের বিয়ায় সন্তানাদি হয় না।

লাইলী বললেন, বিয়ে হলে সন্তান হবে না কেন? সন্তান অর্ধেক হবে মানুষ, অর্ধেক জ্বিন।

আমেনা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। এই মহিলাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অতিরিক্ত শান্ত চোখমুখ। ঠোঁটে হাসির আভাস। কিন্তু কথা বলার সময় মহিলার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। কপালে ভাঁজ পড়ে।

লাইলী বললেন, এত বড় তসবি কি জ্বিন তোমারে এনে দিয়েছে?

জি। আপনি ঠিক ধরেছেন আম্মা।

লাইলী শান্তগলায় বললেন, ফাইজলামি গল্প আমার সাথে করবা না। এই মালা জন্মাষ্টমির মেলায় কিনতে পাওয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা এই রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পেঁচায়া রাখেন। এখন বুঝেছ?

আমেনা চুপ করে রইল।

সারা দিন নামাজ কালাম পড়ো, তসবি টানো, ঘটনা কী?

জ্বিনের যন্ত্রণায় এই কাজ করতে হয়। দোয়া কালামের উপরে থাকতে হয়।

লাইলী বললেন, ঘটনা তা-না। তুমি কাজকর্মের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ভাব ধরেছ। আজ তার শেষ। তুমি নামাজের সময় নামাজ পড়বা। অন্য সময় কাজকর্ম করবা। বোরকা খোলো।

আমেনা বোরকা খুলল। লাইলী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি সুন্দরী মেয়ে। গরিবের ঘরে রূপ নিয়া আসছ। মানুষের কাছ থেকে সাবধান থাকবা। জ্বিনের হাত থেকে সাবধান থাকার প্রয়োজন নাই। নাদিয়ার বাবার সামনে কখনো পড়বা না। তুমি অন্দরমহলের দাসী। অন্দরমহলে থাকবা।

জি আম্মা।

এখন সামনে থেকে বিদায় হও। রুদ্রাক্ষের এই মালা যেন আর কোনোদিন না দেখি। মালা আমার খাটে রাখো।

আমেনা খাটে মালা রেখে দৌড়ে বের হতে গিয়ে চৌকাঠে বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। অন্য দাসীরা ছুটে এসে ধরাধরি করে তাকে কুয়াতলায় নিয়ে গেল। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দেওয়ার পর সে চোখ মেলে অস্পষ্ট গলায় বলল, জ্বিন থাপ্পড় মারছে।

লাইলী নিজের মনেই বললেন, এই মেয়েকে রাখা যাবে না। সে অনেক যন্ত্রণা করবে। আজ যন্ত্রণার শুরু।

হাবীব বসেছেন চেম্বারে। তাঁর সামনে জড়সড় হয়ে বসে আছে সফুরা। সফুরার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাবীব বলল, ভালো আছ?

সফুরা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না।

হাবীব বললেন, হারুন উকিলকে ক্ষিতিশ বাবুর কথা তুমি বলেছ?

সফুরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

হাবীব বললেন, একটা কথা আছে—নারীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। এটা মনে রাখবা। শাস্ত্রকথা অন্তঃকরণে আসে না। বুঝেছ?

জি।

কে না-কি তোমার হাত দেখে বলেছে তোমার স্বামীর ফাঁসি হবে। ঘটনা কি সত্য?

জি।

ভালো গণকের সন্ধান পেয়েছ। স্ত্রীর হাত দেখে স্বামীর ভাগ্য বলে দেয়। সহজ কাজ না, কঠিন কাজ। গণকের নাম কী ?

সফুরা স্পষ্ট গলায় বলল, নাদিয়া আম্মা হাত দেখে বলেছেন।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে হাবীব বললেন, নাদিয়া হাত দেখাও শিখেছে। ভালো তো। তারে বলব সে যেন আমার হাত দেখে তার মা'র ভাগ্য বলে দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তুমি সামনে থেকে যাও। কথা যা বলেছি মনে রাখবা। তোমার স্বামীর মামলা মোকদ্দমার বিষয় আমি দেখছি। তোমার পরামর্শের প্রয়োজন নাই।

জি আচ্ছা।

সন্তান কবে নাগাদ হবে ?

জানুয়ারি মাসে।

যে-কোনো সমস্যায় প্রণব বাবুকে বলবা।

জি আচ্ছা।

প্রণবকে আমার কাছে পাঠাও।

সফুরা উঠে দাঁড়াল। হাবীবকে কদমবুসি করে ঘর থেকে বের হলো। আশ্চর্যের কথা, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সেও দরজার চৌকাঠে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল। প্রণব কাছেই ছিল, ছুটে এসে সফুরাকে টেনে তুলল। বিরক্ত গলায় বলল, তুমি ভরা মাসের পোয়াতি। সাবধানে চলাফেরা করবা না ? ব্যথা পেয়েছ ?

জি-না।

যাও ঘরে গিয়া শুয়ে থাকো। নড়াচড়া করবা না।

প্রণব এসে হাবীরের সামনে রাখা চেয়ারে বসল। হাবীব বললেন, নাদিয়াকে একটা খবর দাও তো। সে আছে কোথায় ?

দিঘির ঘাটে বসেছে।

এত রাতে দিঘির ঘাটে কী ?

জোছনা দেখে। ভয়ের কিছু নাই। পাহারাদার রেখে দিয়েছি। ভাদু আড়ালে বসে পাহারা দিতেছে। নাদিয়া আম্মার সাথে হোসনা মেয়েটাও আছে। আপনাকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।

এখন দাও।

আপনি রোকেয়া হলের দু'টা মেয়ের ব্যাপারে সন্ধান নিতে বলেছেন। সন্ধান নিয়েছি। আগেই সন্ধান পেয়েছিলাম। বলতে ভুলে গেছি। আজকাল কিছু মনে থাকে না। বানপ্রস্থের সময় হয়ে গেছে।

হাবীব বিরক্ত গলায় বললেন, ফালতু কথা না বলে মূল কথা বলো। সন্ধানে কী পেয়েছ?

তিনশ' এগারো নম্বরে যে মেয়ে দু'টা থাকে তাদের একজনের নাম বকুল বালা। সে কেমিস্ট্রির ছাত্রী। অন্যজনের নাম শেফালী, তার সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স। শেফালী মেয়েটার বিবাহ ঠিক হয়েছে। ছেলে ডাক্তার। এই দুই মেয়ের বাড়ির ঠিকানাও নিয়ে এসেছি। ঠিকানা বলব স্যার?

না। আর কিছু লাগবে না।

হাবীব দিঘির ঘাটের দিকে রওনা হলেন। নাদিয়াকে দেখা যাচ্ছে। কেমন হতাশ ভঙ্গিতে বসে আছে। নাদিয়ার সামনে হোসনা। তার শরীর যথারীতি চাদর দিয়ে ঢাকা। সে মাথা নিচু করে আছে।

ঘাটের সিঁড়ির পেছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভাদু। ভাদু তাকিয়ে আছে নাদিয়ার পায়ের দিকে। শাড়ি সামান্য উঠে থাকার কারণে ডান পা'টার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। তার ভাগ্য ভালো হলে পা নড়াচড়ার সময় শাড়ি হয়তো আরও উপরে উঠবে। ভাদুর কাছে মেয়েছেলের আসল সৌন্দর্য পায়ে। এই মেয়ের পা সুন্দর আছে। ভাদু চোখ বন্ধ করল। নিজেকে সামলানোর জন্যে কাজটা করল। ইশ এমন যদি হতো মেয়েটা একা। আশেপাশে কেউ নেই। আচমকা তার মুখ চেপে ধরলে সে শব্দ করতে পারবে না। মুখ চেপে কার্য সমাধা করে কিছুক্ষণ গলা চেপে ধরে থাকা, তারপর পালিয়ে যাওয়া। ভাদু ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

হাবীব মেয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে কোমল গলায় ডাকলেন, নাদিয়া।

জি বাবা!

অন্ধকারে বসে আছিস কেন?

নাদিয়া বলল, অন্ধকার কোথায়! চাঁদের আলো আছে।

হাবীব মেয়ের পাশে বসে মনে মনে একটি অতি জরুরি চিঠির মুসাবিদা করা শুরু করলেন। চিঠিটা লেখা হবে হাসান রাজা চৌধুরীর বাবা রহমত রাজা চৌধুরীকে।

> রহমত রাজা চৌধুরী
>
> জনাব,
>
> আসসালাম। একটি জরুরি বিষয় জানাইবার জন্যে আমি আপনাকে পত্র দিতেছি। নানান কারণে আপনার পুত্রকে আমার পছন্দ। আমার একমাত্র কন্যা নাদিয়ার সঙ্গে কি তার

বিবাহ হইতে পারে ? আমি অধিক কথা বলিতে পছন্দ করি না। এই কারণে এক লাইনে মূল কথা বলিলাম।

ইতি

হাবীব খান।

পুনশ্চ : জানুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখে আমার সর্ববৃহৎ আকারের একশ' পাবদা মাছের প্রয়োজন। ডিসট্রিক্ট জজ আবুল কাশেম সাহেবের কন্যার বিবাহে এই মাছ প্রয়োজন।

এই চিঠি এখনই পাঠানোর প্রয়োজন নাই। আগে মামলার রায় হোক। তারপর। নিশ্চিন্ত মনে আগাতে হবে। মামলা চলতে থাকা মানে অস্বস্তি নিয়ে বাস করা। আজ বাটকু হারুন অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষিতিশকে ডলা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। বই লেনদেনের রেকর্ড কোনো কাজের রেকর্ড না। তারপরেও রেকর্ড বই নষ্ট করে ফেলা দরকার। অতি দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে।

হাবীব বললেন, মা যাই।

নাদিয়া বলল, যাও।

হোসনা মেয়েটার জবান ফুটেছে ? নাকি এখনো চুপ ?

এখনো চুপ, কোনো কথা বলে না বাবা।

কথা না বলাই ভালো। জগতে বড় অনিষ্ট অধিক কথার কারণে হয়।

হাবীব চলে গেলেন। ভাদু জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটু কাছে এগিয়ে এল। এত দূর থেকে ভালোমতো দেখা যায় না। সে খানিকটা চিন্তিত নতুন মেয়েটা সবসময় নাদিয়ার সঙ্গে আছে। দুইজনকে একসঙ্গে কায়দা করা যাবে না। দুইজনের একজন চিৎকার করবেই।

দিঘির ঘাটে হোসনা এবং নাদিয়া বসে আছে। তাদের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। দিঘির এক কোনায় অনেকগুলি শাপলা ফুল ফুটেছে। এই ফুলগুলি বড় বড়। চাঁদের আলোয় ফুলের প্রতিবিম্ব পড়েছে পানিতে। বাতাসে ফুল কাঁপছে, প্রতিবিম্বও কাঁপছে। নাদিয়া আঙুল উঁচিয়ে বলল, ওই জায়গায় আমি একবার ভূত দেখেছিলাম।

হোসনা আঙুল লক্ষ করে তাকাল। তার কোনো ভাবান্তর হলো না।

নাদিয়া বলল, মাঝেমাঝে তুমি কেঁপে ওঠো। এর কারণ কী বলো তো।

হোসনা জবাব দিল না।

নাদিয়া বলল, তোমার ঘটনা আমি শুনেছি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তোমার মতোই আমি কষ্ট পাচ্ছি। যতবার তোমাকে দেখি ততবার কষ্ট পাই। আমি তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব। সাইকিয়াস্ট্রিস্ট দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব। I Promise.

নাদিয়া বলল, তুমি একটু কাছে আসো। আমি তোমার পিঠে হাত রেখে কথা বলি।

হোসনা নড়ল না। যেখানে বসে ছিল, সেখানেই বসে রইল। নাদিয়া বলল, তোমার হোসনা নামটা আমার পছন্দ না। আমি তোমার একটা নতুন নাম দিলাম, পদ্ম! এই নামটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?

পদ্ম হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

নাদিয়া বলল, প্রণব কাকার কাছে শুনেছি তুমি সুন্দর গান করতে। একটা গান কি আমাকে শোনাবে?

পদ্ম স্পষ্ট গলায় বলল, না।

মানুষ যখন কাঁদে তখন চোখের জলের সঙ্গে কষ্ট বের হয়ে আসে। আবার যখন মানুষ গান গায়, তখন সুরের সঙ্গে কিছু কষ্ট বের হয়। লক্ষ্মী পদ্ম, আমাকে একটা গান শোনাও। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখো! এমন সুন্দর জোছনায় বনে যেতে ইচ্ছা করে। আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। এই গানটা কি জানো?

পদ্ম হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

গাইবে?

পদ্ম না-সূচক মাথা নাড়ল।

আকাশের চাঁদ তার আলো ফেলে যেতে থাকল। মানুষের আবেগের সঙ্গে এই আলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

হাজেরা বিবির শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। তাঁর বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে, তবে গলার স্বর এখনো টনটনা। তিনি জানিয়েছেন ঘরে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুতে তাঁর মত নেই। তাঁকে মরতে হবে ঘরের বাইরে। ঘরে মারা গেলে আজরাইল ঘর চিনে ফেলবে, তখন আরও মৃত্যু হবে। তিনি একঘেয়ে গলায় সুর করে বলতে লাগলেন, দিঘির ঘাটে মরব। দিঘির ঘাটে মরব।

তাঁকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে খাট পাতা হয়েছে। তাঁর মাথায় ছাতা ধরা হয়েছিল। হাজেরা বিবি বলেছেন, কালো ছাতা মাথায় ধরা যাবে না। কালো রঙ আজরাইলের পছন্দ। ছাতা দেখে দৌড়ে আসবে।

ডাক্তার, কবিরাজ এবং হোমিওপ্যাথ—তিন ধরনের চিকিৎসকই উপস্থিত। তাদের জন্যে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তারা শামিয়ানার নিচে বসে আছেন। তাদের জন্যে চা এবং ডাবের পানির ব্যবস্থা আছে।

মাদ্রাসা থেকে পঞ্চাশজন তালেবুল এলেম এসেছে। তারা কোরান খতম দিচ্ছে। শম্ভুগঞ্জের পীর সাহেবকে আনতে লোক গেছে। এক বস্তা তেঁতুল বিচি আনা হয়েছে। তেঁতুল বিচি গনা হচ্ছে। এক লক্ষ পঁচিশ হাজারবার 'দরুদে শেফা' পাঠ করা হবে। তেঁতুল বিচি গণনাকার্যে ব্যবহার করা হবে।

ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন এসেছেন। তিনি হাবীবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন, রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকবে এরকম মনে হয় না। তিনি রোগীকে স্যালাইন দিতে চেয়েছিলেন। হাজেরা বিবি বলেছেন, মানুষের পেসাবের মতো এই জিনিস আমি শরীরে ঢুকাব না।

হাবীব তাঁর মাকে বললেন, মা, কিছু খেতে মনে চায়?

হাজেরা বিবি বললেন, মর্দ হাতির একটা বিচি ভাইজ্যা আইন্যা দে। খায়া দেখি জিনিস কেমুন।

হাবীব বললেন, তুমি তো জীবনটা ঠাট্টা ফাজলামি আর ইয়ার্কিতে কাটায়া দিলে। এখন সময় শেষ; সাধারণভাবে কথা বলো। কিছু খেতে চাও?

হাজেরা বিবি বললেন, তোর বাপের অতি পছন্দের খানা ছিল সজনা দিয়ে খইলসা মাছের ঝোল। উনার মৃত্যুর পর এই জিনিস আমি আর কোনোদিনই খাই নাই। আজ যখন চইলা যাইতেছি, খইলসা মাছ খাইতে পারি।

সজনা এবং খইলসা মাছের সন্ধানে চারদিকে লোক গেল।

জন্মের যেমন আয়োজন আছে মৃত্যুরও আছে। প্রণব ব্যস্ত হয়ে সেই আয়োজন করছে। সারা দিন বাড়িতে প্রচুর লোক আসবে। তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী সাত দিন এই বাড়িতে চুলা জ্বলবে না। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে তোলা খাবার আসবে। সবাই খাবার দিতে চাইবে। সবার খাবার নেওয়া যাবে না। যাদের খাবার গ্রহণ করা যাবে, তাদের একটা লিস্টি করতে হবে। কে সকালে পাঠাবে, কে বিকালে, কে রাতে সব লেখা থাকতে হবে।

মৃত্যুর খবর সব আত্মীয়কে অতি দ্রুত জানাতে হবে। লোক মারফত এবং টেলিগ্রামে। কেউ যেন বলতে না পারে আমরা খবর পাই নাই। খবর না পাওয়া নিয়ে বেশিরভাগ সময় বিরাট পারিবারিক কোন্দল হয়।

আজ দুপুরে শ'খানেক মানুষ খাবে। তাদের আয়োজন করতে হবে। মাছ করা যাবে না। মৃত বাড়িতে মাছ নিষিদ্ধ। প্রণব একটা গরু এবং একটি খাসি জবেহ্ করার ব্যবস্থা নিলেন।

জামে মসজিদের ইমাম সাহেব এসেছেন হাজেরা বিবিকে তওবা করাতে। হাজেরা বিবি বললেন, আমি তওবার মধ্যে নাই। ইমামা সাহেব বললেন, তওবা কেন করবেন না আম্মা ? আমরা সবাই জানা অজানায় কত পাপ করি!

হাজেরা বিবি বললেন, আমার সামনে কেউ অপরাধ করলে আমি তার শাস্তি দেই। কোনোদিন ক্ষমা দেই না। আমি নিজে কেন আমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা নিব ? অপরাধ যা করেছি তার শাস্তি মাথা পেতে নিব। ক্ষমা নিব না। তওবা করতে হয় আপনি আপনার নিজের জন্যে করেন। আমি বাদ।

হাজেরা বিবি নাদিয়াকে তার পাশে বসিয়ে রেখেছেন। নাদিয়াকে বলেছেন, আমার চোখের মণির দিকে তাকায়া থাক। মৃত্যুর সময় চোখের মণির ভেতর থাইকা গোলাপি আলো বাইর হয়। আমি দুইবার দেখছি। মজা পাইছি। তুই দেখ মজা পাবি।

নাদিয়া দাদির চোখের মণির দিকে তাকিয়ে আছে। লাইলী এসে বললেন, আম্মা! আপনি একটু আল্লাখোদার নাম নেন।

হাজেরা বিবি বললেন, খামাখা উনারে বিরক্ত কইরা কোনো লাভ আছে ? তোমার ডাকতে ইচ্ছা হয় তুমি ডাকো।

এর পরপরই হাজেরা বিবি ঘোরের মধ্যে চলে যান। তাঁর জবান বন্ধ হয়ে যায়।

হাজেরা বিবির খবর পেয়ে হাবীবের জুনিয়র উকিল আব্দুল খালেক এসেছেন। চেম্বারে চিন্তিতমুখে বসে আছেন। তাকে চা দেওয়া হয়েছে, তিনি চা খাচ্ছেন না। আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিলে তিনি যে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন তা প্রকাশ পায় না।

হাবীব চেম্বারে ঢুকতেই আব্দুল খালেক উঠে দাঁড়ালেন এবং ভাঙা গলায় বললেন, কী সর্বনাশ হয়ে গেল!

হাবীব স্বাভাবিক গলায় বললেন, সর্বনাশ এখনো হয় নাই। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুমি এসেছ ভালো হয়েছে, ফরিদের মামলাটা নিয়ে আলাপ করি।

আব্দুল খালেক বললেন, মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আলাপ আজকে থাকুক।

হাবীব বললেন, থাকবে কেন ? কোনো কিছুই ফেলে রাখা ঠিক না। আলোচনাটা জরুরি। জজ সাহেবের মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে যে ফরিদ সাজানো আসামি। *ময়মনসিংহ বার্তা*র একটা কপি কেউ একজন তাকেও দিয়েছে। এখন আমাদের কী করা উচিত বলো ?

বুঝতে পারছি না স্যার।

জজ সাহেবের মনে যদি সন্দেহ ঢুকে যায় তাহলে ফরিদ খালাস পেয়ে যাবে। এটা আমাদের জন্যে খারাপ। তখন মূল আসামির খোঁজ পড়বে। নতুন তদন্ত। কাজেই আমরা চাইব না ফরিদ খালাস পাক।

আমরা করব কী ?

প্যাঁচ খেলাতে হবে। এখন প্রমাণ করতে হবে ফরিদ মূল খুনি। তাকে বাঁচানোর জন্যে এইভাবে মামলা সাজানো হয়েছে।

ফরিদের খুনের মোটিভ কী ?

চিন্তা করে মোটিভ বের করো। আচ্ছা এই মোটিভ কেমন ? ফরিদকে ওই লোক কোনো কারণে চূড়ান্ত অপমান করেছে। যেমন ধরো—নেংটা করে কইতরবাড়ির চারদিকে চক্কর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই রাগ থেকে খুন।

আব্দুল খালেক বললেন, খারাপ না।

হাবীব বললেন, বুড়ি যে বাবুর্চি সাক্ষ্য দিয়েছিল সে আবার নতুন করে সাক্ষ্য দিবে। সে বলবে সকালবেলা বুড়ির কাছ থেকে সে যখন চা নেয় তখন সে বিড়বিড় করে বলছিল, আজ ঘটনা ঘটাব।... বুদ্ধি কেমন ?

খারাপ না।

আমি আইডিয়া দিলাম। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো। এখনই চিন্তা করা শুরু করো।

আব্দুল খালেক বললেন, আপনার মাতা যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে আমি এক বেলা তোলা খাবার পাঠাতে চাই, কিন্তু প্রণব বাবু বললেন, সব বুক হয়ে গেছে।

হাবীব বললেন, এই মৃত্যুই তো শেষ না। আরও তো মৃত্যু হবে। তখন পাঠাবা।

আব্দুল খালেক বললেন, জি আচ্ছা।

দুপুর তিনটার দিকে হাজেরা বিবি চোখ মেলে ডাকলেন, হাবু কই রে! হাবু!

হাবীব দৌড়ে এলেন। হাজেরা বিবি বললেন, খইলসা মাছের সালুন কি হইছে ?

খোঁজ নিতেছি।

তাড়াতাড়ি খোঁজ নে। ক্ষিধায় পরাণ যায়। মাদ্রাসার পুলাপান বিদায় কর, এরার চিৎকারে মাথাব্যথা শুরু হইছে।

এখন কি ভালো বোধ করছেন ?

এক ঘুম দিছি—শরীর ঠিক। ভালো খোয়াবও দেখছি। নাদিয়ার বিবাহ। ওই নাদিয়া কাছে আয়, তোরে নিয়া কী খোয়াব দেখলাম শুন।

নাদিয়া কাছেই ছিল। সে আরও ঘনিষ্ঠ হলো। তার পাশে লাইলী এসে বসলেন। হাজেরা বিবি আনন্দ নিয়ে স্বপ্ন বলতে লাগলেন।

দেখলাম তোর বিবাহ। বিরাট আয়োজন। তোর দাদাও আসছে বিবাহে শরিক হইতে। আমি বললাম, নাতনির বিয়া খাইতে আসছেন খুব ভালো কথা। তার জন্যে আনছেন কী ?

সে বলল, খালি হাতে আসছি।

আমি বললাম, এইটা কেমন কথা! খালি হাতে আসলেন কেন ? নাতনি বইল্যা কথা।

তোর দাদা বলল, আমার নসিব হইছে হাবিয়া দোজখে। সেইখানে আগুন ছাড়া কিছু মিলে না। এই কারণে খালি হাতে আসছি। আগুন হাতে নিয়া আসলে তুমি আবার মন্দ বলতা।

নাদিয়া বলল, দাদি, তোমার শরীর পুরোপুরি সেরে গেছে। তুমি আবার মিথ্যা বলা শুরু করেছ।

হাজেরা বিবি বললেন, দিঘি দেইখা দিঘির পানিতে গোসল করতে মন চাইছে। ব্যবস্থা কর। আমার জোয়ান বয়সে একবার কী হইছে শুন। তোর দাদা বলল, ও বৌ নেংটা হইয়া দিঘির পানিতে সিনান করো। আমি ঘাটে বইসা দেখি তোমারে কেমুন দেখায়। আমি বললাম, আচ্ছা।

হাবীব চট করে সরে পড়লেন। আর সামনে থাকা যায় না।

অনেক রাত।

সফুরা চিঠি পড়তে বসছে। জেলখানা থেকে তার কাছে মাসে দু'টা চিঠি আসে। চিঠি সে পড়তে বসে মাঝরাতে। তার চিঠি পড়ার নিয়ম আছে। সে শুধু যে একটা চিঠি পড়বে তা না। আগের চিঠিগুলোও পড়বে। চিঠি পড়ার পর সবগুলি চিঠি বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘুমাবে।

ফরিদ লিখেছে—

বৌ,

জেলখানায় আমি খুব আনন্দে আছি। আমার এই কথা যে শুনবে সে অবাক হবে। কিন্তু কথা সত্য। আমার আনন্দে থাকার প্রধান কারণ আমি কোনো অপরাধ করি নাই। আমার আনন্দে থাকতে অসুবিধা কী ?

জেলখানায় অনেক কিছু শেখানোর ব্যবস্থা আছে। বেতের কাজ, কাঠের কাজ, কামারের কাজ। আমি কাঠের কাজে ভর্তি হয়েছি। আমার এখনো সাজা হয় নাই বলে কাজে ভর্তি হওয়া সমস্যা। জেলার সাহেবের চেষ্টায় ভর্তি হতে পেরেছি। আমি প্রত্যেকদিন বই পড়ি—এটা দেখে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার কাঠের কাজের ওস্তাদের নাম নুরু। খুনের কারণে তাঁর যাবজ্জীবন হয়েছে। যার যাবজ্জীবন হয় সে বাকিজীবন যে জেলে থাকে তা না। সতেরো বছর জেল খাটার পর ছাড়া পায়। সেই হিসাবে

> আমার ওস্তাদ এক-দেড় বছরের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ওস্তাদ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি আমাকে ফরিদ ডাকেন না। ডাকেন ফড়িং। তিনি কাঠের কাজের বিরাট কারিগর। তাঁর আত্মীয়স্বজন এখন আর কেউ নেই। তার স্ত্রীও গত হয়েছেন। জেল থেকে বের হয়ে কই যাবেন কী করবেন কিছুই জানেন না। আমি তাঁকে বলেছি, ওস্তাদ আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তার মতো ভালো মানুষ আমি দেখি নাই। সে আপনার সব ব্যবস্থা করবে। বউ, আমি ঠিক বলেছি না?

এইটুকু পড়েই সফুরা হাত থেকে চিঠি রাখল। তার পক্ষে আর পড়া সম্ভব না। তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। পানি মোছা মাত্র আবার পানি জমা হচ্ছে। একজন মানুষ এত ভালো কীভাবে হয় সে বুঝতে পারছে না।

সফুরা চিঠিটা একপাশে সরিয়ে রাখল। বাকি অংশ পরে পড়বে। জমা থাকুক। একসঙ্গে পড়লে তো সবই শেষ। সফুরা হাত বাড়িয়ে আরেকটা চিঠি নিল। অনেকবার পড়া চিঠি। তাতে কী?

> বৌ,
>
> গত রাতে সুন্দর একটা বই পড়েছি। বইটার একটা কথা আমার পছন্দ হয়েছে। কথাটা তোমারে বলি। বাঘের চক্ষুলজ্জা আছে, মানুষের নাই। ঘটনা পরিষ্কার করি। তোমার সাথে যদি কোনো বাঘের সাক্ষাৎ হয়, তুমি যদি বাঘের চোখের দিকে তাকাও, আর বাঘ যদি তোমার চোখের দিকে তাকায়, তাহলে বাঘ তোমার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে না। চক্ষুলজ্জা পশুর আছে। মানুষের নাই।...

রাত অনেক।

কিছুক্ষণ আগে দরুদে শেফা পাঠ শেষ হয়েছে। তালেবুল এলেমের দল চলে গেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটাকা করে দেওয়া হয়েছে।

সারা দিনের ক্লান্তি কাটানোর জন্যে প্রণব পুকুরঘাটে বসেছেন। তার সামনে ভাদু। ভাদুর হাতে তালপাখা। সে প্রণবকে বাতাস দিচ্ছে।

প্রণব বললেন, বাতাস লাগবে না। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

ভাদু হাওয়া করতেই থাকল।

প্রণব বললেন, বিরাট ঝামেলা গেছে। এখন শান্তি। ভাদু বলল, স্যার আমি বিরাট কষ্টে আছি। কষ্টের কথা কাউরে বলতে পারতেছি না।

প্রণব বললেন, আমাকে বল।

আপনারে বলতে শরম লাগে।

শরম লাগলেও বল। তুই বোকা মানুষ, তোর আবার শরম কী?

ভাদু বলল, বড় স্যারের আম্মারে কী ডাকব বুঝতেছি না বইল্যা মনে কষ্ট।

প্রণব বললেন, অনেক বড় বড় বোকা আমি দেখেছি। তোর মতো বোকা দেখি নাই। বিরাট জ্ঞানী দেখার মধ্যে যেমন আনন্দ, বিরাট বোকা দেখার মধ্যেও আনন্দ।

ভাদু মাথা নিচু করে আছে। মনে মনে ভাবছে, তুই এক মহাবোকা। তোরে দেখে আমি সবসময় আনন্দ পাই। আমি কী সেই পরিচয় যখন পাবি তখন নিজেই নিজের হাত চাবায়া খায়া ফেলবি।

জানুয়ারির কুড়ি তারিখ। বুধবার।

ভোরবেলা এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া শীতল। গারোপাহাড় থেকে কনকনে হাওয়া আসছে। ডিসট্রিক্ট জজ আবুল কাশেম এজলাশে বসেছেন। তাঁর গায়ে কোট। গলায় মাফলার। এই মাফলার তাঁর মেয়ে শাহেদা নিজের হাতে বুনেছে। অতিরিক্ত ঠান্ডা পড়েছে বলে কোর্টে রওনা হওয়ার সময় মাফলার গলায় দিয়েছিলেন। কাজটা ভুল হয়েছে। মাফলারটা তাঁর কাছে সাপের মতো লাগছে। যেন রঙিন একটা সাপ তাঁর গলা পেঁচিয়ে আছে। মাফলারটাকে সাপের মতো মনে হওয়ার কারণ আছে। শাহেদা নামের যে মেয়ে মাফলার বুনেছে, সে রবিবার ভোরে পালিয়ে কুমিল্লায় চলে গেছে। তিনি খবর পেয়েছেন কুমিল্লায় সে বিয়ে করেছে। বিয়ে করেছে তার গানের টিচারকে। হারামজাদার নাম কিসমত।

আবুল কাশেম গলা থেকে মাফলার খুলতে খুলতে চাপা গলায় বললেন, বদমাইশ কোথাকার!

চাপরাশি বলল, কিছু বললেন স্যার ?

আবুল কাশেম বললেন, পানি দাও। পানি খাব। মাফলারটা নিয়ে যাও।

আবুল কাশেম ঝিম ধরে বসে আছেন। আদালতও ঝিম ধরে আছে। ফরিদের মামলার আজ রায় হবে। খুনের মামলার রায়। আদালত ঝিম ধরে থাকারই কথা।

আবুল কাশেম অস্ফুট স্বরে বললেন, হারামজাদি! এইবার মেয়েকে উদ্দেশ করে বলা। মেয়ে সবার সামনে তাকে বেইজ্জত করেছে। মেয়ের কারণে তাকে সবার কাছে মিথ্যা বলতে হয়েছে। জটিল মিথ্যা—'বাধ্য হয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেয়েকে কুমিল্লায় তার এক ফুপুর কাছে পাঠিয়েছি। পাত্রের বিষয়ে একটা উড়োচিঠি পেয়েছিলাম। আমি কোনো গুরুত্ব দেই নাই। কিন্তু মেয়ের মা অন্যরকম মহিলা। মেয়ে তার অতি আদরের।'

আবুল কাশেম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তার অতি আদরের মেয়ে বিয়ে উপলক্ষে বানানো চল্লিশ ভরি সোনার গয়না এবং নগদ ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এই কাজটা বুদ্ধিমতীর মতো করেছে।

দুই পয়সার গানের টিচার বৌকে খাওয়াবে কী? সাত-আটটা টিউশনি করে কয় পয়সা পাবে?

একবার মনে হয়েছিল মেয়ের নামে মামলা করে দেন। চুরির মামলা। ফৌজদারি মামলা, ৪৫৫/৩৮০ ধারা। পুলিশ মেয়েকে ধরে হাজতে ঢুকাক। বদ মেয়ে। মানুষ যা ভাবে তা করতে পারে না। সামাজিকতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কত স্বপ্ন ছিল! ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিবেন। বিয়েতে অতিথি হিসাবে গভর্নর সাহেব উপস্থিত থাকবেন। পুলিশ লাইন থেকে পুলিশের ব্যান্ডপার্টি আনাবেন, তারা ব্যান্ড বাজাবে। বর রেলস্টেশন থেকে হাতিতে চড়ে আসবে। সুসং দুর্গাপুর থেকে হাতি আসবে। কিছুই হলো না। হারামজাদি চলে গেছে হারামজাদার কাছে। যা বেটি গানবাজনা কর। নাকি সুরে বাকিজীবন রবীন্দ্রসঙ্গীত—'খোলো খোলো দ্বার, রাখিও না আর...।'

আবুল কাশেম আদালতের কার্যক্রম শুরু করলেন। রায় পড়ে শোনালেন। দশ পাতা রায়ের মূল বিষয়—

> সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু না। আসামির খুন পূর্বপরিকল্পিত। তাকে নগ্ন করে ভাটিপাড়ায় ঘোরানোর অপমানের শোধ নেওয়ার জন্যেই সে খুনের পরিকল্পনা করে। সে নিজেই খুনের উদ্দেশ্যে বুলেট সংগ্রহ করে। খুনের পরিকল্পনার কথাও অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে প্রকাশ করে। তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো...

কোর্টরুম নিস্তব্ধ। ফরিদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সফুরা হঠাৎ মাথা ঘুরে বেঞ্চে পড়ে গেল।

রায় পড়া হলো দুপুর একটায়। ঠিক একই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি গেটের সামনে আসাদুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পিস্তল দিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করে পুলিশের এক ডিএসপি, নাম বাহাউদ্দিন। উনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের সেদিনই শুরু। ঢাকা শহরের মানুষ তীব্র রোষে ফেটে পড়ে। শহর হয়ে যায় সমুদ্র, যে সমুদ্রে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ সুনামি।

শহিদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে লাখো মানুষের মিছিল হলো রাজপথে। স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ।

পরের দিনের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার হেডলাইনে লেখা হলো—'মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ। জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট।'

রক্তমাখা শার্ট নিয়ে কবি শামসুর রাহমান তার বিখ্যাত কবিতা লিখলেন—

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়
বর্ষীয়সী জননী সে শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছে মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
শহরে প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

---

* আমানুল্লাহ মোহম্মদ আসাদুজ্জামান।
আসাদের মৃত্যুর পর তাঁর এম. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ইতিহাসে মেধা তালিকায় স্থান করে দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেন।
বাবা : এম. এ তাহের। শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।
মা : মতিজাহান খাদিজা খাতুন। প্রধান শিক্ষিকা, নারায়ণগঞ্জ আই, টি স্কুল।

ঢাকার আন্দোলন ময়মনসিংহ শহরে সেদিন পৌঁছেনি। শহর শান্ত। শহরের কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে। চায়ের দোকানে চা বিক্রি হচ্ছে। চিন্তিত পথচারী সিগারেট খেতে খেতে যাচ্ছে। কাঁধে বাঁদর নিয়ে বাঁদরওয়ালা ঘুরছে।

কোর্ট থেকে ফিরে হাবীব খাওয়াদাওয়া শেষ করে দুপুরে ঘুমাতে গেছেন। তার মধ্যে কোনো উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না। পিয়ন চিঠি দিয়ে গেছে। তিনি চিঠি পড়ছেন। রশিদ তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হাবীব বললেন, সফুরা কি ফিরেছে?

রশিদ বলল, তাকে প্রণব স্যার হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

রায়ের খবর বাড়ির মহিলারা জানে?

জি-না।

হাবীব বললেন, আমার পা টিপার প্রয়োজন নাই। সফুরাকে গিয়ে বলো, হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আমরা আপিল করব। কাগজপত্র হাইকোর্টে যাবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

রশিদ নিচুগলায় বলল, স্যার, আসলেই কি ঠিক হবে?

হাবীব তাকালেন রশিদের দিকে। রশিদ কখনো তাঁর চোখে চোখ তুলে তাকায় না। আজ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে সত্যি কথা বলা প্রয়োজন। রশিদ তার অতি পছন্দের একজন। অনেক কাছের। সব মানুষেরই একজন ছায়া লাগে। রশিদ তাঁর ছায়া।

হাবীব বললেন, ঝামেলা হয়ে গেছে। হাইকোর্ট সাজা বহাল রাখবে। খুনের মামলায় প্রত্যক্ষ সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে।

রশিদ বলল, স্যার, সব তো মিথ্যা!

কিছু মিথ্যা আছে যা একসময় আর মিথ্যা থাকে না, সত্য হয়ে যায়।

একজন নির্দোষ মানুষ ফাঁসিতে ঝুলবে?

হাবীব বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, রশীদ মন দিয়ে শোনো—তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো?

অবশ্যই করি স্যার।

তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, আমার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়বে না। তুমি বলো, বলেছেন?

জি স্যার।

কাজেই যা ঘটছে আল্লাহর হুকুমেই ঘটছে, ঠিক?

রশিদ চুপ করে রইল। হাবীব বললেন, আরও পরিষ্কার করে বলি—পাঁচটা বিষয় আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখেছেন। হায়াত, মউত, রিজিক, ধনদৌলত এবং বিবাহ। মউত কার কীভাবে ঘটবে তা উনি নির্ধারণ করেন। মানুষের এখানে কোনো হাত নাই। ফরিদ ফাঁসিতে ঝুলে মরবে নাকি পাতলা পায়খানা করতে করতে মারা যাবে তা পূর্বনির্ধারিত। এখন পরিষ্কার হয়েছে?

জি।

তাহলে যাও যা করতে বলেছি করো।

রশিদ চলে গেল। হাবীব চিঠি পড়তে বসলেন। একটা চিঠি এসেছে নাদিয়ার শিক্ষক বিদ্যুত কান্তি দে'র কাছ থেকে। হাবীব ভুরু কুঁচকে চিঠি পড়তে শুরু করলেন। এই লোক তাকে কেন চিঠি লিখবে?

জনাব,

আমি বিদ্যুত। আপনার মেয়ে নাদিয়ার শিক্ষক। আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে এই চিঠি।

আমি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এক ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভ ভ্যাকেন্সির চাকরি চলে যাওয়ায় বিরাট বিপদে পড়ি। প্রায় অনাহারে থাকার মতো অবস্থা। তখন হঠাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি পাই। আমাকে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে বলা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জানতে পারি আমাকে Ph.D প্রোগ্রামের স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। গভর্নর মোনায়েম খানের সুপারিশে এই কাজটি হয়েছে।

নাদিয়ার পড়াশোনায় বিরাট বিঘ্ন ঘটেছে। আপনি বিচক্ষণ মানুষ। বিঘ্ন দূর করে নাদিয়ার পড়াশোনা শুরুর ব্যবস্থা করুন। আমার বিনীত অনুরোধ।

আমি ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা করব। এরমধ্যে পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা শেষ করব।

আমি ঈশ্বর-ভগবান এইসবে বিশ্বাস করি না। তারপরেও ঈশ্বরের কাছে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকল সদস্যের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছি।

ইতি

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ

বিদ্যুত কান্তি দে

হাবীব সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় চা খেতে বসে নাদিয়াকে ডেকে চিঠি পড়তে দিলেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, চিঠি হাতে নিয়ে নাদিয়া অল্প অল্প কাঁপছে। তার চোখ ছলছল করছে। হাবীব বললেন, কাঁদছিস কেন ?

নাদিয়া বলল, স্যারের এত ভালো একটা খবর শুনে চোখে পানি এসে গেছে। স্যারকে আমরা কী যে পছন্দ করি! উনার সবচেয়ে বড় গুণ কী জানো বাবা ? উনি মানুষের মধ্যে স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারেন।

তোর মধ্যে কী স্বপ্ন ঢুকিয়েছেন ?

নাদিয়া জবাব না দিয়ে চিঠিটা আবার শুরু থেকে পড়তে শুরু করল। এখনো তার হাত কাঁপছে।

নাদিয়া।

জি বাবা।

হোসনা মেয়েটার কী অবস্থা ? এখন কি কথা বলে ?

না বেশির ভাগ সময় ছাদের চিলেকোঠায় বসে থাকে। তাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখি নাই। কাঁদলে মনে হয় তার ভালো লাগত। বিদ্যুত স্যার যদি কিছুক্ষণ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতেন মেয়েটা ভালো হয়ে যেত।

উনি কি তোর কাছে মহাপুরুষ পর্যায়ের কেউ ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নাদিয়া বলল, বাবা, উনাকে চিঠি লিখে আসতে বলি ? উনি পদ্মকে ঠিক করে দিয়ে যাক।

পদ্ম কে ?

হোসনার নাম আমি পদ্ম রেখেছি।

হাবীব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব। তোর দাদির শরীর এখন খুবই খারাপ, যে-কোনোদিন অঘটন ঘটে যাবে। তুই আপত্তি করিস না।

আপত্তি করব না।

প্রস্তাব দিয়ে প্রণবকে পাঠাই, দেখি কী হয়। কার কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি জানতে চাস না ?

আমি জানি।

ফরিদের মামলার আজ রায় হয়েছে, এই খবর জানিস ?

না তো! মামলার বিষয়টাই আমি কিছু জানি না। মামলা মোকদ্দমা বিষয়ে কেউ আমার সঙ্গে কিছু বলে না।

আমি নিষেধ করে দিয়েছি। আমার মতে পুরুষদের জগৎ আলাদা। মেয়েদের জগৎ আলাদা। মামলা মোকদ্দমা পুরুষদের বিষয়। ভালো কথা, তুই চিঠিটা আবার পড়া শুরু করেছিস কেন ? মুখস্থ করবি ? এটা তো কোনো পাঠ্যবই না।

নাদিয়া চিঠি নামিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে তাকাল। হাবীব মেয়েকে চমকে দিয়ে বললেন, তোর স্যারকে আসতে বল। দেখি সে কীভাবে মানুষের মুখে বুলি ফোটায়। নাদিয়া তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে বাবা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন।

নাদিয়া ক্ষীণ গলায় বলল, বাবা! সত্যি আসতে বলব ?

হ্যাঁ। তোর কাছে আমার একটা উপদেশ আছে।

বলো কী উপদেশ ?

কোনো মানুষকেই মহাপুরুষ ভাববি না। পৃথিবীতে মহাপুরুষ জন্মায় না।

নাদিয়া বলল, বাবা, পৃথিবীতেই মহাপুরুষ জন্মায়। অনেকেই জন্মেছে। ভবিষ্যতেও জন্মাবেন। কয়েকজনের নাম বলব বাবা ?

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। পিচ্চি মেয়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ শুরু করার কিছু নেই।

প্রণব শুকনা পাতা জড়ো করে আগুন করেছেন। ঝাটা হাতে ছোটাছুটি করছে ভাদু। সে বাগান থেকে শুকনা পাতা নিয়ে আসছে। তার উৎসাহের সীমা নাই। প্রণব বললেন, আর লাগবে না। তুই তো শুকনা পাতার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিস। কাছে বস, আগুনে শরীর গরম কর।

শরীর গরম করব না স্যার।

করবি না কেন ?

শরীর গরম করতে শরম পাই।

প্রণব হেসে ফেললেন। তাঁর মনে হলো ভাদুর মতো বুদ্ধিহীন হয়ে জন্মালে জীবনটা সুখের হতো। জগতের কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করত না। তিনি মাথা থেকে ফরিদের বিস্মিত চোখ সরাতে পারছেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন আগুনের দিকে। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে বাঁ-পাশে ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকালেন বাঁদিকে, মনে হলো ফরিদ এখন ঠিক তার পেছনে।

> 'তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।'
>
> কেন তোমাকে বধ করেছি তার কারণ শোনো...

প্রণবের মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। যতই সময় যাবে যন্ত্রণা বাড়বে। এই যন্ত্রণা কতদিন থাকবে কে জানে।

ভাদু!

জে স্যার।

একটা গল্প বল।

ভাদু সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল—এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজা তিনটা শাদি করেছে কিন্তু পুত্রসন্তান হয় নাই। খালি কন্যাসন্তান হয়। রাজা হইল বেজার। হাঁক দিয়া মন্ত্রী ডাকল। বলল, ও মন্ত্রী। মন্ত্রী বলল, জে। রাজা বলল, আমার মন বেজার হইছে...

ভাদু গল্প বলে যাচ্ছে। হাত-পা নেড়ে গল্প। গল্পে অভিনয় অংশও আছে। প্রণব তাকিয়ে আছেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে ভাদু কী সুখেই না আছে।

মহসিন হলে আমার সিঙ্গেল সিটের রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি জানালার দিকে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। জানালা বিশাল। শীতের হাওয়া আসছে। গায়ে চাদর দিয়েছি। চাদরের ওম ওম উষ্ণতা। আমার হাতে টমাস হার্ডির লেখা বই *এ পেয়ার অব ব্লু আইজ*। মূল ইংরেজি বই না, অনুবাদ। আমি মুগ্ধ হয়ে প্রেমের উপন্যাস পড়ছি।

হল ছাত্রশূন্য। প্রতিদিনই মিটিং মিছিল চলছে। রাস্তায় নামলেই মিছিলে ঢুকে যেতে হয়। দেড় দু'মাইল হাঁটা। মিছিলে হিংস্রভাব চলে এসেছে। পুলিশের পাশাপাশি নেমেছে ইপিআর। পুলিশ রাস্তায় থাকে। ইপিআর ট্রাকের ওপর। পুলিশের চোখে থাকে আতঙ্ক, পাশাপাশি ইপিআরদের দেখায় যমদূতের মতো। কী প্রয়োজন এইসব ঝামেলায় যাবার! আমি 'দু'টি নীল চোখ' নিয়ে ভালোই তো আছি। 'য পলায়তি স জীবিত'। যে পালিয়ে থাকে সে-ই বেঁচে থাকে। আমি পালিয়ে আছি। তবে খুব যে সুখে আছি তা না। আমার প্রচণ্ড চিন্তা আমার পুলিশ অফিসার বাবাকে নিয়ে। মানুষজন আধাপাগলের মতো হয়ে গেছে। পুলিশ দেখলেই ইট মারছে। ধাওয়া করছে।

একদিন ডাইনিং হলে খেতে বসেছি, আমার ঠিক সামনে বসা এক ছাত্র গল্প করছে—কী করে তারা দৌড়ে এক পুলিশ কনস্টেবলকে ধরে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। মাথা থেঁতলাবার আগে আগে সে নাকি বলছিল—বাবারা, আস্তে বাড়ি দিয়ো। আস্তে। গল্প শুনে আশেপাশের সবাই হেসে উঠল। আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলাম, আমার বাবার মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হচ্ছে। বাবা বলছেন, আস্তে মারো। আস্তে। আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম।

জনতার আক্রোশ সরকারের দিকে। সরকারকে তারা হাতের কাছে পাচ্ছে না। পাচ্ছে ঠোল্লা অর্থাৎ পুলিশকে। তাদের স্লোগানে আছে—একটা দুইটা ঠোল্লা ধরো, সকাল বিকাল নাশতা করো।

'৬৯ সনে ছাত্রজনতার ঘৃণা এবং রাগের কেন্দ্রবিন্দুর পুলিশরাই আবার মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকসেনার বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারী। ইতিহাসের কী আশ্চর্য খেলা!

থাক এই প্রসঙ্গ, হলের গল্পে ফিরে যাই। *এ পেয়ার অব ব্লু আইজ* অনেকক্ষণ পড়া হয়েছে। এখন ব্যক্তিগত মিছিলে অংশ নেওয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত মিছিল হলো, করিডরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাওয়া। এই হাঁটাহাঁটির সময় অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে ভালো লাগে। বয়সের কারণেই হয়তো আমার চিন্তায় একজন তরুণী থাকে। যে সারাক্ষণই আমার হাত ধরে থাকে। তরুণীর গা থেকে বাসি বকুল ফুলের সৌরভ ভেসে আসে।

কল্পনার বকুলগন্ধা তরুণী পাশে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি এমন সময় এক কাণ্ড—কানে এল ডিম ভাজার শব্দ। প্রতিটি রুম তালাবন্ধ। বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। এর মধ্যে একটা ঘরের ভেতর ডিম ভাজা হচ্ছে, এর অর্থ কী ? কানে কি ভুল শুনছি ? যে রুম থেকে ডিম ভাজার শব্দ আসছে আমি তার সামনে দাঁড়ালাম। চামচের টুং টাং শব্দ। পায়ে হাঁটার শব্দ। আমি দরজায় টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সব শব্দের অবসান। কিছু রহস্য অবশ্যই আছে। রহস্যটা কী ? আমি নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। রহস্যের কিনারা করতে হবে। (পাঠক, মিসির আলির জন্মলগ্ন।) রহস্যের সমাধান করলাম। এখন সমাধানের ধাপগুলি বলি—

১. ওই ঘরে একজন বাস করে। তাকে লুকিয়ে রাখতে হয় বলেই বাইরে থেকে তালা দেওয়া।
২. সে ঘরেই খাওয়াদাওয়া করে। ডিম ভাজার শব্দ তার প্রমাণ।
৩. সে বেশ কিছুদিন ধরেই ওই ঘরে আছে। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বাস করলে ডিম ভেজে খেত না।
৪. চামচের টুং টাং শব্দ থেকে মনে হয় সে একজন মেয়ে। মেয়েদের চামচের শব্দের ভঙ্গি আলাদা। পুরুষ জোরে শব্দ করে।
৫. তাকে কেউ আটকে রাখেনি। আমি দরজায় টোকা দিয়েছি, সে চুপ করে গেছে। বন্দি কেউ হলে নিজেকে ঘোষণা করত।

সন্ধ্যাবেলায় আমি গেলাম হাউস টিউটর অধ্যাপক ইমরানের কাছে। আমি তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। অধ্যাপক ইমরান চোখ কপালে তুলে বললেন, তোমার মাথা খারাপ। তুমি মাথার চিকিৎসা করাও।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

জি আচ্ছা না। কাল পরশুর মধ্যে ডাক্তার দেখাবে।

জি আচ্ছা স্যার।

ইমরান স্যার বললেন, পড়াশোনায় মন দাও। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তোমার মাথায় শয়তান কারখানা বানিয়েছে। যাও আমার সামনে থেকে। বিদায়।

আমি বিদায় হলাম। রাত আটটায় ইমরান স্যার দু'জন অ্যাসিসটেন্ট হাউস টিউটর নিয়ে আমার ঘরে উপস্থিত। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কোন ঘরে মেয়ে আটকে রাখা হয়েছে আমাকে দেখাও। যদি কিছু না পাওয়া যায় তোমাকে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়াব।

রুমটা স্ট্যাটিসটিক্সের ছাত্র আবু সুফিয়ানের। সে তার ঘরে ছিল। ইমরান স্যার দলবল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আমি রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রুম খালি, রুমে কেউ নেই। আমার কলিজা মোচড় দিয়ে উঠল। কী সর্বনাশ!

সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার কী ব্যাপার?

ইমরান স্যার বললেন, কোনো ব্যাপার না। রুটিন চেক। তুমি কি ঘরে ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করো? ইলেকট্রিক হিটার দেখতে পাচ্ছি। হিটার জব্দ করা হলো। এখন নিব না। সকালে তুমি অফিসে জমা দিবে।

জি আচ্ছা স্যার।

পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে, নাকি মিটিং মিছিল নিয়ে আছ?

ঠিকমতো পড়ছি স্যার।

ইমরান স্যার উঠলেন। রুম থেকে বের হওয়ার সময় কাপড় রাখার কাবার্ড থেকে হঠাৎ কাচের চুড়ির টুং শব্দ পাওয়া গেল। ইমরান স্যার থমকে দাঁড়ালেন। কাবার্ড খুললেন। ষোল-সতেরো বছরের একজন তরুণী মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে। তার চোখভর্তি পানি।

জানা গেল এই তরুণীকে সুফিয়ান বিয়ে করেছে। বিয়ে আত্মীয়স্বজন কেউ স্বীকার করেনি। মেয়েটির থাকার জায়গা নেই বলে সুফিয়ান তাকে হলে এনে তুলেছে। গত ছয় মাস ধরে সে এখানেই আছে। অমানবিক এক জীবনযাপন করছে। মেয়েটিকে পশুর এক জীবন থেকে আমি উদ্ধার করেছি এতে সন্দেহ নেই। আবার মেয়েটির স্বামীকে এই কারণেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই।

মেধাবী এই ছাত্রকে গুরুতর অপরাধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দু'বছরের জন্যে বহিষ্কার করে। সুফিয়ান দু'বছর পর আবার পড়াশোনায় ফিরে আসে। পড়াশোনা শেষ করে, দেশের বাইরে থেকে Ph.D ডিগ্রি এনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করে।

আমার কাছে '৬৯-এর গণআন্দোলনের একটি দিক হলো বন্দিনী এক তরুণী।

হলের রিডিংরুমে দেশের সব ক'টা খবরের কাগজ আসে। আমি প্রতিটি খবরের নিবিষ্ট পাঠক। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি জানার জন্যে কাগজ পড়ি তা কিন্তু না। আমার প্রধান আকর্ষণ চন্দ্র অভিযান বিষয়ে। আমেরিকা চাঁদে মানুষ পাঠাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্বপ্ন পূরণের জন্যে আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজে রোজই কোনো-না-কোনো খবর ছাপা হয়। তৈরি হচ্ছে এপলো ১১, চন্দ্রতরীর নাম ইগল, পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে লাগবে চার দিন। নভোচারীদের একজনের নাম নীল আর্মস্ট্রং, তাঁর পছন্দের খাবার ইতালির পিজা। তাঁর বাচ্চা মেয়ে বাবাকে বলেছে—বাবা, চাঁদকে তুমি আমার হয়ে একটা চুমু দিবে। কেমন ?

মজার মজার কত খবর। পড়লে অদ্ভুত লাগে। সত্যি সত্যি মানুষ চাঁদে পা দিবে! আমি দেখে যেতে পারব। আমি এত ভাগ্যবান ?

চন্দ্র অভিযানের আনন্দময় খবরের পাশাপাশি ভয়ঙ্কর সব খবর। পড়লে দমবন্ধ হয়ে আসে। তবে মাঝে মাঝে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো ঘটনাও ঘটে। পহেলা ফেব্রুয়ারি এরকম এক ঘটনা ঘটল। আয়ুব খান বেতার ভাষণে বললেন, শীঘ্রই আলাপ আলোচনার জন্যে আমি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাব।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেমিস্ট্রির বইখাতা খুললাম। ধুলা ঝাড়লাম। সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এখন কেমিস্ট্রির বইখাতা খোলা যেতে পারে।

পনের দিনের মাথায় ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, বন্দি পালাতে যাচ্ছিল বলে তাকে গুলি করা হয়েছে। ঘটনা এখন ঘটলে বলা হতো 'ক্রসফায়ার'। পাকিস্তান সরকারের মাথায় ক্রসফায়ারের বুদ্ধি আসেনি।

আবারও কেমিস্ট্রির বইখাতা বন্ধ। জমুক ধুলো কেমিস্ট্রির বইখাতায়।

১৬ ফেব্রুয়ারি খবর বের হলো, পিণ্ডিতে আয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে সেই আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন।

আবার আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস। যাক সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এখন ভাসানী কোনো ঝামেলা না করলেই হলো। এই মানুষটা বাড়া ভাত নষ্ট করতে পারদর্শী। হে আল্লাহ, তাঁকে সুমতি দাও। সব যেন ঠিক হয়ে যায়। দেশ শান্ত হোক। দেশ শান্ত হোক।

মাওলানা ভাসানীর সেই সময়ের কাণ্ডকারখানা আমার কাছে যথেষ্টই রহস্যময় মনে হচ্ছিল। আয়ুববিরোধী আন্দোলনে তিনি যাননি। আয়ুব খানের

ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। একসময় মিছিলে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে গেল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছি। বুক ফুলিয়ে হাঁটছি। মিছিল শুরু হয়েছে পল্টন ময়দানে। শহিদ মতিয়ুরের জানাজা শেষের মিছিল। মিছিল কোনদিকে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি একসঙ্গে এত মানুষ জীবনে দেখিনি। মিছিল ইকবাল হলে শেষ হলো। সেখানে বক্তৃতা করেন শহিদ মতিয়ুরের বাবা। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আমি হাজার মতিয়ুরকে পেয়েছি।

পুত্রহারা কোনো বাবার বক্তৃতা দেওয়ার মানসিকতা থাকার কথা না। তিনি দিতে পেরেছেন কারণ তিনি সত্যি সত্যি তাঁর সামনে লক্ষ মতিয়ুরকে দেখেছিলেন।

মিটিং-এর পরপর চারদিকে নানান গণ্ডগোল হতে লাগল। পুলিশের গুলি, কাঁদানে গ্যাস। শুধু যে ঢাকায় গণ্ডগোল হচ্ছে তা-না। সারা পূর্বপাকিস্তানেই। গুজব রটল সেনাবাহিনী তলব করা হচ্ছে। সন্ধ্যা থেকে কার্ফু দেওয়া হবে।

আনিস ভাই বললেন, হলে ফিরে যাবে ?

আমি বললাম, না।

আমরা এক মিছিল থেকে আরেক মিছিলে ঘুরতে লাগলাম। মেয়েদের একটা মিছিল বের হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিল ইডেন কলেজের মেয়েরা। তাদের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উগ্র। মেয়েদের মিছিল দুই ট্রাক ইপিআরের সামনে পড়ল। মেয়েদের একজন এগিয়ে গেল। কঠিন গলায় বলল, গুলি করতে চান ? করুন গুলি। যদি সাহস থাকে গুলি করুন।

তরুণীর দৃপ্ত ভঙ্গি, কণ্ঠের বলিষ্ঠতা এখনো চোখে ভাসে।

সন্ধ্যার পরপর ঢাকা শহরে সত্যি সত্যি সেনাবাহিনী নামল। গভর্নর মোনায়েম খান বেতার এবং টেলিভিশনে ঘোষণা করলেন, বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। শহরের নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করা হয়েছে। পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ থাকবে।

আমি হলে ফিরে এসেছি। বাইরের ঝড়ের জগৎ থেকে ব্যক্তিগত শান্তির জগতে। আমার হাতে টমাস হার্ডির প্রেমের উপন্যাস। আমি নীল নয়না এক তরুণীর দুঃখগাথা পড়ছি। আবেগে আমার চোখ ভিজে ভিজে উঠছে।

আজ হাসান রাজা চৌধুরীর বিয়ে।

এক লাখ টাকা কাবিন। অর্ধেক গয়নাতে উসুল। বাকি অর্ধেক কনের হাতে নগদ দেওয়া হবে। ব্যাংক থেকে টাকা এনে রেশমি রুমালে বেঁধে সিন্দুকে তুলে রাখা হয়েছে।

কনের নাম রেশমা।

বিয়ে হবে জুমার নামাজের পর। বিয়ে পড়াবেন মৌলানা তাহের উদ্দিন জৈনপুরী। ধর্মপাশা থেকে এই উপলক্ষে তাঁকে আনা হয়েছে। তিনি এসেই মসজিদে চিল্লায় বসেছেন। বিশেষ বিশেষ বিবাহে মৌলানা তাহের উদ্দিন জৈনপুরী আলাদা কিছু কর্মকাণ্ড করেন। হাসান রাজা চৌধুরীর বিয়ে একটি বিশেষ ঘটনা।

বিয়েতে বড় কোনো উৎসব হচ্ছে না। নাইওরিদের আনা হয়নি। হাসান রাজা চৌধুরীর বাবা হাজি সাহেব পুত্রের বিয়ের উৎসব পরে করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে আজ রাতে অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকজনদের জন্যে শাহি খানার ব্যবস্থা হচ্ছে। চারটা খাসি, একটা গরু জবেহ করা হয়েছে। পোলাও, খাসির মাংসের কোরমা, গরুর মাংস। বাবুর্চি নেত্রকোনা থেকে এসেছে। বাবুর্চির নাম মনা বাবুর্চি। মনা বাবুর্চিরও কিছু নিয়ম আছে। ডেগশুদ্ধি তার একটি। সে মন্ত্রপাঠ করে কাঁচা হলুদ, আদা এবং কাঁচা সরিষা দিয়ে ডেগ শুদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়া মনা বাবুর্চি পেয়েছে তার ওস্তাদ হাজি গনি বাবুর্চির কাছ থেকে। হাজি গনি বাবুর্চি ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিখ্যাত বাবুর্চি। জ্বিনের বাদশা নাকি তার মেয়ের বিয়ের খানা পাকানোর জন্যে গনি বাবুর্চিকে কোহকাফ নগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গল্প প্রচলিত আছে। অনেকেই এই গল্প বিশ্বাস করে। গনি বাবুর্চিকে গল্পের সত্যতা বিষয়ে প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। মাথা নিচু করে হাসেন।

ডেগশুদ্ধি প্রক্রিয়া এরকম—একটা থালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ডেগের ভেতর নামিয়ে দেওয়া হয়। থালায় থাকে কাঁচা হলুদ, আদা এবং রাই সরিষা। মনা বাবুর্চি গোসল করে নতুন লুঙ্গি পরে মন্ত্রপাঠ করে ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভায়। ডেগ শুদ্ধ হয়।

মন্ত্রটা নিম্নরূপ—

আলির ডেগ, কালীর ডেগ
রসুল বলে দেখে দেখ
কালী দেখি আলি দেখে
ভূত প্রেত চেখে দেখে
ভূতের মায়ের তিন পুত
ডেগের ভিতরে লাল সূত
লাল সূতে গিট্টু।

ইত্যাদি...

বিয়ের কনে রেশমা সকাল থেকেই তার মা'র সঙ্গে আছে। রেশমা যথেষ্ট হাসিখুশি। তার মা রাশেদা মূর্তির মতো মেয়ের পাশে আছেন। কিছুক্ষণ পরপর তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। তিনি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন। তারা দু'জন যে ঘরে আছে, তার দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। রাশেদাকে বলা হয়েছে এজিন নেওয়ার জন্যে যখন সাক্ষীরা কাজি সাহেবকে নিয়ে আসবেন, তখনই তালা খোলা হবে; তার আগে না।

রাশেদা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, অনেক জালিম দেখেছি এমন জালিম দেখি নাই।

রেশমা বলল, কয়টা জালিম দেখেছ মা?

রাশেদা জবাব দিলেন না। রেশমা বলল, তুমি কোনো জালিমই দেখো নাই। কথার কথা বলছ।

চুপ থাক।

আমি চুপ থাকব। তুমি কান্দন থামাও।

এজিন নিতে যখন আসবে, তুই খবরদার এজিন দিবি না। দেখি বিয়া কীভাবে হয়।

রেশমা বলল, এজিন না দিলেও বিয়ে হয়ে যাবে।

কীভাবে?

রেশমা বলল, সাক্ষীরা বলবে মেয়ে ফিসফিস করে কবুল বলেছে, আমরা শুনেছি। তারপর রাতে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিবে। বিয়ে না করেও পরপুরুষের সঙ্গে শুতে হবে। এরচেয়ে বিয়ে হওয়া ভালো না?

রাশেদা মেয়ের গালে সশব্দে চড় বসালেন। রেশমার কোনো ভাবান্তর হলো না। তার হাসিমুখ হাসিহাসি থাকল। রাশেদা চাপা গলায় বললেন, ঠিক করে বল তুই খুনিটারে বিয়ে করতে চাস?

রেশমা তার মা'কে চমকে দিয়ে বলল, চাই।

কী জন্যে চাস?

উনারে আমার ভালো লাগে।

মাকাল ফল দেখস নাই? মনে হয় কী সুন্দর, ভিতরে বিষ।

রেশমা বলল, একটা ভালো জিনিস কী জানো মা? উনি বাইরে সুন্দর ভিতরে বিষ এইটা আমরা জানি। অন্যের বিষয়ে জানব না। আগে থেকে জানা থাকা ভালো না মা?

রাশেদা চাপা গলায় মেয়েকে অতি কুৎসিত কিছু কথাবার্তা বললেন। যার সারকথা হচ্ছে—রূপবান ছেলে দেখে রেশমার শরীর উজায়ে গেছে। শরীরে জ্বলুনি হচ্ছে। জ্বলুনি কমানোর জন্যে কাউকে দরকার। সেটা যদি পশু হয় তাতেও তার মেয়ের কোনো সমস্যা নাই। বরং পশু হলেই সে খুশি।

রেশমা বলল, খুব খারাপ কথাও যে তুমি এত সুন্দর করে বলতে পারো আমি জানতাম না। তোমার কাছ থেকে খারাপ কথা শিখব মা। বিয়ের পর খারাপ কথা বলায় দোষ নাই। বিয়ের আগে দোষ।

বিয়ের জন্যে হাসান রাজাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। নাপিত এসে ভোরবেলায় তার চুল কেটে নতুন ধুতি দিয়ে গেছে। নিমপাতা এবং কাঁচা হলুদ দিয়ে তাকে গোসল দেওয়া হয়েছে। গোসলের পানিতে সোনা-রুপা রাখা হয়েছে। হাসানের গোসলের পর কনের গোসল দেওয়া হবে। কনের গোসলের নিয়মকানুন ভিন্ন। তাকে গোসল দিবে তিন সধবা। গোসলের দৃশ্য কোনো বিধবা দেখতে পারবে না। কাজেই রেশমার মা গোসলের সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

গোসলের পর হাসানকে হাজি সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। হাসান বাবার সামনে জলচৌকিতে বসে আছে। হাজি সাহেব তামাক খাচ্ছেন। তাঁকে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হাজি সাহেব বললেন, তুমি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট?

হাসান বলল, না।

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের ব্যবস্থা করেছি, অসন্তুষ্ট হবার কথা। আমার কিছু যুক্তি আছে। যুক্তিগুলো শোনো।

হাসান বলল, আমি বিয়েতে রাজি হয়েছি এটাই যথেষ্ট। যুক্তি শোনার প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আছে। মন দিয়ে শোনো। তুমি যে অপরাধ করেছ তার পাপ এই বিয়েতে কিছু কাটা যাবে।

হাসান বলল, পাপ কাটাকাটি তো আপনি করছেন না। আপনি কীভাবে জানেন পাপ কাটা যাবে ? আরও পাপ যুক্ত হতে পারে।

কথার মাঝখানে কথা বলবা না। বেয়াদবিও করবা না।

আর কথা বলব না। আপনার যা বলার বলুন।

তোমার মামলা যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল সেভাবে অগ্রসর হয় নাই। আমি যথেষ্ট চিন্তায় আছি। উকিল সাহেব বলেছেন উচ্চ আদালতে ফরিদ ছাড়া পাবে।

ছাড়া পেলে ভালো। না পেলেও ক্ষতি নাই। আমি সুখে সংসার করব।

তোমার কথাবার্তার ধরন ভালো লাগল না। তুমি অস্থির আছ। অস্থির মানুষ এমন কথা বলে। বিবাহের পর তোমার অস্থিরতা কমবে ইনশাল্লাহ্।

আপনার কথা শেষ হয়েছে, নাকি আরও কিছু বলবেন ?

আরও কথা বলার ইচ্ছা ছিল। তোমার যে অবস্থা আমার কথা মন দিয়া শুনবা না।

আপনার কথা বলার কথা, আপনি কথা বলেন। আমার মতো আপনি নিজেও অস্থির। কথা বললে আপনার অস্থিরতাও কমবে।

স্ত্রী স্বামীর জন্যে সৌভাগ্য নিয়ে আসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে সৌভাগ্য নিয়ে আসবে। তোমার সৌভাগ্যের প্রয়োজন আছে।

হাসান রাজা হাসল।

আমাকে কদমবুসি করে দোয়া নাও। তোমার মায়ের কবর জিয়ারত করো। পিতামাতার দোয়া নাও। বিবাহ হয়ে যাক, একসঙ্গে খানা খাব।

কনের গোসল দেওয়া হচ্ছে।

তিনজন সধবা গোসল দিচ্ছেন। একটু দূরে বিয়ের গান হচ্ছে।

পিঁড়িতে বসিছে কন্যা
গোসল করিবায়
কইন্যার নানি দূরে বইসা
এইদিক ওইদিক চায়
জলে ভেজা কন্যার চোখে
তিন সাগরের পানি
চোখ মুছ সিনান কইন্যা
এখন নাও দৌড়ানি...

রাশেদা তার ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছেন। কেঁদে তিনি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। তাঁর ইচ্ছা করছে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে। দরজায় তালা লাগানো বলে তা সম্ভব হচ্ছে না।

বাদ জুমা বিয়ে পড়ানো হলো। তার পরপরই নৌকা নিয়ে প্রণব উপস্থিত হলেন। হাজি সাহেবের হাতে হাবীব খানের চিঠি দিলেন। হাজি সাহেব চিঠি পড়লেন। প্রণবকে বললেন, পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। সিনান করেন। আসেন একসঙ্গে খানা খাই। চিঠিতে কী লেখা আপনি কি জানেন?

প্রণব বললেন, জানি না। চিঠিটা জরুরি এটা শুধু জানি।

উকিল সাহেব তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমার জন্যে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। একটু ঝামেলা আছে, সেটা বড় কিছু না। সামান্য ঝামেলা।

কী ঝামেলা?

কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলের বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

প্রণব অবাক হয়ে বললেন, এটা কোনো বড় ঝামেলা না? সামান্য ঝামেলা? আপনি বলেন কী!

হাজি সাহেব বললেন, বিয়ে হয়েছে কিন্তু ছেলের সঙ্গে মেয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। দু'জন আলাদা আছে। এই অবস্থায় তালাক হয়ে যাবে।

কী সর্বনাশ!

চমকায়ে উঠলেন কেন? চমকায়ে উঠার মতো কিছু বলি নাই। বাস্তব কথা বলেছি। আমি বাস্তব লোক।

প্রণব ইতস্তত করে বললেন, তালাক হওয়া পাত্রের সঙ্গে স্যার মেয়ে বিবাহ দিবেন এটা মনে হয় না। এটাও একটা বাস্তব কথা। আমার স্যারও বাস্তব লোক।

হাজি সাহেব বললেন, অবশ্যই বাস্তব কথা। হাবীব খান সাহেব সব ঘটনা জানার পর যদি মেয়েকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন আমি বলব, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি না দেন তাহলেও বলব, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

সবকিছুতে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ বললে তো ঝামেলাই শেষ।

হাজি সাহেব বললেন, আমি ঝামেলা শেষ করতে পছন্দ করি। ঝামেলা হলো মরা লাশ। মরা লাশ কবর দিতে হয়। পুষতে হয় না।

দুপুরে খাওয়ার পর হাজি সাহেব রাশেদাকে ডেকে পাঠালেন। রাশেদা কঠিন মুখ করে তার সামনে বসলেন। তাঁর চোখ লাল। নাকের পাতা ফুলে ফুলে উঠছে। তিনি কান্না থামানোর চেষ্টা করছেন। হাজি সাহেব বললেন, জোর করে আমি

তোমার মেয়ের সঙ্গে হাসানের বিয়ে দিয়েছি। আমি শরমিন্দা। এটা একটা বড় ভুল হয়েছে। তবে সব ভুলের সংশোধন আছে।

রাশেদা বললেন, এই ভুলের সংশোধন নাই।

হাজি সাহেব বললেন, তুমি ঠিক বলো নাই। এই ভুলেরও সংশোধন আছে।

কী সংশোধন ?

বিবাহ বাতিলের ব্যবস্থা করলেই সংশোধন হয়। তালাকের ব্যবস্থা করা যায়।

রাশেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তালাক!

হুঁ।

আপনি নতুন খেলা কী খেলতে চান আমি বুঝতে পারলাম না।

খেলা ভাবলে খেলা। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে যা পেয়েছি তা হলো, এই বিবাহ সুখের হবে না। কাজেই তালাকই ভালো।

চিন্তাভাবনা আগে করতে পারতেন।

তা পারতাম। এইখানে আমি ভুল করেছি। আরও বড় ভুল যেন না হয় তার জন্যেই তালাকের ব্যবস্থা। তুমি এখন মেয়ের কাছে যাও। মেয়েকে বলো তালাক দিতে। আমি আমার ছেলেকে চিনি। সে তালাকে রাজি হবে না।

আমার মেয়ে রাজি হবে ?

হাজি সাহেব বললেন, তোমার মেয়েও সহজে রাজি হবে না। আমি অনুসন্ধানে পেয়েছি, তোমার মেয়ে হাসানকে পছন্দ করে। যাই হোক, তোমার দায়িত্ব মেয়ের হাতেপায়ে ধরে মেয়েকে রাজি করানো।

রাশিদা বললেন, তালাকের পিছনে অন্য কী ঘটনা আছে সেটা বলেন।

অন্য কোনো ঘটনা নাই। তবে দুপুরে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমায়ে পড়েছিলাম, তখন একটা খোয়াব দেখি। সেটাও একটা কারণ হতে পারে। কী খোয়াব দেখেছি শুনতে চাও ?

শুনতে চাই না। আমার কাছে খোয়াবের কোনো দাম নাই।

আচানক কথা বললা। অনেক বড় বড় ঘটনার বিষয়ে খোয়াবের মাধ্যমে ইশারা আসে। মানুষকে সাবধান করার জন্যে আল্লাপাক খোয়াবের ব্যবস্থা করেন।

কী খোয়াব দেখেছেন ?

দেখলাম হাসান আর তোমার মেয়ে ছাদে হাঁটছে। তোমার মেয়ে আনন্দে আছে। হঠাৎ হাসান তাকে ধাক্কা দিল। তোমার মেয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেল। খোয়াব এই পর্যন্তই।

আপনার ছেলে একটা খুন করেছে। আপনার মাথায় আছে খুনের বিষয়। এই কারণে খোয়াবে আরেকটা খুন দেখেছেন।

তোমার জ্ঞান বেশি হয়েছে বিধায় জ্ঞানের কথা বলা শুরু করেছ। আমার জ্ঞান অল্প যে কারণে আমি খোয়াবকে দেখি আল্লাপাকের ইশারা হিসাবে। কথা বলে তুমি অনেক সময় নষ্ট করেছ, এখন যাও মেয়েকে রাজি করাও।

রাশেদা বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। তালাকের প্রয়োজন নাই। রেশমার কপালে যা আছে তা-ই ঘটবে।

হাজি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, তোমাকে যা করতে বলেছি করো। পানশি প্রস্তুত আছে। তালাকের পরই তুমি মেয়ে নিয়ে চলে যাবে। কাবিনের টাকা তোমার মেয়ের থাকবে। গয়না যা দিয়েছি তাও থাকবে। গয়নার মধ্যে হাসানের মায়ের একটা চন্দ্রহার আছে। সেটা শুধু ফেরত দিবা। আরেকবার যখন হাসানের বিবাহ হবে তখন এই হারের প্রয়োজন হবে। এটা মায়ের একটা স্মৃতি।

সন্ধ্যাবেলা রাশেদা মেয়েকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। তালাকপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রণবও ভিন্ন নৌকায় সন্ধ্যাবেলায় দু'টা প্রকাণ্ড চিতল মাছ নিয়ে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে হাজি সাহেবের চিঠি। চিঠিতে লেখা—

> জনাব হাবীব খান সাহেব,
>
> আসসালামু আলায়কুম। পর সমাচার আপনার পত্র পাইয়া অতি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আপনার প্রস্তাব আমার পুত্রের প্রতি বিরাট দোয়াস্বরূপ। আপনার কন্যাকে পুত্রবধূ হিসাবে পাওয়াও আমার জন্যে মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার। বাকি আল্লাপাকের ইচ্ছা।
>
> সামান্য ঝামেলা অবশ্য আছে। এই ঝামেলার বিষয়টা আপনি প্রণব বাবুর নিকট জানিবেন।
>
> আমি প্রস্তুত আছি। আমার পুত্রও প্রস্তুত আছে।
>
> ইতি
>
> হাজি রহমত রাজা চৌধুরী

প্রণবের সঙ্গে আরেকটি চিঠি আছে। চিঠিটা নাদিয়ার জন্যে। পত্রলেখকের নাম হাসান রাজা চৌধুরী। হাসান লিখেছে—

> নাদিয়া,
>
> আপনি কেমন আছেন ? আপনি বলেছিলেন, আমাদের

কইতরবাড়ি দেখতে আসবেন। প্রণব বাবুকে হঠাৎ দেখে মনে হলো আপনিও এসেছেন। আমি আগ্রহ নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নাদিয়া কোথায়? আমি ভেবেছিলাম আপনি প্রণব বাবুকে নিয়ে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন।

আজ দুপুরে আমার বিয়ে হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বিয়ে ভেঙে গেছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার নাম রেশমা। মেয়েটা বালিকা স্বভাবের। এই ধরনের মেয়েরা বৃদ্ধা হওয়ার পরেও তাদের বালিকা স্বভাব থেকে যায়।

আপনাকে এই চিঠিটা লেখার উদ্দেশ্য একটা আশ্চর্য ঘটনা জানানো। ঘটনা ঠিক না, অভিজ্ঞতা। বিয়ে এবং বিয়ে ভাঙার অভিজ্ঞতা।

রেশমা (যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার নাম) এবং তার মা বিয়েতে রাজি ছিল না। তাদের রাজি না হওয়ার কঠিন কারণ ছিল। বিয়ে জোর করে দেওয়া হয়। আমি নিজে আপত্তি করতে পারতাম। আপত্তি করিনি। আমার মধ্যে গা ছেড়ে দেওয়া ভাব চলে এসেছে। যা হওয়ার হবে এই ভাব। ঘটনা প্রবাহে বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা কারও নেই—এই বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকে গেছে।

যাই হোক বিয়ে হলো। আয়নায় তাকে দেখানো হলো। দেখলাম মেয়েটা কাঁদছে কিন্তু তার ঠোঁট হাসিমাখা। হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত আনন্দ হলো। মনে হলো, এই মেয়ে আমার একটি অংশ। সে আমার সঙ্গে হাসবে, আমার সঙ্গে কাঁদবে। খুব ইচ্ছা করল বলি, এই মেয়ে, আর কাঁদবে না। এখন থেকে শুধু হাসবে।

সন্ধ্যাবেলা, মাগরেবের আজানের পরপর আমাকে জানানো হলো—রেশমা আমাকে তালাক দিয়েছে। আমার কাছে মনে হলো, মেয়েটা ঠিক করেছে। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে আমার বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করেছে। আবার নিজের ইচ্ছায় বিয়ে বাতিল করেছে। সাহসী মেয়ে। কিন্তু আমার মনটা এতই খারাপ হলো, মনে হলো হঠাৎ আমার জগতটা ছোট হয়ে গেছে। আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ মরে গেছে। বিরাট পৃথিবীতে আমি একা হয়ে গেছি।

কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছিলাম। এই কয়েক ঘণ্টা তার সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারিনি। তার চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

নাদিয়া, আপনাকে বিষদভাবে এত কথা কেন বলছি জানেন? একজন কাউকে আমার মনের কথাগুলি বলতে ইচ্ছা করছিল। চিঠি লেখার সময় মনে হচ্ছিল আপনি আমার সামনে বসে আছেন।

প্রণব বাবু বললেন, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এই কথা তিনি কেন বললেন আমি জানি না। যদি দেখা হয় আমি এবার আপনার জন্যে একটা উপহার নিয়ে আসব, চোঙা দুরবিন। এই দুরবিনের কোনো স্ট্যান্ড থাকে না। হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হয়। দুরবিনটা আমি পেয়েছি গুদামঘরে। দুরবিনের গায়ে লেখা—

Victorian Marine Telescope
Maker w. Ottway and co.
London 1915

আপনাকে এই টেলিস্কোপটি দিতে চাচ্ছি, কারণ আপনি আমাকে টেলিস্কোপ বিষয়ে একটি গল্প বলেছিলেন। গল্প বলার এক পর্যায়ে হঠাৎ দেখলাম, আপনার চোখ ছলছল করছে। গল্পটা মনে করিয়ে দেই। শেষজীবনে জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও খুবই আগ্রহ করে নিজেই একটা টেলিস্কোপ বানিয়ে যখন আকাশের দিকে ধরলেন, তখন তিনি কিছুই দেখলেন না। কারণ রাতের পর রাত তারা দেখে এবং দিনে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

লম্বা একটা চিঠি আপনাকে লিখলাম। বানান ভুল করেছি কি না এই নিয়ে চিন্তা করছি।

আপনি ভালো থাকবেন।

ইতি

হাসান রাজা চৌধুরী

রাত নয়টা। হাবীব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। এখান থেকে নবজাত শিশুর কান্নার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সফুরার পুত্রসন্তান হয়েছে। যে পৃথিবীতে এসেছে সে নিজেকে প্রবলভাবেই জানান দিচ্ছে।

হাজেরা বিবি তাঁর ঘর থেকে ডাকলেন, হাবু কইরে! হাবু। ও হাবু।

হাবীব জবাব দিলেন না। হাজেরা বিবি ডেকেই যাচ্ছেন, 'হাবু রে ও হাবু, হাবু।' বাধ্য হয়ে হাবীব বললেন, মা আমি বারান্দায়। জটিল একটা বিষয় নিয়া চিন্তায় আছি। এখন তোমার কথা শুনতে পারব না।

হাজেরা বিবি বললেন, অতি জটিল কথা আমার পেটে ঘুরপাক খাইতেছে। তাড়াতাড়ি কাছে আয়।

বিরক্ত মুখে হাবীব তাঁর মা'র ঘরে ঢুকলেন। হাজেরা বিবি বললেন, খবর পাইছস তোর পুলা হইছে ?

হাবীব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। নিজেকে সামলাতে তার সময় লাগল। তিনি থমথমে গলায় বললেন, মা, যে কথাটা বললা, এই কথা যদি আর কোনোদিন বলো...

বললে কী করবি ? গলা টিপ্যা মারবি ? মারলে ভালো হয়। পুত্রের হাতে মায়ের মৃত্যু হইল সুখের মরণ। এখন যা বারান্দায় খাড়ায়া পুলার কান্দন হোন। তোর পুলার গলা দিয়া 'বুলন্দ' আওয়াজ আসতাছে। মাশাল্লাহ্।

হাবীব বললেন, চুপ!

হাজেরা বিবি বললেন, আমারে চুপ বলবি না। যারার সাহস নাই তারা সবসময় অন্যরে বলে, চুপ। সাহসীরা বলে না। তুই সাহস দেখা, যা পুত্র কোলে নে। বাপ বইল্যা তার গালে ঠাশ কইরা চুমা দে।

মা, খবরদার!

হারামজাদা পুলা তুই খবরদার!

হাবীব মা'র সামনে থেকে সরে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। কিছুক্ষণ একা বাগানে হাঁটবেন। একতলায় নামতেই রশিদের সঙ্গে দেখা হলো। রশিদ বলল, একটা খারাপ খবর আছে স্যার।

হাবীব বললেন, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে সফুরা মেয়েটা কি মারা গেছে ?

জি।

আমার জুনিয়র উকিল আব্দুল খালেকরে খবর দাও। সে মরা বাড়িতে তোলা খাবার পাঠাতে চেয়েছিল। সুযোগ পেয়ে গেল।

হাবীব বাগানের দিকে গেলেন। শিশুর কান্না এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

নাদিয়া এখনো জানে না তার স্যার দু'টা আনারস নিয়ে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে তোলা হয়েছে 'অতিথবাড়ি'তে। তাকে চা দেওয়া হয়েছে। প্রণব তাঁর দেখাশোনা করছেন।

প্রণব বললেন, আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আমি মুসলমান হলে বলতাম মাশাল্লাহ। মুসলমান না হওয়ার কারণে বলতে পারলাম না।

বিদ্যুত বললেন, আমি যে এসেছি নাদিয়া জানে?

প্রণব বললেন, আমি ছাড়া কেউ জানে না। যথাসময়ে জানবে। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। জাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাড়াহুড়ার কারণে। সবকিছুতে তাড়া। আপনার চায়ে চিনি ঠিক আছে?

আছে।

এখন চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেশের অবস্থা কী বলেন?

ভালো।

এককথায় সেরে দিলেন? ভালোটা কোনদিকে? আপনি শিক্ষক মানুষ, বুঝায়ে বলেন।

ফিজিক্স দিয়ে বুঝাব?

প্রণব আগ্রহী গলায় বললেন, বুঝান।

বিদ্যুত বললেন, জগতে দুটা বিষয় আছে, শৃঙ্খলা এবং বিশৃঙ্খলা। এনট্রপি হলো বিশৃঙ্খলার সূচক। দেশের এনট্রপি এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের। কিছু বুঝেছেন?

না।

ইচ্ছা করলে খুব সহজভাবে আমি আপনাকে বোঝাতে পারি। বোঝাতে চাচ্ছি না।

বুঝাতে চাচ্ছেন না কেন?

আপনি ধুরন্ধর মানুষ। ধুরন্ধর মানুষকে আমি কিছু বোঝাই না। এরা এমনিতেই বোঝে।

প্রণব অবাক হয়ে বললেন, আমি ধুরন্ধর আপনি কীভাবে বুঝলেন?

বিদ্যুত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, এক ঘণ্টা সতেরো মিনিট হলো আমি এসেছি। আপনি আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসেছেন। চায়ের ব্যবস্থা করেছেন। বলেছেন নাশতা আসছে। আমার আসার খবরটা কাউকে দেননি। কারণ গতবারে আপনি দেখেছেন আমাকে নাদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। নাদিয়ার বাবা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি। এবার আপনি পরিস্থিতি আঁচ করার জন্যে সময় নিচ্ছেন। অতি ধুরন্ধররা এই কাজটা করে।

প্রণব পান মুখে দিলেন।

বিদ্যুত বললেন, আপনি যে ধুরন্ধর আমি কি প্রমাণ করতে পেরেছি?

প্রণব জবাব দিলেন না। বিদ্যুত বললেন, আমাকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে পদ্ম নামে একটা মেয়ের সমস্যা সমাধানের জন্যে। সে নাকি কারও সঙ্গে কথা বলে না। আপনি পদ্মকে নিয়ে আসুন। তার সঙ্গে কথা বলব। আমার হাতে সময় কম। দশটার ট্রেনে চলে যাব। আমার মা অসুস্থ।

প্রণব উঠে গেলেন। তিনি বিদ্যুতের কথায় খুব বিচলিত হয়েছেন—এরকম মনে হলো না।

নাদিয়ার সঙ্গে প্রণবের দেখা হলো। প্রণব বললেন, মা, কী করো?

নাদিয়া বলল, এই মুহূর্তে কিছু করছি না। তবে লেখা নিয়ে বসব। দাদিজানের জীবন কাহিনী।

কতদূর লেখা হয়েছে?

চল্লিশ পৃষ্ঠা।

আমাকে পড়তে দিবে না?

লেখা শেষ না হলে কাউকে পড়তে দিব না।

হোসনা মেয়েটা কোথায় জানো মা? একটু প্রয়োজন ছিল।

নাদিয়া বলল, সে নিশ্চয়ই ছাদে আছে। আরেকটা কথা, মেয়েটার নাম পদ্ম। আপনি হোসনা ডাকবেন না।

প্রণব বললেন, স্যার নাম রেখেছেন হোসনা। আমি হোসনাই ডাকব। পদ্ম ফদ্ম তুমি ডাকবে।

বাবা কি আপনার ঈশ্বর?

কাছাকাছি।

বাবাকে আপনি এত পছন্দ করেন কেন?

কারণ আছে। কারণ তোমার না জানলেও চলবে।

প্রণব ছাদে উঠে গেলেন। নাদিয়াকে বিদ্যুত স্যারের বিষয়ে কিছুই বললেন না। নাদিয়া তার দাদির ঘরে খাতা-কলম নিয়ে ঢুকল। পোর্ট্রেট পেইন্টাররা মডেল সামনে বসিয়ে ছবি আঁকে। নাদিয়া তার দাদির জীবনী লেখে দাদিকে সামনে রেখে। লেখার ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজব করে।

হাজেরা বিবি জেগে আছেন। তবে তাঁর দৃষ্টি খানিকটা এলোমেলো। নাদিয়া বলল, কিছু লাগবে দাদি?

হাজেরা বিবি না-সূচক মাথা নাড়লেন।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ কেন?

হাজেরা বিবি হতাশ গলায় বললেন, আইজ তোর নাম বিস্মরণ হয়েছি। তোর নাম কী?

নাদিয়া।

ও আচ্ছা। এখন স্মরণ হয়েছে, তোর নাম তোজল্লী।

নাদিয়া লেখা শুরু করল। নাম ভুলে যাওয়ার অংশটা লিখল—

> হাজেরা বিবির স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ। তিনি কোনো কিছুই ভোলেন না। তাঁর নাকের ডগায় যদি কোনো মাছি বসে, তিন বছর পরেও তিনি তা মনে রাখবেন। তবে ভুলে যাওয়ার খেলা তিনি খেলেন। তাঁর অনেক অস্ত্রের একটি অস্ত্র হলো, ভুলে যাওয়া অস্ত্র। মনে করা যাক তিনি ভয়ঙ্কর কোনো কথা বলেছেন। সংসারে বিরাট অশান্তি শুরু হয়েছে। তখন যদি তার পুত্র এসে বলে, মা, এমন একটা কথা কীভাবে বললে? সঙ্গে সঙ্গে হাজেরা বিবি চোখ কপালে তুলে বলবেন, এই কথা কখন বললাম? বিস্মরণ হয়েছি।

বিদ্যুতের সামনে পদ্ম বসে আছে। পদ্ম মাথা নিচু করে আছে। বিদ্যুত বললেন, তোমার নাম খুব সুন্দর, পদ্ম!

পদ্মের ভাবভঙ্গি পাথরের মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে সে নিঃশ্বাসও ফেলছে না।

বিদ্যুত বললেন, নাদিয়া লিখেছে তোমার জীবনে বিরাট একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুমি তারপর থেকে কথা বলা বন্ধ করেছ। ভালো করেছ। হড়বড় করে কথা বলার কিছু নেই। আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না। আমি যদি হ্যাঁ-না জাতীয় কিছু জানতে চাই মাথা নেড়ে জবাব দেবে। আমি নাদিয়ার শিক্ষক, কাজেই তোমারও শিক্ষক। শিক্ষকের কথা মানতে হয়। যে বিরাট দুর্ঘটনা তোমার জীবনে ঘটেছে, তা কি তোমার কারণে ঘটেছে?

পদ্ম না-সূচক মাথা নাড়ল।

অন্যের কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই তুমি অন্যদের ওপরে রাগ করে কথা বন্ধ করেছ। খুব ভালো করেছ। গাছপালার ওপর তোমার কি কোনো রাগ আছে ?

পদ্ম বিস্মিত হয়ে তাকাল। না-সূচক মাথা নাড়ল। বিদ্যুৎ বললেন, গাছপালার ওপর যখন রাগ নেই, তখন গাছপালার সঙ্গে কথা বলতেও বাধা নেই। যে দুর্ঘটনা তোমার জীবনে ঘটেছে, তুমি বাগানের গাছগুলিকে সেই দুর্ঘটনার কথা বলবে। গাছ কিন্তু মানুষের কথা শোনে। গাছের অনুভূতি আছে—এটা স্যার জাগদীশ চন্দ্র বসু বলে গেছেন। গাছ তোমার সব কথা শুনবে। তোমার রাগ দুঃখ কষ্ট তখন কমতে থাকবে। কথা বলবে গাছের সঙ্গে ?

পদ্ম চুপ করে রইল। মাথা নাড়ল না। বিদ্যুত বললেন, আমি এখন তোমাকে একটা ম্যাজিক দেখাব। ম্যাজিকটা তোমার যদি পছন্দ হয়, তোমাকে শিখিয়ে দেব। তারপর তোমাকে একটা গাছের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব। তুমি প্রথমে গাছটাকে ম্যাজিক দেখাবে। তারপর তোমার কষ্টের গল্প তাকে বলবে।

বিদ্যুত পকেট থেকে এক টুকরা সাদা কাগজ বের করলেন। কাগজ উল্টেপাল্টে পদ্মকে দেখালেন। পদ্ম কাগজ হাতে নিয়ে দেখল। বিদ্যুত পদ্মের হাত থেকে কাগজ নিয়ে ফুঁ দিতেই কাগজটা পাঁচ টাকার একটা নোট হয়ে গেল। পদ্ম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে—এটা বোঝা যাচ্ছে। সে টাকাটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে। বিদ্যুত ম্যাজিকের কৌশল শেখালেন এবং লক্ষ করলেন, মেয়েটা বুদ্ধিমতী, কৌশলটা সুন্দর ধরতে পেরেছে।

পদ্ম, ম্যাজিকটা কি পছন্দ হয়েছে ? পছন্দ হলে মাথা নাড়ো।

পদ্ম মাথা নাড়ল।

বিদ্যুত বললেন, নাদিয়াকে ম্যাজিকটা দেখিয়ো। খুব ভালোমতো প্রাকটিস করার পর দেখাবে। হুট করে দেখাবে না। এখন চলো আমার সঙ্গে, একটা গাছের সামনে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেই। নাদিয়াদের বাগানে একটা বকুলগাছ আছে। ওই গাছটা হোক তোমার প্রথম বন্ধু। আমার হাত ধরো। চলো যাই।

বিদ্যুতের হাত ধরে পদ্ম সহজ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

প্রণব দেখলেন বিদ্যুত হোসনা মেয়েটাকে একটা বকুলগাছের সামনে দাঁড় করিয়ে চলে আসছেন। মনে হচ্ছে হোসনা গাছের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিদ্যুত প্রণবের কাছে এসে বললেন, আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি চলে যাব। আমি যে এসেছি এই খবরটা মনে হয় নাদিয়াকে দেননি।

প্রণব জবাব দিলেন না। তার দৃষ্টি হোসনা মেয়েটার দিকে। বিদ্যুত বললেন, পদ্ম মেয়েটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। আমার ধারণা আজ সন্ধ্যা থেকে কথা বলা শুরু করবে।

প্রণব বললেন, আপনি কি এখনই রওনা হবেন ? রওনা হওয়া উচিত। দশটা বাজতে আধঘণ্টা বাকি। ট্রেন অবশ্য সময়মতো আসে না। লেট হয়।

আমি এখনই রওনা হব।

প্রণব বললেন, যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে রেলস্টেশনে দিয়ে আসি। স্যারের গাড়ি আছে। গাড়িতে করে নিয়ে যাব। আপনার কি আপত্তি আছে ?

আমার আপত্তি নাই। তবে গাড়ি লাগবে না।

ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। বিদ্যুত টি স্টল থেকে চা কিনেছেন, হেঁটে হেঁটে চা খাচ্ছেন। তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছেন প্রণব। বিদ্যুত বললেন, আপনি চলে যান। আমার জন্যে সময় নষ্ট করছেন কেন ?

প্রণব বললেন, আমার প্রচুর সময়। নষ্ট করলে কারও কোনো ক্ষতি হয় না।

বিদ্যুত বললেন, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আপনি আমাকে ধুরন্ধর বলেছেন। এটা সত্যভাষণ। সত্যভাষণের জন্যে ক্ষমা চাইতে হয় না।

আপনি দেশের অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন। দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বলি ?

বলুন।

দেশ এখন চলে গেছে ছাত্রদের হাতে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশ চালাচ্ছে। তারা যা নির্দেশ দিচ্ছে সেইভাবে কাজ হচ্ছে। দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা কোনোটাই তাদের নেই। তারা ভুল করা শুরু করবে। তখন বড় সমস্যা তৈরি হবে। এক ভুল থেকে আরেক ভুল। ভুলের চেইন রিঅ্যাকশান।

পূর্বপাকিস্তান কি আলাদা হয়ে যাবে ?

না। পাকিস্তান সরকার দেশ ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করবে। অবশ্যই দেশে মার্শাল ল আসবে। আয়ুব খান কোনো সহজ জিনিস না। সে নিউট্রন শোষক নামাবে। নিউট্রনের সংখ্যা কমাবে।

বিষয়টা বুঝলাম না।

অ্যাটমিক রিঅ্যাকটার থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। রিঅ্যাকটারে নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেলে বিস্ফোরণ হয়। পূর্বপাকিস্তান এখন অ্যাটমিক রিঅ্যাকটার। নিউট্রনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিস্ফোরণ বন্ধ করতে নিউট্রন শোষক লাগবে। আয়ুব খান তা জানেন।

প্রণব বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারি নাই। বুঝার কথাও না। জ্ঞানের কথা মূর্খ মানুষ বুঝবে না—এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, আমি স্টেশনে আপনার সঙ্গে এসেছি জ্ঞানের কথা শোনার জন্যে না। আপনাকে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্যে।

কী বিষয় ?

নাদিয়া মা'কে আপনার সঙ্গে কেন দেখা করতে দেই নাই সেই বিষয়।

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

আপনার দিক থেকে হয়তো প্রয়োজন নাই। আমার দিক থেকে আছে।

বিদ্যুত বললেন, ব্যাখ্যাটা মনে হচ্ছে আমি জানি। তারপরেও আপনার কাছ থেকে শুনি।

প্রণব বললেন, নাদিয়া মা'কে আমি কোলেপিঠে করে বড় করেছি। তার পিতা তাকে যতটা স্নেহ করেন, ভগবান সাক্ষী আমি তারচেয়ে কম করি না। আমি চিরকুমার মানুষ। আমার কেউ নাই। নাদিয়া মা'কে আমি কন্যা জ্ঞান করি।

মূল কথাটা বলুন।

নাদিয়া মা আপনাকে দেখলে পাগলের মতো হয়ে যেত। এটা আমি হতে দিতে পারি না। আপনি জ্ঞানী মানুষ। আপনি কি আমার কথা বুঝেছেন ?

হ্যাঁ।

আমি কি অন্যায় করেছি ?

উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ এবং না। বিজ্ঞানে কিছু কিছু সমস্যার উত্তর এরকম হয়। উত্তর আসে পজেটিভ এবং নেগেটিভ। দু'টা উত্তরই সত্য। আপনি কাঁদছেন নাকি ?

কাঁদছি না। চোখে ধুলাবালি কিছু পড়েছে।

বিদ্যুত বললেন, অনাত্মীয়া একটি মেয়ের প্রতি আপনার মমতা দেখে ভালো লাগল। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি, নাদিয়াদের বাগানে মহিষের মতো বলশালী একজনকে দেখলাম। মানুষটা কে ?

ওর নাম ভাদু। পাহারাদারের চাকরি করে।

লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। আমি পদ্মকে নিয়ে অনেকক্ষণ বাগানে ছিলাম। লোকটা একবারও আমার দিকে বা পদ্মের দিকে তাকায়নি। যেসব মানুষ কারও চোখের দিকে তাকায় না তারা অসুস্থ।

প্রণব বললেন, আপনি জ্ঞানী মানুষ কিন্তু একটা ভুল করেছেন। ভাদু মহা বোকা একজন মানুষ। ভালো মানুষ। ভালো মানুষেরা বোকা হয়।

বিদ্যুত বললেন, আমার ভুল হতেও পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক।

ট্রেন এসে গেছে। বিদ্যুত একটা খবরের কাগজ কিনে ট্রেনে উঠলেন। খবরের কাগজে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক ঘোষণা গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। তারা দেশ থেকে চোর-ডাকাত নির্মূল করতে বলছে। তারা চোর-ডাকাতের এই আইডিয়া হয়তোবা মাওলানা ভাসানীর কাছ থেকে পেয়েছে।

সময় দুপুর।

নাদিয়ার মাছ মারার শখ হয়েছে। সে বড়শি ফেলে পুকুরঘাটে বসে আছে। প্রণব বড়শির ব্যবস্থা করেছেন। চারের ব্যবস্থা করেছেন। পচা গুড় এবং পচা গোবরের চার। টোপ ফেলা হয়েছে পিঁপড়ার ডিমের। তিনি ট্রেনার হিসাবে নাদিয়ার পাশে বসে আছেন। পদ্ম এসে নাদিয়ার সামনে দাঁড়াল। নাদিয়াকে অবাক করে দিয়ে বলল, আপা ম্যাজিক দেখবেন? এটা কী? একটা কাগজ না? আমি দিলাম ফুঁ। এখন কী? পাঁচ টাকার নোট।

হতভম্ব নাদিয়া বলল, তুমি তো ফড়ফড় করে কথা বলছ। বিদ্যুত স্যারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে? স্যার কি এসেছেন?

পদ্ম হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

নাদিয়া বলল, প্রণব কাকা! বিদ্যুত স্যার কোথায়?

প্রণব জবাব দিলেন না। বড়শিতে মাছ বেঁধেছে। বড়সড় মাছ। তিনি মাছ নিয়ে ব্যস্ত।

নাদিয়া অস্থির ভঙ্গিতে বলল, কথা বলছেন না কেন? স্যার এসেছিলেন?

হুঁ। ঘণ্টা দুই ছিলেন।

আমি জানলাম না কেন?

প্রণব বললেন, উনার কারণেই জানতে পারো নাই। উনি বললেন, নাদিয়া আমাকে একটা বিশেষ কাজে আসতে বলেছে। কাজটা করে আমি চলে যাব। আমি যে এসেছি নাদিয়া যেন না জানে।

এমন কথা কেন বললেন?

প্রণব হতাশ গলায় বললেন, সেটা মা আমি কীভাবে বলব? আমি অন্তর্যামী না। উনার মনের ভিতরে ঢোকার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেন নাই।

নাদিয়ার চোখে পানি টলমল করছে। সে চোখের পানি আড়াল করার জন্যে দ্রুত বাগানের দিকে চলে গেল।

বিদ্যুত ট্রেন থেকে নামলেন সন্ধ্যার পর। স্টেশনের বাইরে পা দিতেই একজন বলল, বিদ্যুত ভাই না? তাড়াতাড়ি বাড়িতে যান। দৌড়ান। আপনার মহাবিপদ।

কী বিপদ?

কী বিপদে পরে শুনবেন, এখন দৌড় দেন।

বিদ্যুত দূর থেকে দেখলেন উঠানে অসংখ্য মানুষ। প্রত্যেকের হাতে বাঁশের লাঠি। কারও কারও হাতে মশাল। হল্লার শব্দ দূর থেকে কানে আসছে। তার বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। বিদ্যুত হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির উঠানে উঠলেন আর তার চোখের সামনে জ্বলন্ত আগুনে বিদ্যুতের বাবা হরিকান্তিকে ফেলে দেওয়া হলো। ঘটনা ঘটল চোখের নিমিষে। হরিকান্তি 'ও বউ গো, বউ' বলে পশুর মতো আর্তচিৎকার করলেন। বিদ্যুত বাবাকে উদ্ধারের জন্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারলেন না।

চোর নির্মূল অভিযানের মাধ্যমে বিদ্যুত কান্তি দে উপাখ্যানের সমাপ্তি হলো। কোনো মহৎ আন্দোলনই ভুল-ভ্রান্তি ছাড়া হয় না। স্বর্ণের খাদের মতো ভুলগুলিও স্বর্ণেরই অংশ।

আশার কথা, মাওলানা ভাসানী চোর-ডাকাত নির্মূলের সংগ্রাম থেকে সরে এসেছেন। শেখ মুজিব প্যারোলে আয়ুব খানের গোলটেবিলে যাবেন—তার প্রবল বিরোধিতা শুরু করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, প্রয়োজনে ফরাসি বিপ্লবের কায়দায় জেলখানা ভেঙে মুজিবকে নিয়ে আসা হবে।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। তিনি ছাত্রদের ১১ দফাকেই সমর্থন করেন এবং বলেন, ১১ দফার মধ্যেই আছে আওয়ামী লীগের ছয় দফা।

পরের দিন রেসকোর্সের ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়।

উনসত্তরের গণআন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন একজন নেতা খুঁজে বের করা। নেতাশূন্য দেশে একজন নেতার উত্থান হলো—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশরক্ষা আইনে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা সবাই ছাড়া পেয়েছেন। ময়মনসিংহ্ থেকে কয়েকজনের মধ্যে নারায়ণ চক্রবর্তী ছাড়া পেয়েছেন। এই অল্প কয়েক মাসের হাজতবাসে তিনি কুঁকড়ে গেছেন। গাল মুখের ভেতর ঢুকে গেছে। নাক ঝুলে পড়েছে। তিনি হাঁটছেনও কুঁজো হয়ে। রাত ন'টার দিকে তিনি চাদরে নিজেকে ঢেকে হাবীবের বাড়িতে ঢুকলেন। হাবীব চেম্বারে ছিলেন। প্রণব নারায়ণ বাবুকে সরাসরি চেম্বারে নিয়ে গেলেন।

হাবীব বললেন, আপনি দুপুরে ছাড়া পেয়েছেন খবর পেয়েছি। শরীরের অবস্থা কাহিল দেখছি। মারধোর করত ?

নারায়ণ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চাপা গলায় বললেন, আমার মেয়েটা কেমন আছে ?

হাবীব বললেন, ভালো আছে। আপনি বসুন।

নারায়ণ বসেই কাশতে শুরু করলেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠে গেল। হাজত থেকে তিনি এই ব্যাধি শরীরে নিয়েছেন। ঠান্ডা মেঝেতে রাতের পর রাত একটা কম্বলে শোয়াই তাঁর কাল হয়েছে।

চা খাবেন ? চা দিতে বলি।

চা খাব না।

মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবেন ? ডেকে দিব ?

আগে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব।

করুন পরামর্শ।

নারায়ণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই দেশে থাকব না। ইন্ডিয়ায় চলে যাব।

হাবীব বললেন, আপনাদের সুবিধা আছে। ঝামেলা মনে করলে পাশের দেশে চলে যেতে পারেন। আপনারা ইন্ডিয়াকেও আপনাদের দেশই মনে করেন। আমার সেই সুবিধা নাই। পাকিস্তানই আমার দেশ।

নারায়ণ কাশতে কাশতে বললেন, আমার এক বিঘা জমির উপর যে বাড়িটা আছে সেটা বিক্রি করতে চাই। আমার নগদ টাকা প্রয়োজন। আপনি কি খরিদ করবেন ?

আজই ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছেন ?

যেদিন বিক্রি করব তার পরদিনই চলে যাব। শিলচর দিয়ে যাব, ব্যবস্থা করা আছে।

আপনার বাড়ি আমি কিনতে রাজি আছি। আপনারা তো একই জায়গা তিন-চারজনের কাছে বিক্রি করেন। আপনার জমি আর কার কার কাছে বিক্রি করেছেন ?

আমি দুপুর তিনটায় ছাড়া পেয়েছি। সরাসরি আপনার কাছেই এসেছি।

দাম কত চান ?

আপনি নগদ যা দিতে চান তা-ই আমি নিব। স্ট্যাম্পে সই করে বাড়ি আপনার নামে লিখে দিব।

মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না ?

নিয়ে যাব। ওই দেশে আমার মেয়ের বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

হাবীব বললেন, চার হাজার টাকা নগদ দিতে পারব। এতে চলবে ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নারায়ণ বললেন, চলবে। পানির দাম বলেছেন, কিন্তু চলবে।

হাবীব বললেন, চেম্বারে স্ট্যাম্প পেপার আছে। প্রণব লিখে ফেলবে। আমি টাকাটা নিয়ে আসি। মেয়েটাকে কি আজই নিয়ে যাবেন ?

আজ না, যেদিন শিলচর যাব সেদিন নিয়ে যাব।

তার সঙ্গে কথা তো বলবেন। নাকি কথাও বলবেন না ?

কথা বলব।

হাবীব, প্রণবকে পাঠালেন পদ্মকে নিয়ে আসার জন্যে।

পদ্ম বলল, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করব না। তার সঙ্গে যাবও না।

নাদিয়া বলল, কেন যাবে না ?

পদ্ম বলল, বাবা-মা দু'জনেই আমাকে ত্যাগ করেছে। আমি তাদের ত্যাগ করেছি।

নাদিয়া বলল, তারা ভুল করেছে বলে তুমি ভুল করবে ?

পদ্ম কঠিন গলায় বলল, আপনি যা-ই বলেন আমি যাব না। আপনার স্যার যদি এসে আমাকে বলেন তারপরেও যাব না।

নারায়ণকে টাকা দেওয়া হয়েছে। হাবীব বললেন, টাকা গুনে নিন।

নারায়ণ বললেন, প্রয়োজন নাই।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। টাকা গুনুন।

নারায়ণ টাকা গুনছেন, তাঁর হাত সামান্য কাঁপছে। প্রণব স্ট্যাপ পেপারে লিখছে। হাবীব বললেন, প্রণব! বাড়িটা লিখবে নারায়ণ বাবুর মেয়ের নামে। সীতা নামে না, নাদিয়া যে নাম দিয়েছে সেই নামে—পদ্ম। মেয়েটার তো কিছুই নাই—বাড়িটা থাকুক। নারায়ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বিস্ময়ে তিনি বাক্যহারা। প্রণব স্বাভাবিক। শেষ মুহূর্তে এরকম একটা কাণ্ড যে ঘটবে তা তিনি জানতেন। হাবীব নামের মানুষটির মধ্যে খারাপ অংশ যতটা প্রবল, ভালো অংশও ঠিক ততটাই প্রবল। প্রণবের প্রধান সমস্যা, কোনো মানুষের খারাপ অংশ তার চোখে পড়ে না। ভালোটাই পড়ে।

অনেক রাত হয়েছে, হাবীব ঘুমাতে এসেছেন। স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা। স্ত্রী শোবার পর তিনি শোবেন। লাইলী পানের বাটা নিয়ে ঢুকলেন। হঠাৎ নিচু হয়ে স্বামীকে কদমবুসি করলেন।

হাবীব বললেন, ঘটনা কী?

লাইলী বললেন, প্রণব বাবুর কাছে শুনেছি পদ্ম মেয়েটার নামে আপনি বাড়ি কিনেছেন। আমি মন থেকে আপনার জন্যে আল্লাপাকের দরবারে দোয়া করেছি।

ভালো।

আপনার মেয়ে কী যে খুশি হয়েছে। সে কাঁদতেছিল। মাশাল্লাহ, আল্লাপাক আপনাকে একটা ভালো মেয়ে দিয়েছেন।

হাবীব বললেন, আমি মনস্থির করেছি হাসান রাজা চৌধুরীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিব। তারিখ ঠিক করেছি ২৫ ফেব্রুয়ারি। গভর্নর সাহেব ওই তারিখ দিয়েছেন। তিনি নানান ঝামেলায় আছেন। তার জন্যে সময় বার করা কঠিন। বলো, আলহামদুলিল্লাহ।

লাইলী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তোমার মেয়ে কি জেগে আছে?

মনে হয় জেগে আছে। সে অনেক রাতে ঘুমায়।

রাত জেগে কী করে?

তার দাদির বিষয়ে কী যেন লেখে।

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। লাইলী বললেন, কোথায় যান ?

তোমার মেয়ের কাছে। বিয়ের তারিখ হয়েছে এটা তাকে বলি।

সকালে বলুন।

হাবীব বললেন, রাতে বলতে অসুবিধা কী ?

নাদিয়া পদ্মকে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। এন্টিগ্র্যাভিটি ম্যাজিক। পদ্ম মুগ্ধ হয়ে দেখছে। নাদিয়া বলল, এর কৌশলটা আমি তোমাকে শেখাব না। নিজে নিজে বের করতে পারো কি না দেখো। এই নাও বোতল, এই নাও দড়ি।

হাবীবকে ঘরে ঢুকতে দেখে পদ্ম বের হয়ে গেল। নাদিয়া অবাক হয়ে বলল, বাবা, এত রাতে তুমি ?

একটা সুসংবাদ দিতে এসেছি রে মা।

কী সুসংবাদ ?

তোর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি। গভর্নর সাহেব ওই দিন সময় দিয়েছেন। উনাকে ছাড়া বিয়ে হয় কীভাবে ? তুই ঝিম ধরে আছিস কেন ? কিছু বলবি ?

একজন খুনির সঙ্গে আমার বিয়ে ?

হাসান রাজা চৌধুরী কোনো খুন করে নাই। যে খুন করেছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

নাদিয়া মাথা নিচু করে হাসল।

হাসছিস কেন ?

এমনি হাসলাম। তুমি ২৫ ফেব্রুয়ারি বিয়ে ঠিক করেছ। আমি ওইদিন বিয়ে করব। আমি কখনো তোমাকে ছোট করব না। আমার যখন এগারো বছর বয়স, তখন প্রণব কাকা তোমার বিষয়ে একটা গল্প বলেছিলেন। তখন ঠিক করেছি, আমি কখনো তোমার অবাধ্য হব না।

গল্পটা কী ?

আমার টাইফয়েড হয়েছিল। এক রাতে এমন অবস্থা হলো, সবাই ভাবল আমি মারা যাচ্ছি। তুমি আমাকে কোলে করে বাগানে চলে গেলে। চিৎকার করে বললে, আল্লাপাক তুমি আমার জীবনের বিনিময়ে আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করো।

হাবীব বললেন, সব বাবাই এরকম করবে।

তা হয়তো করবে। পরের অংশটা করবে না। চার দিন চার রাত তুমি আমাকে কোলে নিয়ে বসে রইলে। পঞ্চম দিনে আমার জ্বর কমল। তুমি আমাকে মায়ের পাশে রেখে ঘুমাতে গেলে।

হাবীব বললেন, ঘুমের কথা বলায় ঘুম পাচ্ছে। মা উঠি।

বাবা একটু বসো।

হাবীব বসলেন। নাদিয়া বলল, আমার মনে মস্ত বড় একটা কনফিউশন আছে। কনফিউশন দূর করো।

কী কনফিউশন?

নাদিয়া ইতস্তত করে বলল, সফুরা নামের মায়ের কাজের মেয়ের একটা ছেলে আছে। ছেলেটা কি আমার ভাই?

না। আমার অনেক ক্রটি আছে। এ ধরনের ক্রটি নাই।

দাদি এ রকম কথা কেন বলে?

জানি না কেন বলে।

নাদিয়া ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হাসান রাজা চৌধুরী বিষয়ে তুমি যে কথা বলেছ সেটা মিথ্যা বলেছ। সফুরার ছেলের বিষয়ের কথাটা সত্যি বলেছ। বিদ্যুত স্যার আমাদের শিখিয়েছেন মিথ্যা বলার সময় মানুষের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়। এই বিদ্যার একটা নাম আছে—Physiognomy analysis. বাবা! ঘুমাতে যাও।

হাবীব উঠে দাঁড়ালেন। নাদিয়া বলল, যার সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে ঠিক করেছ আমি তাকেই বিয়ে করব। তুমি জেনেশুনে একজন খুনির সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছ, নিশ্চয়ই তোমার কোনো কারণ আছে।

আমি এবং আনিস সাবেত। মহসিন হলের ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। ছাদে রেলিং নেই। দমকা বাতাস দিলে নিচে পড়ে যাব। এই নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। নিজেদের খুব এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো যে লাগছে তার প্রমাণ আমাদের কথাবার্তা। কথাবার্তার নমুনা—

আনিস : হুমায়ূন, লাফ দিতে পারবে ?

আমি : পারব।

আনিস : তুমি পারবে না, আমি পারব।

আমি : লাফ দিয়ে দেখান যে আপনি পারবেন।

আনিস : দু'জন একসঙ্গে লাফ দিলে কেমন হয় ?

আমি : ভালো হয়।

আনিস : তোমাকে লাফ দিতে হবে না। তুমি ওয়ান টু থ্রি বলো।

আনিস সাবেত উঠে দাঁড়ালেন। তাকে দাঁড়াতে দেখেও আমার কোনো ভাবান্তর হলো না। আমি ওয়ান টু থ্রি না বলা পর্যন্ত তিনি লাফ দেবেন না, এটা নিশ্চিত। তিনি আবার বসলেন। আমি বললাম, চলুন ঘরে যাই। আনিস সাবেত বললেন, তুমি যাও। আমি সারা রাত ছাদে বসে থাকব।

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। আনিস ভাই ছাদে বসে রইলেন।

আনিস সাবেত ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন মানুষ। মিটিং মিছিল কোনো কিছুই বাদ নেই। লন্ডনপ্রবাসী পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রনেতা তারিক আলি যখন ঢাকায় আসেন, তখন আনিস সাবেত ফুলের মালা নিয়ে এয়ারপোর্টে যান তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে।

রাজনীতির মাতাল হাওয়া দেখে আনিস সাবেত ভেঙে পড়েছিলেন। কোনো কিছুই তখন কাজ করছে না।

গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল শূন্য।

সম্মিলিত বিরোধী দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আওয়ামী লীগ। কী কারণ তা স্পষ্ট না।

ছাত্র সংগঠনগুলির ভেতর নানা ঝামেলা, অবিশ্বাস, নেতৃত্বের লড়াই।

মাওলানা ভাসানী হঠাৎ লাহোরে যাবার জন্যে বিমানে উঠলেন। কেন এই সময় তাঁর লাহোর যাত্রা কেউ জানে না। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন।

শোনা যাচ্ছে শিগগিরই আরেক যুদ্ধ হবে ভারতের বিরুদ্ধে। ভারত শায়েস্তা হলেই পূর্বপাকিস্তান ঠান্ডা হবে। এবার যুদ্ধ করতে সমস্যা নেই। পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র মহান চীন। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের প্রকাশ্য এবং গোপন দু'ধরনের সামরিক চুক্তি নাকি আছে। এই আঁতাতের প্রধান কারিগর নাকি মাওলানা ভাসানী।

দেশ চরম অনিশ্চয়তায়। অনিশ্চয়তার ছাপ ভয়ঙ্করভাবে পড়েছে আনিস সাবেতের ওপর। তার কাজকর্ম অপ্রকৃতস্থ মানুষের মতো।

রাত তিনটার দিকে আমি আবার ছাদে গেলাম। আনিস সাবেত বললেন, অদ্ভুত কাণ্ড। আমি জেগে থেকেই একটা স্বপ্ন দেখে ফেলেছি।

আমি বললাম, কী স্বপ্ন দেখেছেন ?

পাশে এসে বসো। বলব। স্বপ্ন বলা শেষ করে হয় আমি ছাদ থেকে লাফ দেব নয়তো তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলব।

আনিস ভাই, ঘরে চলুন। আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াব। হিটারের তার কেটে গেছে, আপনাকে শুধু তার ঠিক করে দিতে হবে।

আনিস ভাই চিন্তিত গলায় বললেন, হিটারের তার কেটে গেছে আমাকে বলবে না ? আশ্চর্য!

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটা ধরলেন। যেন হিটারের তার কেটে যাওয়া ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা। এখনই ঠিক করতে হবে।

তার ঠিক হলো। আমরা চা খেলাম। আনিস ভাই তাঁর স্বপ্ন বললেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। সবাই মহাসুখে আছে। শুধু তিনি নেই।

তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। সবাই মহাসুখে না থাকলেও দেশ স্বাধীন হয়েছে।

স্বাধীন দেশে বাস করার আনন্দ আনিস ভাই পাননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তিনি Ph.D করার জন্যে কানাডা গিয়েছিলেন। সেখানেই ক্যান্সারে মারা যান।

থাক এই প্রসঙ্গ। নাদিয়ার অদ্ভুত চিঠির কথাটা বলি। রেজিস্ট্রি করা একটা চিঠি নাদিয়ার কাছ থেকে পেয়েছি। চিঠি না বলে সংবাদ বলা উচিত। সংবাদের শিরোনাম—

বিবাহ বিলাস

ফেব্রুয়ারি মাসের পঁচিশ তারিখ আমার বিয়ে।

পাত্র : হাসান রাজা চৌধুরী।

পাত্রের রূপ বিচার : কন্দর্প কান্তি (কন্দর্প কান্তির মানে জানো ? না জানলে ডিকশনারি দেখো।)

পাত্রের গুণ বিচার : একটি খুন করেছেন। একটি যখন করেছেন, আরও করার সম্ভাবনা আছে।

পাত্রের অর্থ বিচার : তার বিষয়আশয় কুবেরের মতো। (কুবের কে জানো না ? অর্থের দেবতা।)

পাত্র-বিষয়ে ঠাট্টা করছি না। যা লিখেছি সবই সত্যি। জেনেশুনে এমন কাজ কেন করছি জানো ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যে করছি—তিনি জেনেশুনে বিষ পান করতে বলেছেন। তাঁর মতো মহাপুরুষের কথা অগ্রাহ্য করি কীভাবে ?

যাই হোক, তুমি বিয়েতে আসবে। সব বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবে। আমাদের অতিথবাড়ির পুরোটা তোমার এবং তোমার বন্ধুদের জন্যে ছেড়ে দেব।

বজরা নিয়ে তোমরা ব্রহ্মপুত্রে নৌবিহার করবে। পাখি শিকার করতে চাইলে তোমাদের নিয়ে যাব ভাটিপাড়ায় আমার শ্বশুরবাড়িতে। ওই বাড়িটার নাম—কইতরবাড়ি। কইতর কী জানো তো ? কইতর হচ্ছে কবুতর।

রাগ করো না, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি হাত দেখতে জানো না। আমার প্রসঙ্গে যা যা বলেছ তার কোনোটাই সত্য হয়নি। কাজেই হাত দেখা হাত দেখা খেলা আর খেলবে না। এখন থেকে মন দেখা খেলা খেলবে। মনে করো কেউ তোমাকে বলল, আপনি হাত দেখতে পারেন ? তুমি বলবে, হাত দেখতে পারি না তবে মন দেখতে পারি।

ভালো কথা, আমি দাদিজান হাজেরা বিবিকে নিয়ে ৭৮ পৃষ্ঠা লিখেছি। দাদি অতি নোংরা যেসব কথা বলেন তাও লিখেছি। পড়ে দেখতে চাও ? না, পড়তে দেব না। নোংরা অংশগুলি না থাকলে পড়তে দিতাম।

ইতি

নাদিয়া, দিয়া, তোজল্লী।

হঠাৎ করে কুয়াশা পড়েছে। এমন কুয়াশা যে এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। নাদিয়া কুয়াশা গায়ে মাখার জন্যে দোতলা থেকে নামল। কুয়াশা হচ্ছে মেঘের এক রূপ। কুয়াশা গায়ে মাখা এবং মেঘ গায়ে মাখা একইরকম।

সিঁড়ির গোড়ায় প্রণব দাঁড়িয়ে ছিলেন। নাদিয়াকে দেখে বললেন, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

নাদিয়া বলল, কে ?

তাকে অতিথঘরে বসিয়েছি। নিজে গিয়ে দেখো কে ?

পরিচিত কেউ ?

প্রণব হাসতে হাসতে বললেন, পরিচিত কেউ না। আমরা তাকে চিনি না।

হাসান রাজা চৌধুরী ?

হুঁ।

আশ্চর্য! কুয়াশার অতিথি!

হাসান রাজা নাদিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। নাদিয়া বলল, কেমন আছেন ?

ভালো আছি। আপনার জন্যে একটা টেলিস্কোপ এনেছি। তারা দেখতে পারবেন।

ও আচ্ছা।

হাসান কাঠের বাক্স এগিয়ে দিল। নাদিয়া টেলিস্কোপ বের করেছে। আগ্রহ নিয়ে দেখছে। নাদিয়া বলল, এমন দিনে টেলিস্কোপ এনেছেন যে আকাশ থাকবে কুয়াশায় ঢাকা।

কুয়াশা কেটে যাবে।

কীভাবে জানেন কুয়াশা কেটে যাবে ?

ঘন কুয়াশা বেশিক্ষণ থাকে না। হালকা বাতাসেই সরে যায়। পাতলা কুয়াশা সরে না।

জানতাম না। নতুন জিনিস শিখলাম।

হাসান বলল, আমি এখন উঠব।

টেলিস্কোপ দেওয়ার জন্যে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

নাদিয়া অবাক হয়ে বলল, টেলিস্কোপ দেওয়ার জন্যে তো আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। ২৫ তারিখের পর আমি যাচ্ছি আপনার কইতরবাড়িতে। আচ্ছা কবুতরগুলি কি এখনো আছে ?

আছে।

আমি যে ঘরে থাকব সেখান থেকে হাওর দেখা যাবে ?

হাসান রাজা ক্ষীণস্বরে বলল, যাবে।

আপনাদের কি কোনো বজরা আছে ?

না। বড় নৌকা আছে।

আমি বিশাল একটা বজরা বানাব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেরকম বজরায় করে পদ্মায় ঘুরতেন সেরকম বজরা। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের বজরার ছবি আছে। ছবি দেখে কারিগররা বজরা বানাতে পারবে না ?

পারবে।

বজরায় লাইব্রেরি থাকবে। গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে। রাতে ঘুমাবার আয়োজনও থাকবে।

হাসান চুপ করে আছে। কিছু বলছে না। নাদিয়া বলল, চলুন পুকুরঘাটে যাই। কুয়াশার ভেতর চা খাই। যাবেন ?

হুঁ।

আপনি ঘাটে গিয়ে বসুন। আমি চায়ের কথা বলে আসি। রবীন্দ্রনাথের বজরার ছবিটাও নিয়ে আসি। আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি এখনই বানাতে দিবেন।

আচ্ছা।

দিঘির ঘাটে আমরা দু'জন একসঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেব। এবং তখন থেকে আমি আপনাকে তুমি করে বলব। আপনিও আমাকে তুমি করে বলবেন। আমার মা বাবাকে আপনি করে বলেন, আমার বিশ্রী লাগে।

নাদিয়া উঠে দাঁড়াল। হাসান রাজা বলল, শেষবারের মতো আপনাকে আপনি করে একটা কথা বলি।

নাদিয়া বলল, বলুন।

আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনার কথা মনে করব।

নাদিয়া বলল, চায়ের জন্যে অপেক্ষা করব না। আমি এখন থেকেই তুমি বলব। এই তুমি এমন নাটকীয় ডায়ালগ কেন দিচ্ছ? মনে হচ্ছে স্টেজে অভিনয় করছ। যাও ঘাটে গিয়ে বসো। আমি আসছি।

নাদিয়া চা নিয়ে ঘাটে এসে কাউকে দেখতে গেল না। অতিথঘরে কেউ নেই, বাগানে কেউ নেই।

ডিসট্রিক্ট জজ আবুল কাশেম সপ্তাহে চার দিন হাঁটেন। বাড়ির বাইরে যান না। কম্পাউন্ডের ভেতরই হাঁটেন। অনেক বড় কম্পাউন্ড। পুরো কম্পাউন্ড চক্কর দিতে পনেরো মিনিট লাগে।

আজ তাঁর হাঁটার দিন। বাড়ি থেকে বের হয়েই দেখলেন, অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ান আটকে দিয়েছে, ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি যুবককে অগ্রাহ্য করলেন। পুরো কম্পাউন্ড চক্কর দিলেন। যুবক চলে গেল না। তিন দফা চক্করের পরে তাঁর হাঁটার সমাপ্তি হলো। তিন চক্করের পরেও যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন।

যুবক বলল, স্যার আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসি নাই। তিন মিনিট কথা বলতে এসেছি।

কী বিষয়ে কথা বলবে?

একটা মামলা বিষয়ে।

মামলা বিষয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না।

স্যার, আপনি একজন ভুল মানুষকে ফাঁসি দিয়েছেন। তার নাম ফরিদ। সে খুন করে নাই। আমি খুন করেছি। আমার নাম হাসান রাজা চৌধুরী। আমার বাবার নাম রহমত রাজা চৌধুরী। আমাকে বাঁচানোর জন্যে একজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে।

আবুল কাশেম বললেন, এসো ভেতরে। আমি প্রশ্ন করব উত্তর দিবে। নিজ থেকে কিছু বলবে না।

জি আচ্ছা।

হাসান রাজা চৌধুরী আবুল কাশেমের মুখোমুখি বসেছে। তার সামনে চায়ের কাপ। হাসান চায়ে চুমুক দিচ্ছে না।

খুন তুমি করেছ?

জি।

ঠান্ডা মাথায়? || মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

জি।

কারণ কী?

যাকে খুন করেছি ছোটবেলায় আমি তাঁর বাড়িতে থেকে মোহনগঞ্জ স্কুলে পড়তাম। উনি আমার মামা। আপন মামা না। দূরসম্পর্কের মামা। উনি আমাকে ব্যবহার করতেন।

শারীরিক ব্যবহার?

জি।

আমি কাউকে বলতে পারতাম না। নিজের মনে কাঁদতাম। এতবড় লজ্জার কথা কীভাবে বলি! আমার যখন বয়স দশ, তখন ঠিক করি একদিন উনাকে খুন করব।

তোমাকে ব্যবহারের ঘটনা তুমি আর কাউকে বলেছ?

একজনকে শুধু বলেছি। যাকে খুন করেছি তার মেয়েকে। মেয়ের নাম রেশমা।

চা খাও।

চা খাব না স্যার।

আবুল কাশেম বললেন, তুমি আর কিছু বলবে?

আমি চাই নির্দোষ মানুষটা ছাড়া পাক। আমার শাস্তি হোক।

ফাঁসিতে ঝুলবে?

জি ঝুলব।

আবুল কাশেম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। হাসান রাজা বলল, স্যার আমি এখন কী করব? থানায় যাব?

হ্যাঁ। তুমি যাও। বাকি ব্যবস্থা আমি করব। আচ্ছা তোমার হাতটা বাড়াও তো। তোমার সঙ্গে হাত মিলাই। এই প্রথম আমি জেনে শুনে একজন খুনির সঙ্গে হাত মিলাচ্ছি। তবে তোমার বিচার আমি করব না। অন্য কোনো বিচারক করবেন। আমি রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছি।

হাসান রাজা চৌধুরী হাজতে আছে। তার মামলা নতুন করে শুরু হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি মোনায়েম খান বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার তারিখ দিয়েছিলেন। ওই তারিখে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে দেশ ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন।

কালরাত্রি

২৫ মার্চ কালরাত্রি—এই তথ্য আমরা জানি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ হত্যা-উৎসবে মেতেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।

উনসত্তরের ২৫ মার্চও কিন্তু কালরাত্রি। ওই রাতে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে দেশের ক্ষমতা তুলে দেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে।

পরিশিষ্ট

কিছুক্ষণ আগে হাজেরা বিবি মারা গেছেন।

মৃত্যুর সময় নাদিয়া একাই উপস্থিত ছিল। দাদির পাশে বসে লিখছিল। হাজেরা বিবি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, কী লেখস?

নাদিয়া বলল, তোমার কথা লিখি।

লেখা 'বন' কর। আমার দিকে মুখ ফিরা।

নাদিয়া খাতা রেখে দাদির দিকে ঘুরে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে।

কী রকম?

চেহারা উজ্জ্বল লাগছে। চোখ ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে তোমার বয়স কমে গেছে।

হাজেরা বললেন, শইল্যের ভিতর মরণের বাতি জ্বলছে। মরণের বাতি জ্বললে চেহারায় জেল্লা লাগে।

মরণের আবার বাতি আছে নাকি?

আছে। আল্লাপাক এই বাতি জ্বালায়া দেন। আজরাইল আইসা নিভায়।

নাদিয়া বলল, তুমি খুব ভালো আছ, সুস্থ আছ। তোমার মরতে এখনো অনেক দেরি।

হাজেরা বিবি শব্দ করে আনন্দময় হাসি হাসলেন।

নাদিয়া বলল, বাহ্! তুমি তো কিশোরী মেয়েদের মতো হাসছ। হাজেরা নাদিয়ার হাত ধরে কোমল গলায় বললেন, আমি তোর বাপের কাছে অপরাধী। তুই আমার হইয়া তার কাছে ক্ষমা চাইবি। মা ছেলের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে না। জায়েজ নাই।

কী অপরাধ করেছ?

ছোটবেলা থাইকা নানানভাবে তারে কষ্ট দিয়েছি। খাটের সাথে সারা দিন বাইন্ধ্যা রাখছি। খাওয়া দেই নাই। পুসকুনিতে একবার তারে নিয়া গোসলে নামছি, হঠাৎ তার মাথা পানিতে চাইপ্যা ধইরা বলছি—মর তুই মর।

কেন দাদি ?

তোর দাদাজান তার ছেলেরে খুব পছন্দ করত। ছেলে ছিল তার চোখের মণি। ছেলেরে কষ্ট দিলে সে কষ্ট পাইত। এইজন্যে কষ্ট দিতাম। তোর দাদাজান ছিল অতি বদ মানুষ। কত দাসী যে তার কারণে পেট বাধাইছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

দাদাজানকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে তুমি তার ছেলেকে কষ্ট দিয়েছ। কাজটা ভুল করেছ।

অবশ্যই। হাবীব বড় হইছে তারপরেও তারে কষ্ট দিয়েছি। আমি জানি 'হাবু' ডাকলে রাগ করে। ইচ্ছা কইরা ডাকি—হাবু হাবু হাবুরে।

কেন দাদি ? এখন তো আর দাদাজান বেঁচে নেই। এখন কেন কষ্ট দেওয়া ?

আমি চেয়েছি সে রাগ করুক। আমারে দুইটা মন্দ কথা বলুক। ছোটবেলায় তার দিকে যে অন্যায় করেছি তার কিছুটা কাটা যাক। কিন্তু আমি এমন ছেলে পেটে ধরেছি যে আমার উপর রাগ করে না। তারে রাগানির চেষ্টায় আমার ক্রটি ছিল না। একসময় তার চরিত্র নিয়া কথা শুরু করলাম। অতি নোংরা কথা। সফুরার পেটে তার সন্তান—এইসব হাবিজাবি। তাও আমার পুলা রাগে না।

নাদিয়া বলল, তোমার কাছে শুনে শুনে মা নিজেও কাজের মেয়েদের নানান কথা বলেন। বাবার সামনে যেন কেউ না যায়—এইসব। বাবার ক্রটি আছে। নোংরা ক্রটি নাই।

হাজেরা বিবি বললেন, অবশ্যই নাই। এইটা আমার পুলা। ছগিরন মাগি, বছিরুন মাগির পুলা না।

নোংরা কথা বন্ধ করো দাদি।

হাজেরা বিবি বললেন, মইরাই তো যাইতেছি। পচা কথা আর বলতে পারব না। দুই একটা বলি। তোর পছন্দ না হইলে কানে হাত দিবি।

আচ্ছা বলো যা বলতে চাও। তবে তুমি কঠিন চিজ। সহজে মারা যাওয়ার জিনিস না।

তারপরেও ধুম কইরা মইরা যাইতে পারি। তুই তখন অবশ্যই আমার হইয়া তার কাছে পায়ে ধইরা ক্ষমা চাইবি।

বললাম তো ক্ষমা চাব। মৃত্যুর কথাটা আপাতত বন্ধ থাকুক। দু'একটা আনন্দের কথা বলো।

এখন তোর বাপরে ডাক দিয়া আন। আইজ তারে আমি হাবু ডাকব না। আইজ তারে ডাকব হাবীব। সুন্দর কইরা বলব, হাবীব। বাবা কেমন আছ ?

আমার সামনে বসো। কী বলতেছি মন দিয়া শোনো। সব মানুষের মাতৃঋণ থাকে। তোমার নাই।

নাদিয়া বলল, এখন বাবাকে ডাকতে পারব না দাদি। আমি লেখা শেষ করব।

হাজেরা বললেন, আচ্ছা থাক। লাগবে না।

বলেই মাথা এলিয়ে পড়ে গেলেন। নাদিয়া তাকিয়ে ছিল, সে সত্যি সত্যি দাদির চোখে গোলাপি আলো দেখতে পেল।

হাবীব চেম্বারে মক্কেলদের সঙ্গে ছিলেন। নাদিয়া শান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, বাবা! আমি বাগানে কদমগাছের নিচে সারা রাত বসে থাকব। কেউ যেন সেখানে না যায়, কেউ যেন না যায়।

হাবীব অবাক হয়ে বললেন, তোর কী হয়েছে রে মা?

নাদিয়া বলল, আমার কিছু হয়নি। আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। দাদিজান মারা গেছেন।

নাদিয়া কদমগাছের নিচের বেদিতে বসে আছে। কাছেই বকুলগাছে ফুল ফুটেছে। ফুলের গন্ধে চারপাশ আমোদিত। ঝাঁক বেঁধে জোনাকি বের হয়েছে। নাদিয়া তার দাদির কথা ভাবছে না। সে তার ছোটমামার কথা ভাবছে। আবার সে তার মামার নাম ভুলে গেছে। কিছুতেই নাম মনে করতে পারছে না। মৃত মানুষ কত সহজেই না হারিয়ে যায়।

জীবিত মানুষও মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। হাসান রাজা চৌধুরী এখনো জীবিত। হাজতে আছে। কিন্তু সে হারিয়ে গেছে।

হাসান রাজা তাকে একটা চিঠি লিখেছে। নাদিয়া তার উত্তর লিখে রেখেছে। পাঠানো হয়নি। নাদিয়া ভেবে রেখেছে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে জেলহাজতে হাসান রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তাকে চিঠিটা হাতে হাতে দেবে।

নাদিয়া লিখেছে—

> আমি তোমার সাহসে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার মতো একজন সাহসী ভালো মানুষের সঙ্গে আমি বাস করতে পারব না এই দুঃখ আমি আজীবন পুষে রাখব। তুমি লিখেছ আমার জন্যে বজরা বানানোর কথা তুমি তোমার বাবাকে বলেছ।

> বজরা তৈরি হোক আমি একাই সেই বজরায় রাত কাটাব। তোমার দেওয়া টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র খুঁজে বের করব। নক্ষত্রের নাম Sirius, বাংলায় লুব্ধক।

ভাদু নাদিয়াকে দেখেছে। মেয়েটি একা। আশেপাশে কেউ নেই। সহসাই যে কেউ আসবে সে সম্ভাবনা নেই। ভাদু জেনেছে, বুড়িটা মারা গেছে। সবাই বুড়িটাকে নিয়ে ব্যস্ত। ভাদু এগোচ্ছে। তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা নেই। হাতে অফুরন্ত সময়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের দিকে। তার সামনে ব্ল্যাক ডগের বোতল। তিনি আয়েশ করে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা নেই। তার হাতেও অফুরন্ত সময়।

ভাদু কাছাকাছি চলে এসেছে। সে এখন এগুচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে। তাকে দেখাচ্ছে জন্তুর মতো। তার মুখ থেকে জন্তুর মতো গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। সে চেষ্টা করেও শব্দ আটকাতে পারছে না।

নাদিয়া চমকে তাকাল। ভাদুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এই তোমার কী হয়েছে? এরকম করছ কেন?

ভাদু নাদিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দিঘির পানিতে নাদিয়া পড়ে আছে। তার চোখ খোলা। যেন সে অবাক হয়ে পৃথিবী দেখছে।

নাদিয়া দিঘির যেখানে পড়ে আছে সেখানেই সে একবার নিজের ছায়া দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল।

—

ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল জেলে মে মাসের আট তারিখ হাসান রাজা চৌধুরীর ফাঁসি হয়।

আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো!

০